জ্ঞানের সন্ধানে

সত্য দর্শন

মোঃ আবদুর রউফ

www.pathagar.com

জ্ঞানের সন্ধানে

সত্য দর্শন

মোঃ আবদুর রউফ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪
ISBN-978-984-416-039-2

আঃ প্রঃ ৪১৫

১ম প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪৩১
ফালগুন ১৪১৭
ফেব্রুয়ারি ২০১১

বিনিময় ঃ ২০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SATTO DORSHON by Abdur Rouf. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 200.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উদ্যোগের কথা

আমি গতানুগতিক কোনো লেখক, দার্শনিক বা আলেম নই। নই কোনো গবেষক বা কথাশিল্পী। আমি একজন অতিসাধারণ মানুষ। পথে-ঘাটে চলতে ফিরতে, চায়ের ষ্টলে, গল্পের আসরে, বন্ধুদের আড্ডায় কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে মাঝে-মধ্যে বড় বড় শিক্ষিত লোকদের মুখে শুনতে পেতাম 'স্রষ্টা বলে কিছু নেই, এসব ধর্মবিলাসীদের গোঁড়ামীর ফসল। জীবন আসলে উদ্দেশ্যহীন। যুগে যুগে অতিবুদ্ধিমান কিছু সমাজ সেবক মানুষ সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে এবং স্বাচ্ছন্দে কর্তৃত্ব করতে ধর্ম তাদেরই আবিষ্কার।'

দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী, ডারউইনের থিওরী পড়া মানুষদের মুখে বিজ্ঞতার সুরে এসব কথা শুনে মাঝে মধ্যে ক্ষীণ হয়ে আসতো বিশ্বাসী মনটা। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা অনেক মানুষই এমন মূল্যবান মন্তব্য করে তৃপ্তির হাসি হাসেন। তাদের জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য যে মোটেও হেলাফেলার নয় তা প্রমাণ করতে এমনি আরো সব প্রশ্নের উদগিরণ ঘটান। যেমন–স্রষ্টা কত জন? পৃথিবীতে এত ধর্ম কেন? সব ধর্মইকী ঠিক? যদি তা না হয় তবে কোন ধর্ম ঠিক?

আবার কখনো কখনো ধার্মিকদের মধ্যেই প্রশ্ন উঠে 'সবাই বলে আমাদের ধর্ম ঠিক, কাজেই আমাদের ধর্ম ঠিক না হয়ে অন্যদেরটাও তো ঠিক হতে পারে'? এধরনের প্রশ্ন যে আমার মনেও উকিঝুকি দিত না তা হলফ করে বলার উপায় নেই। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থসহ বহু জ্ঞানী-গুণী লেখকের গবেষণামূলক বই-পুস্তক এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়াশুনা করে নিজে জানার ধীরে ধীরে চেষ্টা করি। এক এক করে বিক্ষিপ্তভাবে পেয়ে যাই কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর এবং তার চেয়েও বেশি কিছু। পরিশেষে আমি বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টি, স্রষ্টা এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছি তা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জাতির মানুষের উদ্দেশ্যে বিনীত নিবেদনের জন্যই আমার এ প্রয়াসটুকু।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ

বিশ্বায়নের যুগে মানুষ ধর্ম-অধর্ম আর বিভিন্ন মতবাদ বিষয়ে যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত মিটিয়ে শান্তির গ্লোবাল ভিলেজের সপ্ন দেখে। মানুষ খুঁজে পেতে চায় শান্তি ও নিরাপত্তা। স্বার্থগত বিরোধের কারণে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ধর্মেই পাওয়া যায় ন্যায়স্বার্থ ও হীনস্বার্থের পার্থক্য। কাজেই স্বার্থগত বিরোধের সর্বোৎকৃষ্ট মীমাংসার জন্য ধর্মই অপরিহার্য। এ যাবত অর্জিত নৈতিক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বমানবতা ধর্মের কাছে অনেকটাই ঋণী। তবে এক্ষেত্রে ধর্মকে অবশ্যই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সত্য প্রমাণের মাপকাঠি হচ্ছে যুক্তি ও বিজ্ঞান। মানুষ জাগতিকভাবে বৈজ্ঞানিক চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে অভ্যস্ত। আমরা ধর্ম মানি কিন্তু বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে নয়। বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ, এবং ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গুও বটে।. সঠিক ধর্ম নিরুপণের ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর কার্যকরী। কাজেই বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে এ কথা আমরা সহজেই বলতে পারি যে, ধর্ম যুক্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানকে মেনে নেয় সেই ধর্মই কেবল সঠিক ও যুগোপযোগী হওয়ার সম্ভবনা রাখে'।

নিরপেক্ষভাবে মুক্তমানে চিন্তা-ভাবনা না করেও নাস্তিকরা বরাবরই নিজেদেরকে মুক্তমনের মানুষ দাবি করে। অথচ মুক্তচিন্তন সব সময়ই এক স্রষ্টার অস্তিত্ব নির্দেশ করে। নাস্তিকতার স্বপক্ষে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার কোনো অবলম্বনও তাদের নেই। কোথাও দেখা যায় না বলেই তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসেন। আবার 'প্রাণ'কোথাও দেখা না গেলেও যুক্তিহীন তর্ক করার জন্য নিজেরা বেচেঁও থাকেন। তাদের যুক্তিহীন তর্কই জানান দেয় প্রাণের অস্তিত্ব। অপর পক্ষে সুশৃঙ্খল মহাবিশ্বের সৃষ্টি-কৌশল ও নিয়মতান্ত্রিক আইন-শৃঙ্খলা জানান দেয় মহাপরিকল্পক বিশ্বমনীষার অস্তিত্ব।

মানুষ জন্মগতভাবে সত্য ও মুক্তির পথের সন্ধান জানতে উদগ্রীব। গ্রন্থটিতে বিজ্ঞানের আলোকে স্রষ্টা ও তাঁর সঠিক ঐশী বাণীসমূহ বুঝাবার কৌশল প্রশংসনীয়। অবিশ্বাসী ও আধুনিক চিন্তাশীলসহ সব ধরনের পাঠকদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছি।

www.pathagar.com

মন্তব্য

'সত্য দর্শন' বইটি নিঃসন্দেহে গবেষণাধর্মী প্রত্যয়ী বিবেকের চিন্তা-চেতনার বহিপ্রকাশ। বিষয়ের উপরে অতীত থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য গ্রন্থ প্রণীত হলেও অবিশ্বাসী আধুনিক চিন্তাশীলদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। তবে বইটি Authenticity আরো Genuine হবে যদি যুগোপোযোগী পরিবর্ততি এ যুগের প্রেক্ষাপটে আরো তথ্যভিত্তিক রেফারেন্স সহ কলেবর বৃদ্ধি করা যায়। বইটি প্রকাশনা এবং বহুল প্রচার কামনা করি।

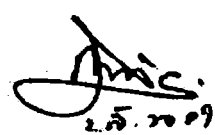

প্রফেসর ড. এ. কিউ. এম বজলুর রশিদ
কৃষি বিজ্ঞানী
ময়মনসিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

মন্তব্য

"সত্য দর্শন" বইটি পড়লাম। বইটিতে বিশ্বের সেরা জ্ঞানীদের মতামতের উদ্ধৃতি দিয়ে সৃষ্টিজগত এবং বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে উৎসুক জিজ্ঞাসু মনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা হয়েছে। তথ্যবহুল গবেষণামূলক এ বইটিতে যুক্তি ও তথ্যকে এমনভাবে একত্র করা হয়েছে। যেখানে সত্যসন্ধানী জ্ঞানী মানুষের জ্ঞান চর্চার যথেষ্ট অবলম্বন রয়েছে। যুক্তিপূর্ণ এ বইটি মূলত নাস্তিক্যবাদের প্রতি এক কঠিন চ্যালেঞ্জ।

বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যের সাথে ঐশী সত্যের মিল না থাকলে জ্ঞানী মানুষ সেই ঐশীকে মেনে নিতে চায় না। কাজেই প্রকৃত সত্যকে খুঁজে পেতে হলে বিজ্ঞানের সত্য এবং ঐশী সত্যের মধ্যে ঐক্য থাকতে হবে। এসব বিষয় নিয়ে লেখা অসাধারণ মানের এ বইটি প্রকাশ হলে জ্ঞানীদের সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

খন্দকার আব্দুর রশিদ
বি,এ,এল,এল, বি,এম,এ.
(শিক্ষক, গ্রন্থকার, বিশ্বকোষের লেখক)

www.pathagar.com

সত্য দর্শন সম্পর্কে দুটি কথা

জনাব মোঃ আব্দুর রউফ রচিত 'সত্য দর্শন' বইটির পাণ্ডুলিপি পড়লাম। বইটিতে মহান স্রষ্টার মনোনীত ধর্ম ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব জানার প্রয়াস প্রশংসনীয়। বিশ্বে প্রচলিত বিশেষ কয়েকটি ধর্মে ঈশ্বরের বহুত্ববাদ ও দ্বৈতবাদসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানুষের মনে অবশ্যই সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করছে। স্রষ্টা মহাবিজ্ঞানী, সমস্ত জগত তাঁরই বিজ্ঞানময় সৃষ্টি। অথচ তাঁর সৃষ্ট মানবের কতিপয় পথভ্রষ্ট বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে নাস্তিকতার পক্ষে বিবর্তনবাদ, ডারউইনবাদ, জড়বাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে আমাদের কতককে বিপথগামী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনই এক সংকট সময়ে আল্লাহ সম্বন্ধে আস্তিক জিজ্ঞাসুদের জন্য যৌক্তিক পদ্ধতিতে স্রষ্টার একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ বুঝানোর চেষ্টা বইটিতে এক প্রসংশনীয় উদ্যোগ। কুরআন যে মানব রচিত নয় বরং সত্য ঐশী গ্রন্থ তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের সাথে ইসলাম ও তার ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্তাকার তুলনামূলক যুক্তিধর্মী আলোচনা এবং দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রেরিত আল-কুরআনে বর্ণিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে একালের নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মিল ও যথার্থতা দর্শানো এই বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট। আধুনিককালের বিজ্ঞান-বিশ্বাসী মানুষকে বিজ্ঞানের আলোকেই স্রষ্টা ও তাঁর সঠিক ঐশি গ্রন্থ বুঝানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রাসংগিকভাবে, মহাকাশ পৃথিবী, সৌরজগত প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক বিজ্ঞান ও ধর্মভিত্তিক তথ্যের আলোচনা এ বইটিতে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। কুরআনিক বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই গন্থের সাবলীল আলোচনা বিভিন্নভাবে ধর্ম বিষয়ক বহু প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হয়েছে। ফলে লেখক এই বইটি রচনায় বিরাট কৃতিত্বের দাবীদার বলে মনে করি। এই বইটি পাঠ করে ইসলাম অনুসারীদের বিশ্বাস (ঈমান) আরও সুদৃঢ় হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি স্নেহপ্রতিম লেখকের জন্য দোয়া করছি।

তারিখ ২১/০৬/০৭

মোঃ মোসলেম উদ্দিন

মোঃ মোসলেম উদ্দিন
প্রাক্তন অধ্যক্ষ (অবঃ)
সান্তাহার সরকারী কলেজ
সান্তাহার, বগুড়া।

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা

আমি "সত্য দর্শন" নামক বই-এর পাণ্ডুলিপিটি পুরোপুরি পাঠ করলাম। বইটিতে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে মানব মনের জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া হয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। যেমন–এ মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকে ছিল ?না এটা কোন এক যথা নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে ? এ সৃষ্টির জন্য কোন স্রষ্টার প্রয়োজন ছিল ? না এটা হঠাৎ সৃষ্টি ? যদি এখানে স্রষ্টার প্রয়োজন হয় তবে সেই স্রষ্টা সৃষ্টির সাথে কীভাবে সম্পর্ক রক্ষা করছেন ? এ সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টার কোন উদ্দেশ্য আছে কি ? না এটা উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি ? এ মহাবিশ্ব কোন মহাজ্ঞানী-মহাপরিকল্পকের সুশৃঙ্খল সৃষ্টি ? না এটা জ্ঞানহীন বোবা প্রকৃতির এলোমেলো সৃষ্টি কর্ম ? বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো স্রষ্টার মেনে নেয় কি না ? স্রষ্টা কি একজন ? নাকি একাধিক ? পৃথিবীতে এত ধর্ম কেন ? সব ধর্মই কি ঠিক ? মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি জীব ? না কি ক্রমবিকাশের ধারায় বান থেকে মানুষ ? ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরতে বহু তথ্য উপাত্তের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পাঠককে সঠিক দিক নির্দেশনা দিবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তথ্যবহুল এ বই থেকে জ্ঞানী পাঠকরা শুধু উপকারই কুড়াবেন বলে আমি মনে করি। লেখকের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আমি বইটি ব্যাপক প্রচার কামনা করছি।

মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসেন
বি,সি,এস (সাধারণ শিক্ষা)
প্রভাষক বাংলা বিভাগ
সান্তাহার সরকারী কলেজ
বগুড়া।

www.pathagar.com

'সত্য দর্শন সম্পর্কে আমার অনুভূতি

'এ মহাবিশ্ব যে একজন স্রষ্টার সৃষ্টি' সে কথা অনেক মানুষই বিশ্বাস করতে চায় না। আবার যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই স্রষ্টার নীতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। স্রষ্টার নীতি সম্পর্কে তারা সঠিক ধারণা পায় না। ফলে স্রষ্টার নীতি বিবর্জিত জাতির যা করণীয় তাই করে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। এমন প্রেক্ষাপটে বিষয়গুলোকে স্মরণে রেখে সুদীর্ঘ সময় ধরে লেখা তথ্যবহুল বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মীয় এ বইটি কৃতিত্বের দাবী রাখে।

সমাজে ধর্মীয় লোকের অভাব নেই, অভাব হচ্ছে বিশ্বাসের গভীরতার। ইঞ্জিনিয়ার জনাব আব্দুর রউফ রচিত 'সত্য দর্শন' বইটি পড়ে আমার বিশ্বাসের গভীরতা যে কত কম তা অনুধাবন করতে পারায় এবং সঠিক ধর্ম নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ করে দেয়ার লেখককে ধন্যবাদ।

অপূর্ব তথ্যবহুল এ বইটি ভাষাগত উচ্চাঙ্গতার কারণে সাধারণ পাঠকদের জন্য একটু কঠিন মনে হলেও বিষয়ের সুন্দর ধারাবাহিকতা বইটিকে বেশ সহজ করে দিয়েছে। কাজেই পাঠকদের প্রতি প্রকৃত সত্যের আলোকে আপন বিশ্বাসের গভীরতা বাড়াতে অতি একাগ্রতার সাথে বইটি অধ্যয়ন করার এবং লেখককে এ ধরনের লিখনী অব্যাহত রাখার অনুরোধ রইল।

০৯.৯.০৯

মু. সাইফুল ইসলাম
অধ্যক্ষ
সান্তাহার টেক. এণ্ড বি. এম কলেজ
সান্তাহার, বগুড়া।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

০১। আস্তিক ও নাস্তিকের দ্বন্দ্ব ১৯
০২। ডারউইনবাদে বানর থেকে মানুষ! ২১
০৩। বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে স্রষ্টার অস্তিত্ব ২৩
০৪। আকস্মিকতা বিজ্ঞানের বিষয় নয় ৩২
০৫। জড়ের অতীত ও ভবিষ্যত অজড় শক্তি ৩৩
০৬। বিশ্বাসের গুরুত্ব সবকিছুর উর্ধ্বে ৩৪
০৭। সৃষ্টির সূচনা ৩৬
০৮। বস্তুজগত চেতনা হতে উদ্ভূত ৩৭
০৯। পারসিক ধর্মের পরিচয় ৪৩
১০। বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয় ৪৩
১১। হিন্দু ধর্মের পরিচয় ৪৪
১২। ইহুদী ধর্মের পরিচয় ৪৬
১৩। খ্রিস্ট ধর্মের পরিচয় ৫১
১৪। খ্রিস্ট ধর্মে ত্রিত্ববাদ ৬৬
১৫। মৌলবাদ ৭৪
১৬। ইসলাম ধর্মের পরিচয় ৭৭
১৭। অমুসলিম বিখ্যাত মনীষীদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ সা. ৭৮
১৮। ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের মন্তব্য ৯০
১৯। বিশ্বখ্যাত অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে আল কুরআন ৯৩
২০। পারসিক ধর্মে আহমদ ৯৫
২১। বৌদ্ধ ধর্মে মৈত্রেয় ৯৫
২২। হিন্দু ধর্মে শেষ অবতরণকারী! ৯৬
২৩। মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বাইবেলের উক্তি ১০৯
২৪। খ্রিস্ট ধর্মে পরাক্রতস ১১৪
২৫। বার্নাবাসের বাইবেলে আল্লাহর রাসূল সা. ১১৮
২৬। কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস ১২২
২৭। কুরআন সত্য! ১২৬
২৮। কুরআন মানব রচিত নয় ১৩৩
২৯। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের যুক্তিহীনতা ১৪৭
৩০। সৃষ্টি সম্পর্কে বেদ-এর বর্ণনা ১৪৯
৩১। সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলের বিবরণ ১৪৯
৩২। সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা ১৫৩

www.pathagar.com

৩৩। কুরআনই জ্ঞান-বিজ্ঞান ১৫৫
৩৪। বিজ্ঞান সত্যকে আবিষ্কার করে ১৬১
৩৫। বিজ্ঞান ইসলামের সহায়ক শক্তি ১৬৩
৩৬। ইসলামে বিজ্ঞানের ব্যবহার ১৬৭
৩৭। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ১৭২
৩৮। সৌরজগত ও মাধ্যাকর্ষণ ১৭৭
৩৯। প্রাণের জন্য পৃথিবীর সমন্বয় ব্যবস্থা ১৮০
৪০। দিবারাত্রির পরিবর্তনে আল্লাহর নিদর্শন ১৮২
৪১। মহাবিশ্বের সমুদয় সৃষ্টি মানুষের কল্যাণে ১৮৫
৪২। মহাশূন্যে সবকিছু আপন কক্ষে সন্তরণশীল ১৮৯
৪৩। পানির অস্বাভাবিক গুণ ১৯১
৪৪। মহাকাশে মাপনযন্ত্র ১৯৫
৪৫। মৃত্যু ও জীবন সৃষ্ট ১৯৭
৪৬। জীবনের আবির্ভাব ২০০
৪৭। বিজ্ঞান বুঝতে পেরেছে স্রষ্টার ভাষা ২০২
৪৮। ক্লোনিং পদ্ধতি ২০৭
৪৯। আকাশ সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ ২০৮
৫০। সাত স্তর আসমান-জমিন ২১২
৫১। ধ্বংস দিবস ২১৮
৫২। যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর ইবাদাত করে ২২৩
৫৩। মহাকাশ বিজয় ২২৪
৫৪। সূর্যের গ্রহ ১১টি ২২৫
৫৫। মহাকাশে মানুষের জীবিকা ২২৫
৫৬। জীবন উদ্দেশ্যহীন নয় ২২৬
৫৭। সত্য ধর্ম ২২৯
৫৮। ধর্ম বিকৃতি ২৩৩
৫৮। সকল ঐশীগ্রন্থে আল্লাহ। ২৩৬
৫৯। ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা ২৩৮
৬০। ইসলামের প্রচারণা ২৫৪
৬১। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ ২৬২
৬২। ইসলামের ইবাদাত ২৬৪
৬৩। জিহাদই সন্ত্রাস!! ২৭৪

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থ ঃ বেদ-পুরাণ, বাইবেল, ইঞ্জিল, বার্নাবাসের বাইবেল, কুরআন, হাদীস, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী সাহিত্য, ইসলামী দর্শন, চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব, বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, আল কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ- মহাকাশ পর্ব ১/২, কম্পিউটার ও আল কুরআন, জগত গুরু মুহাম্মদ সা. কেন আমি ইসলাম পছন্দ করি ? বিভিন্ন সংখ্যার মাসিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা।

কৃতজ্ঞতার সাথে অশেষ মুবারকবাদ ওই সমস্ত লেখকদের প্রতি, যাঁদের লিখা থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে

স্রষ্টা আছেন কি ?
স্রষ্টা কি আধুনিক উচ্চতর বিজ্ঞানের গাণিতিক
জটিলতা সহ্য করেন ?
স্রষ্টা কি ধর্ম বিলাসীদের গোঁড়ামীর ফসল ?
বানর থেকে মানুষ ?
ধর্ম কি বিজ্ঞানকে মেনে নেয় ?
ধর্মে কি কোনো সত্যতা আছে ?
পৃথিবীতে এত ধর্ম কেন ?
সব ধর্মই কি সঠিক ?
বেদ বাইবেলেও আল্লাহ!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আস্তিক ও নাস্তিকের দ্বন্দ্ব

সৃষ্টির আদি থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে এবং শেষ পর্যন্ত তা চলতেই থাকবে। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আস্তিক ও নাস্তিকের দ্বন্দ্ব। এখানে আস্তিক বলতে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে অবিশ্বাসী বুঝালেও যুক্তির দিক থেকে উভয়েই বিশ্বাসী। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আছে বলে যারা বিশ্বাস করেন তারা হচ্ছেন আস্তিক। আর যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই বলে বিশ্বাস করেন তারা হচ্ছেন নাস্তিক।

আস্তিকরা বলছেন নিশ্চয় আমাদের সবকিছুর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আর নাস্তিকরা বলছেন আমাদের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে। উভয় পক্ষেরই শক্ত যুক্তি আছে। নাস্তিকরা বলছেন সৃষ্টিকর্তাকে কোথাও দেখা যায় না। আস্তিকরা বলছেন না দেখেই সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করতে হয়। আর বিশ্বাস করার জন্য সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত পুরুষদের (নবী) বাণীই তো যথেষ্ট। নাস্তিকরা বলছেন ওইসমস্ত মহাপুরুষরা মানব জাতিকে ধর্মভীতির মাধ্যমে সুশৃঙ্খল করার জন্যই সৃষ্টিকর্তার কথা বলে থাকেন। আবার কেউ বলেন, ভয় থেকে বা অজানা আশঙ্কা থেকে ধর্মের উৎপত্তি। তারা আরও বলেন 'ধর্মে কোনো সত্য নেই, আছে প্রচুর মিথ্যা আর আদিম মানুষের ব্যাপক আত্মবিশ্বাস, জীবন উদ্দেশ্যহীন, স্রষ্টা বলে কেউ নেই, স্রষ্টা হলো ধর্ম বিলাসীদের গোঁড়ামীর ফসল মাত্র'।

এমনিভাবে কত যুগ-মহাযুগ পেরিয়ে দ্বন্দ্ব এসে পড়ে বৈজ্ঞানিক যুগে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে এসে দ্বন্দ্ব আরও তীব্র আকার ধারণ করে। কিভাবে প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে সে ব্যাপারে বিজ্ঞানী মহলে বিভিন্ন মতবাদ বিদ্যমান। যেমন--স্বতঃস্ফূর্ত মতবাদ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়বাদ, বিশেষ সৃষ্টি মতবাদ, কসমিক মতবাদ, জলেইজীবন মতবাদ, ওপারিনের তত্ত্ব, ভাইরাস তত্ত্ব, জৈব বিবর্তন বা ডারউইনবাদ ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে নাস্তিক বিজ্ঞানী মহলে সাদরে গৃহীত মতবাদ হচ্ছে জৈব বিবর্তনবাদ বা ডারউইনবাদ। আর বিশেষ সৃষ্টি মতবাদ ও জলেইজীবন মতবাদের সাথে আস্তিকদের বিশ্বাসের কিছুটা মিল আছে। বিশেষ সৃষ্টি মতবাদ অনুযায়ী জীব-জগত দৈব সৃষ্ট। সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির পর থেকে জীবের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বর্তমান রূপই হচ্ছে প্রতিটি জীবের আদি সৃষ্টিরূপ, জলেইজীবন মতবাদে সমস্ত উদ্ভিদ ও জীব পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে সর্বশেষ ধর্মের কিতাব আল-কুরআনের কিছু আয়াত লক্ষ্য করা যায়। যেমন "তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমানসীন হন। (সূরা আল আরাফ ঃ ৫৪) তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এবং এদের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিন। অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন"(সূরা আল ফুরকান ঃ৫৯) (সূরা আস সাজদাহ ঃ ৪) "আমি প্রাণবন্ত সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবু কি মানুষ বিশ্বাস করবে না ?" (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩০)। "তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন এবং সৃষ্টি করেন সকল প্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ" (সূরা লোকমান ঃ ১০)। বাইবেলেও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

ডারউইনবাদে বানর থেকে মানুষ!

জৈব বিবর্তন তথা ডারউইনবাদে বলা হয়েছে, পৃথিবীর আদিতে কোনো জীব ছিল না। কোনো এক সময় অজৈব পদার্থ হতে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। ১৫০ কোটি বৎসর পূর্বে আর্কিজোয়িক যুগে সেই জৈব পদার্থে প্রাণের সঞ্চার হয়ে এককোষীয় আণুবীক্ষণিক অ্যামিবা জাতীয় অণুজীবের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ধীর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বা ক্রমবিবর্তনের ফলে ওই এককোষী জীব হতে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। এ মতবাদ অনুযায়ী ২৭ কোটি বৎসর পূর্বে কার্বনিফেরাস যুগে সর্প জাতীয় প্রাণী হতে আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখির উদ্ভব ঘটে। ৬ কোটি বৎসর পূর্বে ক্লিওসীন উপযুগে মানুষের উদ্ভব ঘটে। এভাবে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য জীবেরও উদ্ভব ঘটে। এ মতবাদের অনুসারী-বিজ্ঞানীরা তাদের যুক্তির স্বপক্ষে সুন্দরভাবে মিল দেখিয়েছেন। যেমন– প্রত্যেক জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত, প্রত্যেক কোষে ক্রমোজোম আছে এবং তাতে জীন আছে। এ মতবাদের সপক্ষে বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ হিসেবে জীবাশ্মকে দেখিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের দাবী হচ্ছে জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ের সঠিক ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন জীবের প্রাপ্ত জীবাশ্ম সংগ্রহ করে বয়স নির্ণয় করে উক্ত জীব এখন থেকে কত কোটি বছর পূর্বে কোন্ জীব হতে উৎপত্তি লাভ করেছে তা প্রত্যেক জীব গ্রুপের জন্য নির্ণয় করেছেন এবং তা দিয়ে একটি স্থায়ী চার্ট তৈরি করেছেন, যা জিওলোজিক্যাল টাইম টেবিল বলে পরিচিত।

চার্লস ডারউইন পূর্ববর্তী মনীষীদের আবিষ্কৃত 'অস্তিত্বের সংগ্রাম' নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে প্রকৃতির মনোনয়ন দর্শনটিকে বেশ জোরালোভাবে উত্থাপন করেন এবং এটাকে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এক প্রাকৃতিক বিধান বলে নির্ধারণ করেন। তিনি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এক গ্রন্থে বলেন, অস্তিত্বের সংগ্রাম জড়বস্তু হতে শুরু করে গাছপালা এবং প্রাণী জগতেও প্রাকৃতিক বিধানের এ লীলা চলছে। তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, অস্তিত্বের সংগ্রামের এ প্রাকৃতিক বিধান মানবজাতির নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছে। চার্লস ডারউইন ক্রমবিকাশের শেষ ধাপ মানুষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ডারউইনবাদে এটাই বলিষ্ঠ রূপে সমর্থিত হয় যে, বিশ্ব প্রকৃতির প্রক্রিয়া কোনো মহা প্রজ্ঞাবান সত্তার অস্তিত্ব ব্যতিরেকেই চলতে পারে। এভাবেই প্রকৃতিবাদ ও বস্তুবাদ সুসংবদ্ধ একটি মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ডারউইনবাদের ছত্রছায়ায়। ফলে নাস্তিকতাবাদ ও ধর্মদ্রোহীতার

www.pathagar.com

পথ বেশ সুগম হয়। ডারউইনবাদকে সামনে রেখে কালবিজয়ী হেগেল, কার্ল মার্কস, এ্যাঞ্জেল, লেনিন, স্টালিন, মাওসেতুং প্রমুখ নেতারা নাস্তিকরাজ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মদ্রোহী শাসন চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ সময় নাস্তিক বৈজ্ঞানিকরা ডারউইনবাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন কিন্তু সঠিক তথ্য-প্রমাণের অভাবে এবং এর অনেকগুলো দিক দুর্বল থাকায় তা আর পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠে না।

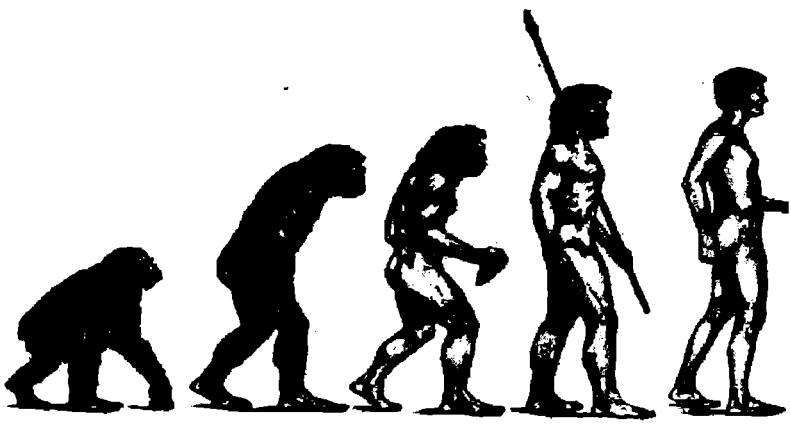

ডারউইনের ক্রমবিকাশে বানর থেকে মানুষের কাল্পনিক চিত্র।

ডারউইনবাদের এ বিবর্তন ধারায় শুধু একটি স্তরই নয় বরং এর প্রতিটি বর্তমান স্তরের সামনে-পিছনে অনেকগুলো স্তরই অনুপস্থিত ছিল। ফলে বর্তমানে আর কেউই বিবর্তনবাদকে অকাট্য সত্য বলে মেনে নিতে চায় না। এ ব্যাপারে সুইডেনের ল্যান্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হেরিবার্ট নিলসন তার লিখা এক বইতে বলেন, "মাটি খুঁড়ে পাওয়া বিভিন্ন ফসিল (কংকাল) গবেষণা করলে আপনি অবাক হয়ে দেখবেন বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে এসব প্রাণীরা যেন হঠাৎ করেই আবির্ভূত হয়েছে। এমনিভাবে কয়েক কোটি বছর দুনিয়ার বুকে রাজত্ব করে আবার হঠাৎ করেই দুনিয়ার বুক থেকে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমনকি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের প্রাণীগুলোর সাথে সংযোগ সাধনকারী কোনো মধ্যবর্তী প্রাণীও তারা রেখে যায়নি।" বিজ্ঞানীদের জিওলজিক্যাল টেবিলে দেখা যায়, এককোষী জীবের আবির্ভাব হয়েছে আর্কিজোয়িক যুগে। এ আর্কিজোয়িক যুগে প্রাপ্ত অণুজীবাশ্মের ভিত্তিতে জীবের প্রাথমিক আবির্ভাবের হিসেব কোনো বইয়ের টেবিলে দেখানো হয়েছে ১৫০ কোটি বছর পূর্বে, কোনো বইতে ৩৫০ কোটি বছর পূর্বে, কোনো বইতে ৪৫০ কোটি বছর পূর্বে। এরূপ অন্যান্য মহাযুগ, যুগ ও উপযুগের সময়কালও বিভ্রান্তিকর ও রহস্যজনক।

www.pathagar.com

বিবর্তনবাদীদের নিত্যনতুন ভুল তথ্য জোর প্রচারের মাধ্যমে আজ সমস্ত বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে এ সৃষ্টি নিছকই গঁজিয়ে উঠা একটি ঘটনা মাত্র। এভাবে বিবর্তনবাদীদের তত্ত্ব পৃথিবীবাসীর অন্তরে শক্ত শিকড় গেড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারই আজ এক এক করে প্রমাণ করে দিতে চায় বস্তুবাদের অসারতা।

বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে স্রষ্টার অস্তিত্ব

আদৌ কি এ বিশ্বজগত অনাদিকাল থেকে ছিল ? না এটা যথানির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে ? যদি এটা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এটা শূন্য থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হঠাৎ উৎপত্তি ? না এটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ? যদি এ বিশ্বটাকে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাহলে কি তার জন্য কোনো স্রষ্টা প্রয়োজন ছিল ? না স্রষ্টা বলে কেউ নেই, বরং স্রষ্টা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে ? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতেই প্রথমে আমরা দেখি বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের মন্তব্য। দেখি তাঁরা জগতসৃষ্টির বিষয়ে কে কি বলেছেন।

* মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী ড. টি, এন, টমিশন-এর মতে–"বিবর্তনবাদ হচ্ছে একটি দৈব মিলন তত্ত্বের কাল্পনিক খেলা এবং বিরাট প্রতারণা।"

তিনি আরও বলেন, "যেসব বিজ্ঞানী বলে বেড়ান যে, বিবর্তন একটি বৈজ্ঞানিক সত্য তারা আসলে প্রতারণা করেছেন, আর যে যে গল্প তারা বলে বেড়াচ্ছেন সম্ভবত শিগ্‌গিরই তা সর্বযুগের সবচেয়ে গাঁজাখোরী গল্প বলে প্রমাণিত হবে। এ সমস্ত কারণে বিবর্তনবাদের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা হাক্‌সলী পর্যন্ত এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিছক খোদাদ্রোহিতার কারণে বিবর্তনবাদকে গ্রহণ করতে হলো।"

* সার আরথার কিথ (১৯৫৩) বলেন, "বিবর্তন একটি অপ্রমাণিত সত্য, তা প্রমাণযোগ্য মত নয়। আমরা তা শুধু বিশ্বাস করি এ কারণে যে, এ মত মেনে না নিলে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকার্য স্বীকার করে নিতে হয়, কিন্তু তা চিন্তারও অযোগ্য।"এছাড়া উইম্যান ড্রিক- প্রভৃতির গবেষণার ফলে ডারউইনের বিবর্তনবাদের সূত্রে বহু ত্রুটি দেখা যায়। তাছাড়াও ডারউইনের বেশ কিছু একনিষ্ঠ অনুসারী শেষ পর্যন্ত অনুশোচনা করে পিছনে ফিরে তাকাতে কসুর করেননি। জার্মানির রাইন্‌কি স্বীকার করেছেন "অদৃশ্য সত্য শক্তি বিদ্যমান।"

www.pathagar.com

* ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রোমানেস স্বীকার করে গেছেন যে, 'তাঁর সমুদয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা মূলত ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, "মহাবিশ্বকে কোনোক্রমেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করে বুঝানো যায় না।"

* বিশ্বের অন্যতম পদার্থবিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন উক্তি করেন– "আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে।" বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরও অনেকেই এ উক্তির সাথে একমত পোষণ করেন।

* ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, জীব-পদার্থ বিজ্ঞানী ফ্যাংক এ্যালেন বলেন–"বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে চারটি সমাধান দেয়া যেতে পারে (১) বিশ্ব বিভ্রম মাত্র। (২) শূন্য থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হঠাৎ উৎপত্তি। (৩) আদৌ এ বিশ্বের কোনো গোড়া পত্তন হয়নি, অনাদিকাল থেকে মহাবিশ্ব বিদ্যমান, অর্থাৎ বস্তুই আদি। (৪) এটি সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় ধারণা এতই অতিমাত্রায় অযৌক্তিক যে এর বিচার বিবেচনা নিঃপ্রয়োজন। তৃতীয় ও চতুর্থ ধারণা সম্পর্কে যুক্তি হচ্ছে, তাপ গতিবিদ্যার নিয়ম-কানুন থেকে এটাই প্রামাণিত হয় যে, এ বিশ্ব ক্রমশ ঃ তাপ বিকিরণ করতে করতে নিম্নতাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এমন এক সময় আসবে যখন গ্রহ-উপগ্রহ অতিশয় নিম্ন তাপমাত্রায় উপনীত হবে এবং তখন তাপশক্তি বলতে আর কিছুই থাকবে না। আবহমান কাল থেকেই যদি এ বিশ্ব বিদ্যমান থাকতো, তাহলে এ অসীম সময়ের ব্যবধানে ইতোমধ্যে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতো। কিন্তু তাপ গতিবিদ্যার সূত্রানুসারে 'প্রদীপ্ত নক্ষত্রমণ্ডলী ও প্রাণসমৃদ্ধ উষ্ণ এ পৃথিবীই যথানির্দিষ্ট সময়েই এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে' এবং 'বস্তুই আদি' এ ধারণার অসারতা প্রমাণ করে। এ থেকে প্রমাণ হয়, এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূলে শাশ্বত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এক মহান সুদক্ষ কৌশলী সৃষ্টিকর্তার হাতই কার্যকর। মহাশূন্যে ভাসমান এ পৃথিবীকে হাজারো সময়ের মাধ্যমে প্রাণী বাসের উপযোগী করে যেভাবে সৃষ্টি করে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করা হচ্ছে, সেগুলো বিবেচনা করলে কোনোক্রমেই ভাবা যায় না যে, হঠাৎ করে এমনিতেই এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।"

* ইলেকট্রনিক্স রিসার্চের এসোসিয়েট ডাইরেকটর, পদার্থ বিজ্ঞানী রবার্ট মরিস পেজ বেশকিছু পর্যবেক্ষণকারীসহ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষা কাজ পরিচালনা করেন। তাতে তিনি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে বাস্তব সত্তারূপে স্বীকৃতি দানে বাধ্য হন।

www.pathagar.com

* বিশিষ্ট গাণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানী ডোনাল্ড হেনরী পোটার বলেন– "পদার্থ বিদ্যার অগ্রগতির পর্যায়ে 'কেন' দিয়ে আরম্ভ এমন অনেক প্রশ্নেরই জবাব দেয়া হয় না। 'কি করে' এ শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করলে সম্ভবত সবচেয়ে ভালো করে তার উত্তর দেয়া যেতে পারে এবং তা প্রায় সত্যের কাছাকাছি। 'মহাবিশ্বের দুটি জনপ্রিয় থিওরী মোতাবেক মহাবিশ্বের মারাত্মক রকম সংকোচনের ফলে উদ্ভূত কল্পনাতীত ঘনত্ব ও তাপমাত্রা বিশিষ্ট অবস্থা থেকে মহাবিস্ফোরণের ফলে এ মহাবিশ্বের প্রকাশ ঘটেছে। মহাসম্প্রসারণসহ মহাবিশ্বের যাবতীয় গতি ওই মহাবিস্ফোরণেরই ফল'। আমি যদি এ থিওরী গ্রহণ করি তাহলে যেসব কণিকা ও যে উৎস-শক্তি থেকে এ চাপ ও উত্তাপের সৃষ্টি, সেসব কণিকা ও শক্তির উৎসের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এখানে আল্লাহকে আনতে হয়। তাহলে দেখা যায় আল্লাহ ঘটনাস্থলে এসে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয় 'হেয়ালীর নিয়ত অবস্থার থিওরী বা ধারাবাহিক সৃষ্টির থিওরী' অনুসারেও মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এ সম্প্রসারণের শূন্যতা পূরণ হচ্ছে বস্তু (জড় পদার্থ) সৃষ্টির মাধ্যমে। সৃষ্টি সম্পর্কে হেয়ালী এ ধারণা দেন যে, জড় পদার্থ অন্য কোথাও থেকে আসে না। এটা শুধু আবির্ভূত বা সৃষ্টি হয় এবং এ সৃষ্টিরই কর্তা হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করতে হয়। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে আল্লাহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত।

প্রকৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন পর্যালোচনা করা হোক না কেন, একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে সকল বিষয়ে প্রধান ভূমিকায় আল্লাহকে বসিয়ে আমি চরম সন্তুষ্টি লাভ করি। প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ হচ্ছেন মূল চরিত্র। যেসব প্রশ্নের জবাব আজও দেয়া হয়নি, একমাত্র 'তিনিই' তার জবাব।

* জীববিদ্যার অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, প্রাণী ও কীটতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড লুথার কেসেল বলেন–"বিজ্ঞান কেবল প্রাকৃতিক কলকব্জা নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু এ কলকব্জা কোথা থেকে এলো ? এ মৌলিক প্রশ্নটি বিজ্ঞান সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি দার্শনিক মন লুকিয়ে থাকে, তা তিনি বৈজ্ঞানিকই হোন বা অন্য কেউ। দুঃখের বিষয় একজন ভালো বৈজ্ঞানিক সবসময় ভালো দার্শনিক হয় না। অনেকে সৃষ্টি সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে চিন্তা করেন। আবার অনেকে আছেন, যারা এ 'মহাবিশ্ব নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়েছে' এমন একটি ভুল ধারণা নিয়ে থাকেন। আবার অন্যরা বলেন, 'আবহমান কাল থেকে এ মহাবিশ্ব বিরাজমান।'

তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় আইন অনুযায়ী উত্তপ্ত বস্তু থেকে ততোধিক শীতল বস্তুতে সবসময় তাপ প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে এক সময় মহাবিশ্বে

www.pathagar.com

সামগ্রিকভাবে তাপমাত্রা সমান হবে এবং তখন আর কোনো প্রয়োজনীয় শক্তিই থাকবে না। পরিণামে রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু এখনও পৃথিবীতে রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়া এবং প্রাণের স্পন্দন বিরাজমান সেহেতু সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণ করে যে, অনাদিকাল থেকে নয় বরং যথা-নির্দিষ্ট সময়ে এ মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল। আর এ কথা প্রমাণ করতে গিয়ে বিজ্ঞান সে সঙ্গে প্রমাণ করে যে, যারই সূচনা রয়েছে সেই আপনা থেকে আরম্ভ হয়নি। অধিকন্তু এর জন্য পরম ও চরম প্রস্তাবক একজন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রয়েছেন"। অর্থাৎ যা সৃষ্টি হয়েছে তারই একটা সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। সুতরাং স্রষ্টাকে স্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক নয় বরং অস্বীকার করাই অবৈজ্ঞানিক এবং স্বীকার করাই বৈজ্ঞানিক।

তিনি আরও বলেন–"বিজ্ঞান এমন কথাও প্রমাণ করেছে যে, একটি প্রচণ্ড সৃষ্টিশীল বিস্ফোরণের ফলে এ মহাবিশ্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং বাস্তবপক্ষে মহাবিশ্ব তার সৃষ্টির মূল কেন্দ্র থেকে এখনও সম্প্রসারিত হচ্ছে। আজকের দিনে যারা বিজ্ঞানের প্রমাণে বিশ্বাসস্থাপন করবেন তাদের অবশ্য সৃষ্টিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। 'সৃষ্টি' প্রকৃতির সকল আইনের উর্ধে, কারণ 'প্রকৃতির আইন' নিজেই সৃষ্টির ফল। একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোনোক্রমেই এমন সৃষ্টি সম্ভব নয়। তিনি প্রকৃতির যন্ত্রাদি এবং এগুলো পরিচালনাকারী আইনাবলী প্রতিষ্ঠা করার পর এ যান্ত্রিকতাকে 'সৃষ্টির' কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করেন, যে 'সৃষ্টি' অবঘাতন বা উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে অব্যাহত রয়েছে।

কীট, ভ্রূণতত্ত্ব ও তাদের রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমি আমার সামান্য গবেষণায় অনেক প্রমাণের মুখোমুখী হয়েছি। প্রকৃতি সম্পর্কে আমি যত বেশি গবেষণা করি এসব প্রমাণ আমাকে ততই মুগ্ধ করে। আমি আবারও বলছি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে নিশ্চয়ই আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের দিকে আমাদের মনকে আকৃষ্ট করবে।"

* কৃষি সম্পর্কিত জীব রসায়রে অধ্যাপক ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ওয়ান্ডার আসকার ল্যান্ডবার্গ বলেন–"আল্লাহর সত্তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে অন্যান্যদের তুলনায় বৈজ্ঞানিকদের একটি বিশেষ সুবিধা হচ্ছে, প্রতিটি নতুন নতুন আবিষ্কার আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে তার ধারণাকে আরও দৃঢ় করে। আবার বহুবিধ কারণ আল্লাহতে বিশ্বাসের অন্তরায় হয়ে থাকে। যেমন– নাস্তিকতা যে রাষ্ট্রের ধর্ম সেখানে আস্তিক মনোভাব প্রকাশ করার কোনো সুযোগ থাকে না। আবার দেখা যায় খ্রিস্টধর্মে অত্যন্ত ধীরে গতিতে অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মনে 'স্রষ্টার রূপে মানুষ' এরূপ একটি ধারণা গভীরভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

মানুষ যে স্রষ্টার ইচ্ছায় সৃষ্টি এমন ধারণা তারা পায় না। ফলে এসব মন যখন বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করে তখন তা বিজ্ঞানের যুক্তির কাছে অধিকতর অসংগত হয়ে উঠে। এতে আল্লাহ সংক্রান্ত ধারণাটি পুরোপুরিভাবে পরিত্যক্ত হতে পারে। কাজেই 'মানুষ আল্লাহর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট' এ ধারণা সকলের বর্জন করা উচিত।"

* আণবিক পদার্থবিদ্যা, প্রাণ পদার্থবিদ্যা, নিউটন বিকিরণের উপাদান ও আইসোটোপ বিশেষজ্ঞ, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী পল ক্লারেন্স ইবারসোল্ড– 'সামান্য দর্শনজ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর অধিক দর্শনজ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে' ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিক ফ্রান্সিস বেকনের এ উক্তিকে সন্দেহাতীত বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন–"মানব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, জাতি, গোত্রের অসংখ্য জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, অনুসন্ধিৎসু প্রতিটি ব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক, প্রতিপালক নিয়ে বিভিন্ন রহস্যময় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং পৃথিবীতে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন প্রতিটি প্রজন্মের সামনে এসব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে।

আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার গোড়ার দিকে আমি মানুষের বিচারশক্তি ও বৈজ্ঞানিক নিয়মের ক্ষমতায় এতই মোহিত হয়েছিলাম যে, মনে করেছিলাম বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় একদিন মহাবিশ্বের সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারবেন, জীবনের উৎস, কোথা থেকে বুদ্ধি এসেছে, এমন সবকিছুরই অর্থ করতে পারবেন। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে আমি যতই অধিক থেকে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করতে লাগলাম, পরমাণু থেকে ছায়াপথ, রোগজীবাণু থেকে মানুষ সম্পর্কে যতই জ্ঞান বাড়লো, ততই অধিক থেকে অধিকতর বিষয়ই আমার কাছে অব্যক্ত রয়ে গেল। বিজ্ঞান হয়তো জয়ের পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এ মহাবিশ্বে জীবন, মানুষ ও মন তখনও অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে। বিজ্ঞানীরা খুব ভালোভাবেই জানতে পারে যে, বিজ্ঞান কেবল 'কি করে' এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং 'কেন'-এর জবাব দিতে অক্ষম। এ 'কেন'-এর জবাব দিতে গেলে এখানে সৃষ্টিকর্তাকে টেনে আনতেই হয়।

আমরা একটি বিষয় উপলব্ধি করি যে, মানুষ ও এ মহাবিশ্ব একেবারে শূন্যতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়নি। নিশ্চয় এসবের একটা আরম্ভ আছে এবং এজন্য একটা আরম্ভকর্তাও রয়েছে।"

www.pathagar.com

* জীববিদ্যার অধ্যাপক, বিপাক ও সঞ্চালন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, শরীর বৃত্তবিদ বৈজ্ঞানিক মারলিন ক্রীডার বলেন–"সাধারণ মানুষ হিসেবে এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে আদৌ কোনো সন্দেহের স্থান নেই। নিশ্চয় একজন আল্লাহ আছেন, তবে তাঁর অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের নিয়ম মাফিক প্রমাণ করা যায় না। তিনি হচ্ছেন অপ্রাকৃতিক, আত্মিক, প্রজ্ঞাবান, সৃজনশীল, সর্বশক্তির আধার। বিজ্ঞান প্রকৃতি নিয়ে গবেষণায় যথেষ্ট অগ্রসর হলেও সকল সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণে অক্ষম, কিন্তু সেসব অস্তিত্ব অস্বীকার করাও যায় না, যেমন– প্রেম, আনন্দ, জ্ঞান, আত্মা প্রভৃতি।"

বৈজ্ঞানিক ক্রিডার শরীরবৃত্তবিদ হিসেবে মানুষ ও জীবদেহের আকৃতি ও কাঠামোর জটিলতা, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, মূত্রাশয়, মস্তিষ্ক, দেহের রাসায়নিক বিক্রিয়া, দেহের ঝাঁকুনি, রোগ-জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা, রাসায়নিক স্বাতন্ত্রতা, মহাবিশ্বের সৃষ্টি, প্রোটোপ্লাজম, সুপ্রজননবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা করে বলেন–"আলবার্ট আইনস্টাইন এ বুদ্ধিদীপ্ত সৃজনী শক্তিতে স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে এটাকে অসীম সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী শক্তি বলে উল্লেখ করে 'ব্যাপক মহাবিশ্বে' এ শক্তি প্রতীয়মান বলে মন্তব্য করেছেন। আর এ শক্তিকেই আমি আল্লাহ বলি। ---- আদিতে আমি অনন্ত শক্তি বা জড়পদার্থ দেখি না, দুর্জেয় কোনো অদৃষ্ট দেখি না, আদি মৌলিক পদার্থগুলোর আকস্মিক সমাবেশ দেখি না, কোনো মহান অজানাকেও দেখি না, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই পরম শক্তিমান আল্লাহকে।"

* মাইক্রোকেমিস্ট্রি ইলেকট্রোলিটিক ফেনোমেনা, রঞ্জনরশ্মি ব্যবচ্ছেদ এবং সিনথেটিক রেসিন বিশেষজ্ঞ, রিসার্চ কেমিস্ট্রি থমাস ডেভিস পার্কস্ বলেন– "------ আমি অজৈব এ বিশ্বে নিয়ম-শৃঙ্খলা আর সুপরিকল্পিত পরিকল্পনাই দেখতে পাই। আমি বিশ্বাস করি না আকস্মিকভাবে ও ভাগ্যক্রমে পরমাণু একত্র হওয়ার ফলে সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিকল্পনার জন্য একটা মনীষার প্রয়োজন, আর সে মনীষাকেই আমি আল্লাহ বলে অভিহিত করি।

আবার অনেক পদার্থের কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ আইনাবলীকে অবজ্ঞা করে যেমন, পানির সূত্রগত ওজন ১৮, যা সামান্য তাপ ও চাপে বাষ্পে পরিণত হওয়ার কথা অথচ তা হয় না। পক্ষান্তরে অ্যামোনিয়ার সূত্রগত ওজন ১৭ হওয়ায় বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ ও তাপে (৩৩ সেঃ) বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু এমনি সাধারণ চাপ ও তাপমাত্রায় পানি তরল থেকে জীব ও উদ্ভিদের সেবা করে যাচ্ছে, যা নাকি চিন্তাশীল মানুষকে একদণ্ড থমকিয়ে দেয়।" বস্তুত 'নির্বোধ প্রাকৃতিক আইন' কোনো এক ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন

www.pathagar.com

মহাবিজ্ঞানময় স্রষ্টারই সৃষ্টি। তাই 'প্রাকৃতিক আইন' কোনো কিছুরই স্রষ্টা হতে পারে না।

* জেনেটিক্স এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, জীববিদ্যা, শরীরবৃত্ত এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বিষয়ের অধ্যাপক, সুপ্রজননবিদ (পি.এইচ.ডি.) জন উইলিয়াম ক্লুট্স পবিত্র সত্যার্পণ থেকে বলেন–"..... স্বর্গ আল্লাহর মহিমা প্রচার করে এবং আসমান প্রকাশ করে আল্লাহর কারুকার্য, মূর্খের অন্তর বলে আল্লাহ নেই।"

তিনি আরও বলেন–"এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি এত জটিলতায় সমাচ্ছন্ন যে, এসব জটিলতাপূর্ণ সৃষ্টির মূলে অত্যন্ত বিচক্ষণ সত্তার প্রয়োজন, এ দুর্বোধ্য সৃষ্টি কোনোক্রমে অন্ধ, জ্ঞানহীন অদৃষ্টের বা দৈব্যের দ্বারা সমাধান সম্ভব নয়। বিজ্ঞান যথার্থই আমাদেরকে এসব জটিলতা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে সহায়তা করে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।"

* বিখ্যাত মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ ও প্রবন্ধকার অলিভার ওয়েনডেল উক্তি করেন– "জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে বিজ্ঞান ততই ধর্মকে তিরস্কার করা থেকে বিরত হয়। বিজ্ঞানকে উপযুক্ততার সাথে বুঝতে পারলে দেখা যাবে, সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর কার্যকরী।"

* প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ইউ, এস, মৎস্য ও বুনো প্রাণী সার্ভিস এবং উদ্ভিদের সাইটোলজী মারফলজী ও অ্যাসর্টলজী বিশেষজ্ঞ, প্রকৃতি বিজ্ঞানী ইরভিং উইলিয়াম নবল্চ বলেন–"..... অনেক জড় পদার্থের অতিশয় ক্ষুদ্র পরমাণু বিদ্যমান আছে বলে আমাদের (বিজ্ঞানীদের) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান সেগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। অণু আর পরমাণু প্রাণ সৃষ্টি করার জন্য একত্রিত হয়, শুধু দৈব আইনের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান কিছুতেই তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। ক্রমবিকাশের এ যুক্তিহীন থিওরীটি মেনে নেয়ার জন্য অন্ধ বিশ্বাসের প্রয়োজন, যে বিশ্বাস যুক্তিহীনতাকে স্বীকৃতি দান ছাড়া আর কিছুই নয়। যথার্থই বিজ্ঞান ঈমানের দাবিদার, যে ঈমান বা বিশ্বাস হচ্ছে ইন্দ্রিয়, কার্যকারণ ব্যবস্থা, কর্তৃত্ব এবং সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস। যদিও বিজ্ঞান কিছু ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা বিশ্বাসকে প্রমাণ করতে পারে, তথাপি একটি বিশেষ অর্থে এখানে বলা চলে যে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধর্ম ও বিজ্ঞান একই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাস সমর্থিত ও সুদৃঢ় হয়ে থাকে। আধুনিক

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং এক দিন এ মহাবিশ্ব ধ্বংস হবেই, এ ব্যাপারে বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পূর্ণ একমত।

বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে গবেষণাগারে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। তথাপি অনেক বিস্ময় নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীদেরকে এরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তুলেছে যে, অজানা কেউ অথবা সম্ভবত যাকে কোনো দিনই আনা বা আবিষ্কার করা যাবে না, এমনি কেউ এ মহাবিশ্বের বিশালত্ব আর সুনিপুণ নিয়ম শৃঙ্খলার জন্য দায়ী।"

তিনি আরও বলেন–"আমি মনে করি না যে, সর্বপ্রথম ইলেকট্রন-প্রোটন, পরমাণু, অ্যামাইনো-এসিড, প্রোটোপ্লাজম বা মস্তিষ্কটির জন্মের জন্য কেবল দৈব দায়ী। আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করি তার কারণ, আমার কাছে এসব কিছুর মূলে আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বই একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা হতে পারে।"

* এম, এস, সি, পি, এইচ, ডি রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক জার্নাল অব কেমিক্যাল এডুকেশনের এসোসিয়েট এডিটর রিসার্চ কেমিস্ট্রি জন লিও অ্যাবারনেথী বলেন–"আমরা নাস্তিকদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর সমাধানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। 'আল্লাহ আছেন কি?' এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আল্লাহ বলতে কি বুঝায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দিতে হবে। আল্লাহ বলতে যদি মহাবিশ্বের আইন শৃঙ্খলা বা পদার্থকে বুঝায়, তাহলে নাস্তিকরাও এতে বিশ্বাস করে। এ ক্ষেত্রে নাস্তিকরা বলে 'মহাবিশ্বের মৌলিক পদার্থের আইনাবলীর কাছে যতই আরাধনা করা হোক, আর তা যতই হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন, এসব মৌলিক পদার্থের কোনোটা স্বতন্ত্রভাবে বা একত্রে মিলিত হয়ে আপনাদের আরাধনার জবাব দেয়ার জন্য নিজে থেকে সামান্য অংশও হেলন করবে না।'

সেজন্য আমি আল্লাহ বলতে আইন-শৃঙ্খলাকেও বুঝি না, আবার দুনিয়ার প্রায় সব বড় বড় ধর্মের উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত আল্লাহতেও বিশ্বাস করি না। একমাত্র সেই আল্লাহতে আমার এক কণা আস্থা থাকতে পারে, যিনি ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মমতের খোদা-একমাত্র সেই স্বয়ংকৃত খোদা মহাবিশ্বের তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্র আমাদের এ পৃথিবীর প্রত্যেকের জন্য সারাক্ষণ চিন্তিত ও আগ্রাহান্বিত হতে পারেন।"

* কার্ল হেইম তার প্রকাশিত একটি বইয়ে লিখেন–"বিশ্বকাঠামোর চমৎকার গঠন নৈপুণ্য শুধু একজন চিন্তাশীল সৃষ্টিকর্তার প্রভাবকেই অনুমিতি দেয় না, সেই সঙ্গে অনুরূপ অনুমিতিকে আমন্ত্রণ করে থাকে। শিক্ষা ও যুক্তিবাদের যুগের মানুষ প্রকৃতি থেকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে পথে অগ্রসর হচ্ছিল, হঠাৎ

www.pathagar.com

যান্ত্রিকতা সেই পথ রোধ করে দেয়, কিন্তু বিশ্বব্যাপী যান্ত্রিকতা সম্পর্কিত মতবাদের ছেদ পড়ায় আবার সে পথ বর্তমানে খুলে গেছে।"

* রিসার্চ ফরেস্টার, উদ্ভিদ ও শরীরবৃত্তবিদ বৈজ্ঞানিক লরেন্স কল্টন ওয়ালকার বলেন–"প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সংশ্লেষক যে অণু প্রস্তুত করে, মানুষ যখন তার খুব কাছাকাছি পৌছার ভান করতে পারে মাত্র, তখন এ থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, এ সৃষ্টি প্রকৃত নিয়মবদ্ধ সৃষ্টির স্বাক্ষর।"

* জীব ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ রাসেল চার্লস আটিস্ট বলেন– ".....আমি মনে করি যে প্রত্যেকটি (জীব) কোষ এত জটিল আর নাজুক যে, এর সম্পূর্ণ কার্যক্রম এ পর্যন্ত গবেষণা থেকে বাদ পড়ে গেছে এবং আমাদের পৃথিবীর শতপরার্ধ প্রাণচঞ্চল দেহকোষ নিশ্চয় একটি যুক্তিসম্মত অনুমিতি পেশ করে, মনের বা মনীষার অথবা কল্পনা-শক্তির এ অনুমিতিকে বিজ্ঞান স্বীকারও করে, আবার মেনেও নেয়। তাই আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বিশ্বাস করি আল্লাহ আছেন।"

* ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানবিদ জর্জ হাবার্ট ব্লান্ট অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দার্শনিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে বলেন–"আস্তিক এবং নাস্তিক উভয় ধরনের বিশ্বাসেরই কোনো প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। তবে উভয় ধরনের বিশ্বাসীরাই নিজ নিজ বিশ্বাসকে যুক্তিসংগত মনে করেন। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় আস্তিকদের বিশ্বাস অনেক বুদ্ধিদীপ্ত ও যুক্তিসম্মত। পক্ষান্তরে নাস্তিকদের বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বিশ্বাস করি নিঃসন্দেহে 'যুক্তি' আস্তিকতার বন্ধু। বাইবেলের আদেশ হচ্ছে– 'প্রভু বললেন এখন আস এবং এসো আমরা যুক্তিকে একত্র করি'।

তিনি আরও বললেন–"বাস্তবতার অংশ হিসেবে কোন না কোন প্রকারের নিয়ম শৃঙ্খলা বা ক্রম বিদ্যমান। উক্ত ক্রম শূন্যতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে অথবা সম্ভবত আকস্মিকতা থেকে জন্ম নিয়েছে বলে প্রস্তাব করা একেবারেই অযৌক্তিক এবং সেজন্যই একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি যা কিছু দেখেন, তার মূলে এ মহাবিশ্বের একজন পরিকল্পনাকারী রয়েছেন বলে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেন। কাজেই আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করি, আল্লাহর উপর নির্ভর করি এবং আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা আল্লাহকে বহুবার দেখেছি, সেজন্যই আল্লাহ আমার দৈনন্দিন জীবনের কামনা বাসনার একটি অংশ।"

www.pathagar.com

আকস্মিকতা বিজ্ঞানের বিষয় নয়

অনেক বিজ্ঞানী গবেষণায় তাদের ত্রুটিপূর্ণ থিওরীতে 'থিওরী অব চান্স' বা আকস্মিকতা প্রয়োগ করেন। কিন্তু আকস্মিকতা কোনো বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। কার্যকারণ-সম্পর্ক ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে অপারগ হলেই এ আকস্মিকতা নিয়ে আসা হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যত থিওরীতে আকস্মিকতা আনা হয়েছে তার একটিও এ পর্যন্ত 'বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের' মর্যাদা পায় নাই; ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনাও আর নেই। আর এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আকস্মিকতা প্রয়োগকারী বিজ্ঞানী বা দার্শনিকরা প্রায় সবাই নাস্তিক। উদ্দেশ্যতাড়িত হয়ে এ কাজটি করে তারা মানুষকে বিজ্ঞানের নামে বিভ্রান্ত করে চলেছে।

নাস্তিকরা প্রকৃতির নির্বাচন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, ধারাবাহিকতা, সংগঠন, স্তরভেদ, রাসায়নিক সংমিশ্রণ প্রভৃতিকে বলেন আকস্মিক। তারা বলেন, এককোষী জীব থেকে বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। এক উদ্ভিদ থেকে অন্য উদ্ভিদ, এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী, এভাবে দুনিয়াতে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীকুল সৃষ্টি হয়েছে। 'এককোষী জীবন্ত অণুকোষ বা জীবন্ত প্রাণী কোটি কোটি বছর আগেও ছিল এখনও আছে' এটা আবিষ্কার হওয়ার পরই বিবর্তনবাদীরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নাস্তিকতাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে আকস্মিকতাকে এনে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর সৃষ্টি করেছে। বাস্তবের সাথে এর কোনোরূপ মিল না থাকলেও বিজ্ঞানের নকল নাস্তিক তৈরির যন্ত্র হিসেবে বেশ জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কিন্তু নাস্তিকরা আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের কোনো প্রমাণ দিতে সক্ষম নন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীবের গঠনশৈলী, পরমাণুর গঠন প্রণালী, মহাবিশ্বের গঠন প্রণালী ও সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা একজন মহাজ্ঞানী শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তার বাস্তব নিদর্শন, যা শুধু তাঁরই অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এটা প্রত্যক্ষ করেও নাস্তিক বিজ্ঞানীরা সত্য লুকাতে পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিবর্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকৃতি এনে জ্ঞান-পাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

অজানা সত্যকে চিহ্নিত করার জন্য কিছু জ্ঞাত তথ্যের ওপর নির্ভর করে একটি প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়, যাকে যুক্তিরূপে বা গবেষণার ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা যায়। এ প্রস্তাবনাকে 'বৈজ্ঞানিক ধারণা' বলা হয়। এ ধারণা সত্য বা মিথ্যা দুটোই হতে পারে অথবা এটা বৈজ্ঞানিকভাবেই পরিবর্তন বা বাতিলও হতে পারে। ধারণার পরে আসে 'থিওরী বা তত্ত্ব' এবং এটাও এক রকম

www.pathagar.com

ধারণা, তবে এটা হলো যুক্তিনির্ভর ধারণা। এটা সত্য আবিষ্কারের একটা ধাপ মাত্র। 'ধারণা' ও 'থিওরীতে' অনুমান বা কল্পনা থাকে তবে তাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও থাকে। এসব 'ধারণা' ও 'থিওরী' গবেষণাধীন থাকে। বৈজ্ঞানিকরা এর 'প্রকৃত সত্য' আবিষ্কারের জন্য বছরের পর বছর এমনকি শত শত বছর ধরে কঠোর অধ্যবসায় ও অক্লান্ত গবেষণার পর সকল বৈজ্ঞানিক একমত হয়ে এসব ধারণা ও থিওরীকে হয় 'প্রাকৃতিক আইন' বা 'বৈজ্ঞানিক সত্য' হিসেবে ঘোষণা করেন অথবা বাতিল করেন। 'সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে' গ্রীক দার্শনিকদের এ ধারণা ও থিওরী বাতিল হতে বহু শতাব্দী সময় লেগেছিল। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, যেখানে বানর থেকে মানুষ হয়েছিল এ বিবর্তনবাদ পরিত্যক্ত হতে প্রায় এক শতাব্দী সময় লেগেছিল।

বিজ্ঞান সত্য আবিষ্কারে নিয়োজিত একটি পদ্ধতি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আস্তিক বা নাস্তিক হওয়ায় তারা সবাই সবসময় 'সম্ভবনার তুলাদণ্ড তার নিজের দিকে ঝুঁকে আছে' এটাই দেখতে চায়। ফলে বিজ্ঞানে প্রকৃত সত্য আবিষ্কারে কিছুটা বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়। ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-নির্ভর দর্শন মানব জাতিকে অগণিত ধারণা ও থিওরী উপহার দিয়েছে এবং বাগাড়ম্বরে মানুষকে মুগ্ধ করেছে। এসবের কোনো বাস্তবতা ও সত্যতা না থাকায় বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ বিভ্রান্তই হয়েছে বেশি। থিওরী দেখেই তারা আত্মহারা হয়েছে, ধারণাকেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মনে করে বিভ্রান্ত হয়েছে। অনেক বৈজ্ঞানিক থিওরী যত না বিজ্ঞানের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তার চেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে নাস্তিকতার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। পূর্বে বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই ছিল জড়বাদী নাস্তিক। হালে বিজ্ঞানের অসংখ্য অত্যাধুনিক তথ্য-উপাত্ত আবিষ্কারের ফলে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞান বহু 'প্রাকৃতিক আইন' আবিষ্কার করেছে যার মূল্য অপরিসীম। যেসব আবিষ্কৃত তথ্য 'প্রমাণিত সত্য' এবং 'প্রাকৃতিক আইন' হিসেবে সত্যের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেগুলোর সাথে ধর্মগ্রন্থের রচনা ও সংকলনের পটভূমি বিবেচনায় রেখে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে মানুষ এরূপ পাইকারী হারে নাস্তিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ হত না। এর জন্য দায়ী বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থার ভিত্তিহীন থিওরীগুলো।

জড়ের অতীত ও ভবিষ্যত অজড় শক্তি

হালে নাস্তিক বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীদের অহমিকা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকলেও বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান সমগ্র মহাবিশ্বের ভর আকর্ষণ মারফত মেপে

www.pathagar.com

দেখেছে। শতকরা দশভাগ মাত্র দৃশ্যমান পদার্থ তাতে এটমও অন্তর্গত এবং বাকি শতকরা নব্বই ভাগ অদৃশ্য পদার্থ। এ নব্বই ভাগের আকর্ষণ আসছে অদৃশ্য থেকে, যা প্রায় অলৌকিক। এ দেখে বস্তুবাদী তথা জড়বাদী, নাস্তিক ও ধর্ম নিরপেক্ষবাদী বিজ্ঞানীরা হতভম্ব, বিস্ময়-বিমূঢ়। তারা দেখতে পাচ্ছে এবং তাদের এ উপলব্ধি এসেছে যে, 'বস্তু বা জড় অতীতেও জড় বা বস্তু ছিল না বরং শক্তি ছিল, যা অজড়। আবার ভবিষ্যতেও জড় আর জড় থাকবে না, ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সবকিছু শক্তিতে রূপান্তরিত হবে' এ তথ্য বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য। কি মহাবিশ্বে কি জীবদেহে সর্বত্রই সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ সাংগঠনিক কাঠামো বিদ্যমান। বিশ্বপ্রকৃতি কি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাংগঠনিক কাঠামোর দ্বারা প্রতিটি জড়, প্রাণী ও উদ্ভিদকে সুসজ্জিত করতে পারে? এসবের আদি উৎসকে নিশ্চয় কোনো মহাশক্তিশালী, ক্ষমতাধর, বুদ্ধিমান স্রষ্টা তাঁর সীমাহীন জ্ঞান ও সাংগঠনিক ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন এবং এর বিকাশ ধারায় যাবতীয় উৎপত্তি ও ধ্বংসের ধারা প্রবাহমান রেখেছেন। যেসব বিজ্ঞানীরা ডারউইনবাদকে বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, তাদেরই তথ্যানুসন্ধান আজ বিজ্ঞানীদেরকে পরম বিস্ময়কর এক 'স্রষ্টার' সাংগঠনিক ক্ষমতার মুখোমুখি করেছে। প্রাণীদেহের জটিল সংগঠন ও জীবনের ধারা প্রবাহে বিজ্ঞানী মাত্রই একজন মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার না করে কোনো উপায় থাকে না।

দেখা যাচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিই জড়বাদ বা বস্তুবাদ এবং বিবর্তনবাদের ধারণা নস্যাৎ করে দিয়ে বলছে, 'এক জীব অন্য জীবে রূপান্তরিত হয়নি, এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়নি। জড়ের অতীত ও ভবিষ্যত অজড় শক্তি। জীব উদ্ভিদ ও জড়জগত এক মহাশক্তিধর সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী স্রষ্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।'

বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান, গবেষণা ও পর্যালোচনায় সুস্পষ্টরূপে মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর উপস্থিতি সব কিছুতে, তার সৃষ্টিকুশলতা এত প্রকট যে মনে হয় তার উপস্থিতির স্বাক্ষর সর্বত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণার ফলাফল আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণকে সুদৃঢ় করেছে। যার ফলে নাস্তিক বিজ্ঞানীদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

বিশ্বাসের গুরুত্ব সবকিছুর উর্ধ্বে

মানব জীবনের সকল কার্যকলাপের মধ্যে বিশ্বাসের গুরুত্ব সবকিছুর উর্ধ্বে। যেমন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালালে নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে

www.pathagar.com

ক্রমবর্ধমান গতিতে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া যায়' এ বিষয়ে যার বিশ্বাস আছে তার পক্ষেই শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব, অন্যের পক্ষে গবেষণা করা অসম্ভব। আবার 'পরিশ্রম করলে উপার্জন করা যায়' এ বিষয়ে যার বিশ্বাস আছে তার পক্ষেই শুধু পরিশ্রম করে উপার্জন করা সম্ভব, অন্যের পক্ষে নয়। সুতরাং বিশ্বাসই হচ্ছে মানব জীবনে সকল প্রেরণার উৎস, সকল প্রকার কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি। সাধারণত পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কোনোকিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। যেমন–

১) দর্শন ইন্দ্রিয়–গাছপালা, তরুলতা, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি যা আমরা চোখে দেখে বিশ্বাস করি।

২) শ্রবণ ইন্দ্রিয়–ঘন্টাধ্বনি, গাড়ীর হর্ন, বক্তৃতা ইত্যাদি যা আমরা কান দ্বারা শুনে বিশ্বাস করি।

৩) ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়–নাক দ্বারা আমরা গোলাপ, বেলী, আম, কাঁঠাল ইত্যাদির গন্ধ অনুভবে বিশ্বাস করি।

৪) স্পর্শ ইন্দ্রিয়–শীত, তাপ ইত্যাদি ত্বকের স্পর্শে আমরা অনুভব করি।

৫) আস্বাদন ইন্দ্রিয়–টক, ঝাল, মিষ্টি ইত্যাদি আমরা জিহ্বার দ্বারা স্বাদ গ্রহণে বিশ্বাস করি।

আবার এমন কিছু বিশ্বাস আছে যা দেখা যায় না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবও করা যায় না। যেমন– আল্লাহ, ফেরেস্তা, জাহান্নাম, জান্নাত, পরকাল ইত্যাদি। দেখা যায় না এবং ইন্দ্রিয় শক্তিতেও অনুভব হয় না বলেই এ সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমরা জানি সকল ইন্দ্রিয়ের মূলেই হচ্ছে মস্তিষ্ক বা জ্ঞান-বুদ্ধি। মস্তিষ্কের অনুভূতি ও সাহায্য ছাড়া কোনো কিছুই দেখা বা অনুভব করা সম্ভব নয়, ফলে বিশ্বাস করাও সম্ভব নয়। সুতরাং মস্তিষ্ক হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে গঠিত মৌলিক ইন্দ্রিয়। তাই সরাসরি মৌলিক ইন্দ্রিয়ের অনুভবের বিশ্বাসকে বলা যায় 'মৌলিক বিশ্বাস'। প্রথমে বিজ্ঞানীরা কল্পনার উপর বিশ্বাস আনে এবং এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞান সামনের দিকে অগ্রসর হয়। বস্তুত 'কল্পনায়' বিশ্বাসের ওপরই বিজ্ঞানের ভিত গড়ে উঠে। সুতরাং বিজ্ঞানের পূর্বে 'বিশ্বাসই' অস্তিত্ববান, যা বিজ্ঞানেরই বিষয়।

সৃষ্টিজগত সম্পর্কে যে কোনো গবেষণার শেষ পর্যায়ে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রকটভাবে অনুভূত হয়। মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপরিকল্পককে বাদ রেখে পরিকল্পিত এ সৃষ্টিজগতের কথা কল্পনাই করা যায় না।

www.pathagar.com

এখানে 'জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়' যা দিবালোকের মত স্পষ্ট। যা অনুভব করা যায় তা বিশ্বাস করার নাম অন্ধ বিশ্বাস নয়, বরং যা দেখাও যায় না অনুভবও করা যায় না এ ধরনের বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাস বলা হয়। যারা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আল্লাহকে দেখে না বা আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না তারা 'অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির'।

সৃষ্টির সূচনা

পদার্থ বিজ্ঞানীরা আজ একটি পরীক্ষিত সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন যে, 'এ মহাবিশ্ব মহাসম্প্রসারণশীল'। বস্তুত Big Bang মডেলের উপস্থাপনা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্ভব হয়েছে এ পরীক্ষিত সত্যের জন্যই। তবে সম্প্রসারণের হার সম্পর্কে এখনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে তিনটি Big Bang মডেল পাওয়া যায়, যার একেকটি একেক ধরনের সম্প্রসারণশীল বিশ্বের কথা বলে। প্রথম মডেলে সৃষ্টির সূচনায় স্থান কালের একটি 'অনুপম বিন্দুতে' মহাবিশ্বের সকল ভর ও শক্তি জড়ো হয়ে সীমাহীন বস্তুঘনত্বের ফলে মহাবিস্ফোরণ থেকে এ মহাসম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সৃষ্টি। এ মডেলে দেখানো হয়েছে যে বিশ্ব ক্রমহ্রাসমান হারে সপ্রসারিত হচ্ছে, ফলে একদিন এ সম্প্রসারণ থেমে যাবে এবং বিশ্ব পুনরায় সংকুচিত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগুবে। দ্বিতীয় মডেলে বিশ্বের সম্প্রসারণ গতি ক্রমেই বাড়ছে। ফলে সংকোচন সম্ভব নয়। তৃতীয় মডেলে সম্প্রসারণের হার সমান, তাতে বিশ্বটা কেবল ধ্বংসের সম্ভাবনা এড়িয়ে যায়।

সৃষ্টির সূচনায় 'অনুপম বিন্দুতে' স্থান-কালের 'সীমানার শর্ত' এবং মহাবিশ্ব বিকাশের নীতি নির্ধারণকারী সত্তা বা ঘটনার প্রভাব বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করতে পারে না। অর্থাৎ প্রকৃতিবিজ্ঞানই বলে দেয় সে নীতি বা সীমানার শর্ত নির্ধারণকারী ঘটনার বা সত্তার উপস্থিতি অযৌক্তিক নয়। যেহেতু অনুপম বিন্দুতে সৃষ্টির সূচনা, সেহেতু অনুপম বিন্দুপূর্ববর্তী ঘটনা অবশ্যই সৃষ্টির উর্ধ্বে থাকে, ফলে প্রচলিত ভাষায় সে ঘটনার কার্যকরী নাম 'সৃষ্টিকর্তা' হতে পারে। আমরা সাধারণ মানবীয় বিশ্বাসে যাকে সৃষ্টিকর্তা বলি, সেরকম একটি সত্তার উপস্থিতি শুধু বিশ্বাসের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে যৌক্তিক ভিত্তি পেল প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণায়। এখানে বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রমাণ হয় 'আল্লাহ আছেন'। এ বিষয়টি এতকাল কেবল ব্যক্তি মানসের চিন্তার ও ধর্ম নেতাদের আলোচনার বিষয় ছিল। এখান থেকে বোঝা যায় সৃষ্টি পরম স্রষ্টার

www.pathagar.com

এক ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া মাত্র। দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা আজ সরবে স্রষ্টা বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। এটা মানব জাতির জন্য নতুন দিনের ইঙ্গিত কি না তা ভবিষ্যতেই জানা যাবে।

বস্তুজগত চেতনা হতে উদ্ভূত

এক কালে মনে করা হতো–বিদ্যুৎ, প্রাণ ও মন পদার্থ দিয়েই তৈরি। কিন্তু হালে এসে এ ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। এ ব্যাপারে বিখ্যাত বৃটিশ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেমস্ জীন্স বলেছেন–"জ্ঞানের স্রোত আজ 'অজড়' সত্যের দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে।"

ইলেকট্রন ও প্রোটন 'বিদ্যুৎকণা' মাত্র, জড় পদার্থ নয়। তবে এক দিক দিয়ে পদার্থের সাথে ইলেকট্রন ও প্রোটনের মিল আছে; পদার্থের মতই ইলেকট্রন ও প্রোটনের একটি ভর আছে। যে মুহূর্তে জড় পরমাণুর সৃষ্টি হয় সে মুহূর্তেই সৃষ্টিজগতে একটি নতুন নিয়মের সূচনা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বৈদ্যুতিক বিষয়কে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব। বিজ্ঞান আজ স্বীকার করে পদার্থকে শক্তিতে এবং শক্তিকে পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

পদার্থ বিজ্ঞানের কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে কণা, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এ শব্দগুলোর সাথে বিজ্ঞানের ছাত্রসহ সাধারণ শিক্ষিত মানুষও কম-বেশি পরিচিত, তা সত্ত্বেও এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কেউই এর সুস্পষ্ট জবাব দিতে পারে না। কারণ আলাদা আলাদাভাবে এগুলো প্রত্যক্ষ করার চেষ্টাকে বিজ্ঞান অনুমোদন করে না। তাই মানুষের আয়ত্তাতীত একটি রহস্যময় জগত যে নেই বা সম্ভব নয়, বিজ্ঞানীরা আজ আর সে কথা জোর দিয়ে বলতে পারছেন না।

এক সময় মনে করা হতো, মগজ হচ্ছে মনের কারখানা, কিন্তু হালে এ ধারণা পাল্টে বলা হয়, মনকে সক্রিয় করে তোলারই একটি যন্ত্র হচ্ছে মগজ। কিন্তু বিজ্ঞানের এ ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়; কারণ 'যন্ত্র একটি যন্ত্র' এ থিওরী উদ্ভাবনের ক্ষমতা যন্ত্রের নেই।

পদার্থ ও চেতনার মৌলিক ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তি আছে, কিন্তু 'এ্যানডোক্রিন গ্লান্ডে' এ চিন্তার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না বা এই গ্লান্ড চিন্তার জন্ম দেয় না।

আধুনিক বিজ্ঞান ধারণা দেয় 'মন একটি মৌলিক জিনিস এবং পদার্থ মন হতে উৎপন্ন'। এ সম্পর্কে জেমস্ জীন্স বলেন–"চেতনা মৌলিক এবং

www.pathagar.com

বস্তুজগত চেতনা হতে উদ্ভূত, চেতনা জড় পদার্থ হতে উদ্ভূত নয়, এই ভাববাদী থিওরীটি আমি বিশ্বাস করতে আগ্রহী।" বিজ্ঞানজগতের দিকপাল, কোয়ান্টাম থিওরীর প্রতিষ্ঠাতা, ম্যাক্সপ্লাঙ্ক-এর মতে-"চেতনার ব্যাখ্যা জড় পদার্থ এবং জড় পদার্থের নিয়ম দ্বারা করা যায় না, মন হতে বস্তুর উদ্ভব, এটাই আমার বিশ্বাস। আমরা যে বিষয়ে কথা বলি, যা কিছুরই সত্তা বা অস্তিত্ব আছে বলে মনে করি তার প্রত্যেকটিরই মূলে আছে চেতনা।"

বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রোডিংগারও প্রায় একই মত পোষণ করে বলেন-"পদার্থ বলতে আমরা যা বুঝি সে অর্থে চেতনার ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ চেতনা খাঁটি মৌলিক বস্তু। অন্য কোনো অর্থে আমরা চেতনার কারণ নির্দেশ করতে পারি না।"

বিজ্ঞানজগতে সুপরিচিত বৃটেন ত্যাগী বৃটিশ বিজ্ঞানী জে. বি. এস হোল্ডেন-এর মতে-"পদার্থ ও প্রাণীবিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে সেভাবে চেতনার বর্ণনা করলে ভুল হবে।" এ বিষয়ে বিজ্ঞানী এডিংটন আরও স্পষ্ট করে বলেন-"অন্তরতম সত্তা কখনও এবং কিছুতেই জড় জগতের অংশ হতে পারে না।" বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতে-"মন এবং চেতনা মৌলিক জিনিস।"

বিজ্ঞান বলে, প্রোটোপ্লাজমিক বা জৈব জীবন (জীবাত্মা) ও মানবিক জীবন (পরমাত্মা) পরস্পর সম্পর্কিত। আমরা যেসব অবস্থাকে পদার্থ, মন ও জীবন বলে জানি তা কোনো এক অজ্ঞাত ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্তর হতে পারে। দেহ, প্রাণ ও মনের সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট, কিন্তু এ সম্পর্ক কিভাবে গড়ে ওঠে সে রহস্য আজও অজ্ঞাত।

এক কালে মানুষ মনে করত, 'চেতনা মগজের একটি ক্রিয়ামাত্র, আর মগজ একটা যন্ত্রবিশেষ।' কিন্তু আধুনিক যুগে গভীরতর চিন্তাধারা হতে এ বিশ্বাসই জন্মায় যে, চেতনা মগজের একটা ক্রিয়া নয় বরং চেতনাই মগজকে একটা যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ চেতনা মগজ থেকে সৃষ্টি হয় না। বরং চেতনাই মগজকে জাগ্রত করে। আর মন হচ্ছে মুক্ত ও স্বাধীন এবং সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী।

মন দ্বারা সৃষ্টিজগত তৈরি, অর্থাৎ মন ও সৃষ্টিজগত বিচ্ছিন্ন নয়, তবে এ সম্পর্কের সেতুটি আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এ সম্পর্ক এমন কিছুর ওপর নির্ভর করে যা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। বুঝার সুবিধার জন্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা এ সত্তার একটা নাম দিবার চেষ্টা করেছেন। এডিংটনের মতে এ সত্তার নাম দেয়া যেতে পারে 'চিদ-সত্তা' (চেতনা বা

www.pathagar.com

Mind staff)। বিশ্বের মূল সত্তা জড় নয়, মন ও পদার্থ এ দুইয়েরই উৎস হচ্ছে এ 'চিদ-সত্তা'।

জড়বিশ্ব, জীবন ও মন, এসবের পশ্চাদ ভূমিতে 'চিদ্-সত্তা' নামক একটা কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং সেটা থেকেই বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টি হচ্ছে, বিজ্ঞান-দর্শনে এ বিশ্বাস ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের মনই কোনো না কোনোভাবে এক 'বিশ্বমনের' সাথেই সম্পর্কিত। কেউ কেউ এ বিশ্বমনের নাম দিয়েছেন 'চিদ-সত্তা'। আবার কেউ কেউ বলেন, এটিই 'বিশ্বসত্তা'। দার্শনিক রাসেল একেই বলেছেন Neutral staff বা 'নিরপেক্ষ সত্তা'।

বিজ্ঞান জানিয়ে দেয়, আমরা যদি জড়পদার্থকে বিভাজন করি তাহলে পাই অণু, অণুকে বিভাজন করলে পরমাণু; পরমাণুকে বিভাজন করলে পাব ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন; ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনকে বিভাজন করলে আলফা, বিটা, গামা-রে বা আলোক রশ্মি; এবং আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতি রশ্মিকে বিভাজন করলে পাওয়া যায় শক্তি। আর এভাবে শক্তিকে বিভাজনের পথ ধরেই হয়তো বিজ্ঞান একদিন প্রবেশ করবে মনোজগতে। পেয়ে যাবে আত্মার ঠিকানা। তখন হয়তো প্রমাণ হবে মন ও প্রাণ দিয়েই জড়জগত সৃষ্টি। যারা স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমান পেতে চায় তাদেরকেও হয়তো এ পথ ধরে এগুতে হবে অনেক দূর। সৃষ্টির বিভাজন যেখানে শেষ স্রষ্টার অস্তিত্ব সেখানে শুরু। এখানে চিন্তার জগতে বেশ প্রকট হয়ে উঠে অদৃশ্য শক্তিসত্তা 'স্রষ্টা'র অস্তিত্ব। আবার বিজ্ঞান স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণও খুঁজে পায় না।

উপরের আলোচনায় অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে যে, এ মহাবিশ্ব একজন মহান স্থপতি বিশ্বমনীষার কল্পনা বা মানসিক ক্রিয়া মাত্র। অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়াশক্তি থেকেই বস্তুর উৎপত্তি, আর এ শক্তি, মন ও প্রাণ এক মহাশক্তি থেকে আগত শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন স্তর। এ সম্পর্কে একজন মুসলিম মনীষী শাহ ওয়ালীউল্লাহ র. বলেছেন, "আমরা যাকে জড় বলে মনে করি তা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, কারণ জড়-পদার্থ আল্লাহর সিফাত, আর রহমানেরই অভিব্যক্তি।

প্রাচীন পন্থী জড়বাদী বিজ্ঞানীরা মনে করেন এবং সততা ও আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাসও করেন যে, মানুষের জীবন অহেতুক, এর মূলে কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য নেই। এসব বিজ্ঞানী সম্বন্ধে 'হোয়াইট হেড' একটি চমৎকার ব্যাঙ্গোক্তি করেন- "যেসব বিজ্ঞানী 'জীবন উদ্দেশ্যহীন' একথা প্রমাণ করার জন্য জীবনপাত করেন তাদের জীবন সত্যিই একটি অধ্যয়নের বস্তু"।

www.pathagar.com

বুদ্ধি ও চিন্তাকে একটি অজ্ঞাত শক্তি বা কারণ ধাক্কা দিয়ে আলোড়িত বা আন্দোলিত করে। এ শক্তি বা কারণকে আমরা স্থূল চোখে দেখি না, অথচ এর ক্রিয়া দেখে উপলব্ধি করি। আদিকাল থেকে মানুষ এ শক্তি বা কারণকে আল্লাহ, গড, ঈশ্বর এসব নামে অভিহিত করে, যা অস্বীকার করার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। প্রকৃত পদার্থবিজ্ঞানী যেমন ইলেকট্রন-প্রোটন চোখে দেখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, তেমনি সত্যিকার বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন সৎ মানুষও স্রষ্টাকে চোখে দেখার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করেন না। কারণ স্রষ্টায় বিশ্বাস করার জন্য চোখের দেখা শর্ত নয়। মানুষ সুখ-দুঃখ, প্রেম-ব্যথা চোখে দেখে না, আবার এর অস্তিত্ব অস্বীকারও করে না। অথচ নিজে সৃষ্টি হয়েও স্রষ্টাকে চোখে দেখে না বলেই বহু মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চায় না। তারা বলে ধর্মে কোনো নীতি-নৈতিকতা বা মানবতা বলতে কিছু নেই। আবার এইড্‌স-এর মত জটিল বিষয়গুলোর প্রশ্নে বিশ্বমানবতা আজ নৈতিকতার শিক্ষা নিতে ধর্মের কাছেই হাত পাতে।

বিজ্ঞান থেকে এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাদ দেয়া যায় না, কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুক্তি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় বিজ্ঞানের প্রায় সবগুলো বৃহৎ আবিষ্কারের সূত্রপাত হয়েছে অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক, অভাবিত ও অপরিকল্পিত উপায়ে। যেমন– চৌবাচ্চায় গোসল করতে পানি উপচে পড়ার কারণ থেকে আর্কিমিডিসের সূত্র আবিষ্কার হয়। অলস-অবসরে গাছের নিচে বসে থেকে গাছ থেকে ফল পড়তে দেখে বৈজ্ঞানিক নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্রটি আবিষ্কার করেন, যা নিউটনের সূত্র নামে পরিচিত।

বৈজ্ঞানিক সুশৃঙ্খল গবেষণা করাকে এড়িয়ে অলস-অবসরে আকস্মিক-ভাবে যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলোর সূত্রপাতের কারণ মানুষ ব্যাখ্যা করতে পারে না। মানুষ এসবের কারণ খুঁজে পায় না। এখানেই পঞ্চইন্দ্রিয়-বহির্ভূত বিষয়ের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের কথা এসে পড়ে। তাই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, পদার্থ বিজ্ঞানী চার্লস এইচ টাওনেস বলেন, "কঠিন শ্রমের পর এবং জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনার শেষে কখন কখন বিজ্ঞানী তাঁর প্রশ্নের মীমাংসা পেয়ে যান। এ জাতীয় সমাধান বেশিরভাগ সময়েই আসে অলস মুহূর্তগুলোতে এবং তথ্যাদি নিয়ে ঘাটাঘাটির সময় খুব কমই আসে।" এখানে তিনি বলতে চান প্রায় সকল বৃহৎ বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সফলতাগুলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটেনি, বরং অনেকটা দিব্যদৃষ্টি বা প্রত্যাদেশের অনুরূপ মাধ্যমেই তা ঘটে থাকে। এ সকল বৈজ্ঞানিক আলোচনার মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদের অসারতার ওপর 'আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ' যথার্থই প্রমাণ হয়।

www.pathagar.com

যারা বলে আল্লাহ নেই তাদের সামনে সত্য-জ্ঞান প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা নেই। যারা মনে করে আল্লাহ নেই অথবা আছে বা থাকতেও পারে, সম্ভবত তাদের সামনে সঠিক জ্ঞান প্রকাশের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। একারণেই বিখ্যাত মার্কিন চিকিৎসাবিদ অলিভার ওয়েন্ডেল উক্তি করেন–"জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে বিজ্ঞান ততই ধর্মকে তিরস্কার করা থেকে বিরত হয়। বিজ্ঞানকে উপযুক্তভাবে সাথে বুঝতে পারলে দেখা যাবে, সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর কার্যকরী।" বিজ্ঞানীদের যুক্তিতে স্রষ্টাই যখন সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তখন এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পিছনে অবশ্যই স্রষ্টার একটা উদ্দেশ্যও থাকে।

নাস্তিক বিজ্ঞানীরা বলে থাকে, Un seen is nothing. যাকে দেখা যায় না তার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। কিন্তু কোনো কিছু অস্তিত্ববান হলেই তার আকার থাকতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও আমরা দেখি না। যেমন–আত্মা, জ্ঞান, শীত, তাপ, ব্যথা, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকলেও আমরা তা চোখে দেখি না। এসব সৃষ্টিই যদি নিরাকার হতে পারে, তবে এসব সৃষ্টির স্রষ্টা আকার থেকে আরও বহু গুণ পবিত্র হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমরা যা কিছু চোখে দেখি তা সবই সৃষ্টি। কিন্তু স্রষ্টা যেহেতু সৃষ্টির পূর্ববর্তী সত্তা সেহেতু স্রষ্টাকে চোখে দেখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এখানে কারও মনে যদি প্রশ্ন আসে, এমন নিরাকার সত্তা এত শক্তিশালী হয় কীরূপে ? দেখা যায় এটম বোমা বা পারমাণবিক বোমায় কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার হয়, যার পরমাণুগুলো আইসোটোপ দ্বারা বিভাজিত হতে হতে যখন চূড়ান্ত সূক্ষ্মতায় পৌঁছে, তখনই তা থেকে অভাবনীয় শক্তি নির্গত হয়। আবার হেমিওপ্যাথিক ঔষধের বেলায় দেখা যায় এ্যালকোহল দ্বারা বিভাজিত করে মূল ঔষধের পরিমাণ যতই কমানো হয়, সূক্ষ্মতা বাড়ার সাথে সাথে ঔষধের শক্তিও ততই বৃদ্ধি পায়। আবার মানুষের আত্মা সূক্ষ্ম ও নিরাকার হওয়াই দেহের চেয়ে তা অধিক শক্তিশালী। কাজেই স্রষ্টা নিরাকার ও অসীম শক্তিশালী হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু নাস্তিকরা যুক্তিতে বিশ্বাসী নয়, তারা শুধু নাস্তিকতায় বিশ্বাসী।

রিপুর তাড়নায় বিবেক যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখনই মানুষ নিজের ভারসাম্য হারিয়ে উদভ্রান্তের মত হতাশায় হাবুডুবু খেতে থাকে। হতাশাগ্রস্থ মানুষ স্ববিরোধিতায় ভোগে এবং সবকিছুরই বিরোধিতায় আচ্ছন্ন থাকে। নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে থেকে এরা ধর্ম-কর্ম, সমাজ, সবকিছুকেই অসার বলে অনুভব করে। এমনি দশায় এরা জীবন যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের মত আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতে থাকে এবং স্নায়ুর চাপে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে মুরোদহীনের

www.pathagar.com

মত আশেপাশের সবকিছুকে তছনছ করে দিতে বৃথা আস্ফালন শুরু করে। এসব আশাহত মানুষেরা একুল-ওকুল দু-কুল হারিয়ে নতুন পথ খুঁজতে থাকে, যার পরবর্তী রূপ আস্থাহীনতা। আস্থাহীন মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী নয়। বিধায় এরা নাস্তিক এবং এদের চিন্তা চেতনার ফসল বা মতবাদ হলো নাস্তিক্যবাদ। নাস্তিকতার সমর্থনে কোনো যুক্তি নেই বা জ্ঞানচর্চার কোনো অবলম্বন নেই। এরা অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন গলির অধিবাসীর মত। এরা আল্লাহতে বিশ্বাসীদের সহ্য করতে পারে না। নাস্তিক ও তাদের দোসররা সত্য থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়ে বিকারগ্রস্থ লোকের মত বলতে থাকে 'ধর্মে কোনো সত্য নেই, আছে প্রচুর মিথ্যা আর আদিম মানুষের ব্যাপক আত্মবিশ্বাস'।

তাই মহাকবি শেখ সাদী বলেন—

"হতাশ ব্যক্তির আক্রোশ বাড়ে,
নিরাশ ব্যক্তিরা প্রলাপ বকে,
পরাজিত বিড়াল থাবা উচিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে
আক্রমণে উদ্যত হয়।"

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা যুক্তিযুক্তভাবে পেয়ে যাই 'এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূলে একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন'। সুতরাং নাস্তিকতার মোকাবিলায় আস্তিকতাই অধিকতর সঠিক। এখানে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে নাস্তিক্যবাদের কবর রচিত হলেও আস্তিক আর নাস্তিকের মতদ্বৈধতা সুদূর অতীতের, তাই এ দ্বন্দ্ব কোনো দিন শেষ হবার নয়। কারণ নাস্তিকরা 'যুক্তিতে' বিশ্বাসী নয়, তারা 'সত্য অস্বীকারে' বিশ্বাসী। তবুও সত্যান্বেষী মানুষেরা যুগে যুগে সত্য অস্বীকারকারী নাস্তিকদের উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাই সত্য সন্ধানীদের এ ধারা বজায় রাখতে এখানে ধর্মীয় আলোচনা প্রাধান্য পাচ্ছে।

আস্তিক আর নাস্তিকের দ্বন্দ্বই শেষ নয়। শুধু আস্তিকদের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব রয়েছে, যা আরও জটিলতাপূর্ণ। তবে পারস্পরিক সমঝোতা ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মীয় আলোচনা করলে সকল জটিলতা নিরসন সম্ভব। অর্থাৎ পারস্পরিক সমঝোতায় বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধকে এগিয়ে নেয়া যায়। তাই ধর্মীয় আলোচনার শুরুতেই আমি সবিনয়ে বলে রাখি, এখানে আমি কারও ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দিতে বসিনি বা মানদণ্ডের পাল্লাটাকে নিজের দিকে হেলে নিতেও চাইনি। আমি শুধু সত্য উৎঘাটনের লক্ষ্যে যুক্তিসহকারে পাঠকদের সামনে সঠিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে দিয়ে তাদেরকে নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা করতে বলছি মাত্র।

www.pathagar.com

পারসিক ধর্মের পরিচয়

ইরানের প্রাচীন পারসিক ধর্মের প্রবর্তক জরথুষ্ট্র আজও লাখ লাখ মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব প্রাচীনতার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে আছে। এমনকি তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কেও ইউরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিতমহল সন্দেহ পোষণ করেছেন। প্রাচ্যবিদদের মধ্যে যারা তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন তারাও বহু ধারণা ও অনুমানের ওপর নির্ভর করে তাঁর জীবন বৃত্তান্তের কিছু কিছু বিষয় নির্ধারণ করেন। কিন্তু তাও বিভিন্ন পণ্ডিতমহলে পরস্পর বিরোধী মতের সংঘর্ষে এতই সন্দেহপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, কোনো ব্যক্তি তার ওপর নির্ভর করে নিজের জীবনের কর্মনীতির ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। এজন্যই (Kern) কের্নও জরথুষ্ট্রের ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি অস্বীকার করেছেন।

পারসিকদের ধর্মগ্রন্থের নাম জিন্দাবেস্তা এবং তারা দুই খোদায় বিশ্বাসী। একজন মঙ্গলের খোদা-'অরমুজদ' অপরজন অমঙ্গলের খোদা- 'অহরমিন'। অর্থাৎ একজন সৃষ্টি করছেন, নিয়ন্ত্রণ আর পরিমাপ করে সবার জন্য খাদ্য বন্টন করছেন। আর অপর খোদা ঝড়, শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ, দুঃখ-কষ্ট, জড়া-ব্যধি, মৃত্যু ও প্রলয় ঘটিয়ে থাকেন।

বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয়

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধের জীবন ও চরিত্রকে ইতিহাসের আলোকে স্থায়িত্ব দান করা অত্যন্ত কঠিন ও দুষ্কর ব্যাপার। এমনকি তাঁর আবির্ভাব কালটি নির্ধারণ করারও কোনো বিশ্বস্ত প্রমাণ না থাকায় মগধ দেশের রাজাদের বিবরণ থেকে তা নিরূপণ করা হয়ে থাকে। অথচ এ ধর্মটি প্রাচীন এশিয়ার সবচাইতে ব্যাপক প্রচারিত ধর্ম, যা এক সময় ভারতবর্ষ, চীন, সমগ্র মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজও বার্মা, থাইল্যান্ড, ইন্দোচীন, জাপান ও তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমান আছে। এ ধর্মের মূল গ্রন্থের নাম- 'ত্রিপিটক'।

www.pathagar.com

হিন্দু ধর্মের পরিচয়

হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবি অনুযায়ী তারা দুনিয়ার সবচাইতে প্রাচীন জাতি। যদিও প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, তবুও এ ধর্মের ইতিহাস প্রাচীনতার অন্ধকারে এতই আচ্ছন্ন যে, তা থেকে সঠিক ব্যাপার উদঘাটন করা বড়ই কঠিন। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক কে ছিলেন তাও জানার কোনো উপায় নেই।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষের আদিবাসী নিসাদ ও কিরাতরা সিন্ধু অববাহিকায় যাযাবর জীবনযাপন করত। পরে এশিয়া মাইনর থেকে আসা দ্রাবিড়রা অনার্য জাতিরূপে সিন্ধু নদের উপকূলে বসতি স্থাপন করে। নিসাদ, কিরাত ও দ্রাবিড়রা বুনো জীবজন্তুর সাথে জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্বতে, গিরিকন্দরে বাস করে ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত। তাদের মুখে ভাষা না থাকায় সুখ-দুঃখে, বিপদে-আপদে সংকেত ধ্বনি উচ্চারণ করত। এমনি ধারায় তারা সমাজবদ্ধ হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনের শুরুতেই তারা ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের গলিত লাভা উৎক্ষেপণ, জোয়ার-ভাটা, প্লাবন প্রভৃতিকে অতি প্রাকৃতিক দেব-দেবীদের আক্রোশজনিত উৎপীড়ন মনে করে নিষ্কৃতি লাভের আশায় দেব-দেবীদের খুশি করতে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা-পার্বণের আভাস মেলে।

কালের স্রোতে প্রয়োজনের তাগিদে তারা কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে শুরু করে। কিন্তু এ শেখা শব্দে তারা 'স'-কে 'হ'-এর মত উচ্চারণ করে। এ উচ্চারণ সংকটে সিন্ধু নদ 'হিন্দু নদ' উচ্চারিত হয়, ফলে সিন্ধুপোকূলবাসীরা সবাই স্থানের পরিচয়ে হিন্দু হয়ে যায়। এ হিন্দু জাতি পরবর্তীতে 'হিন্দু ধর্মে' রূপান্তরিত হয়।

মূলত নিসাদ, কিরাত ও দ্রাবিড়রাই ছিল সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকারী। পরে আর্য নামে এক দুধর্ষ যাযাবর জাতি এসে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে এবং দাসে পরিণত করে সেখানে বসতি স্থাপন করে। এখান থেকেই হিন্দু ধর্মে বর্ণবৈষম্যের সূচনা হয়। আর্য ও অনার্য জাতির সংমিশ্রণে নানা প্রকার শত্রুতা ও কোন্দলের ফলে বেদ উপনিষদ ভিত্তিক হিন্দু ধর্মে দেব-দেবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ভারত বর্ষের মূল আর্য ধর্ম বৈদিকতা হারিয়ে বেশ কিছু সময়ের পর ব্রাহ্মণবাদী হিন্দু ধর্মে রূপ নেয়। বেদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে তারা বৈদিক যুগের ৩৩ জন অনুপাস্য অবতারের স্থলে গড়ে তুলল ৩৩ কোটি দেব-দেবী।

www.pathagar.com

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলো হচ্ছে–প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্বে মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস রচিত-মূলগ্রন্থ 'বেদ' এবং পরে তিনি বেদ অবলম্বনে মহাভারত, গীতা ও পুরাণ রচনা করেন। ঋষি মনু রচিত-মনুসংহিতা এবং কীর্তিবাস রচিত-রামায়ণ। মানব রচিত রাজ-রাজাদের বিভিন্ন কাল্পনিক ও যুদ্ধের ঘটনাসম্বলিত এ গ্রন্থদুটোর কোনোটিই ঐশীগ্রন্থ নয় বলে অনেকে মনে করেন।

হিন্দুরা স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টির আরাধনা করে। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর এ ধর্মের বর্ণাশ্রম-প্রথা হিন্দু সমাজকে একেবারে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। এ ছাড়া সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধকরণ এবং নারীদের একাধিক পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক যা একান্ত অমানবিক। পরবর্তীতে অবশ্য আইন করে এ সমস্ত অমানবিক ধর্মীয় প্রথার রদবদল করা হয়েছে। এখান থেকেই প্রমাণ হয় এ প্রথাগুলো ঐশীপ্রথা নয়, বরং এগুলো স্বার্থান্বেষী মানব রচিত প্রথা।

বর্তমানে হিন্দুধর্মে দেবদেবীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু তাদের জীবন চরিত অশ্লীলতায় এতটাই পরিপূর্ণ করা হয়েছে যে, সেগুলো একেবারেই আলোচনার অযোগ্য। কেউ কেউ মনে করেন হিন্দু ধর্মের স্বার্থান্বেষী মহল তাদের আপন স্বার্থে অবাধ ভোগের আশায় অশ্লীলতাকে বৈধ করতে নিজেদের কলমের খোঁচায় দেবদেবীদের চরিত্রে কালিমা লেপন করেছে। যদিও বাস্তবে হিন্দু সমাজ বর্তমানে যথেষ্ট রক্ষণশীল, তবুও তাদের শাস্ত্রে ওই সমস্ত অশ্লীলতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

যেমন–হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রে ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই যে পঞ্চসতীকে স্মরণ করার বিধান দেয়া হয়েছে তাদের পরিচয় হচ্ছে–(১) অহল্যা ঃ গৌতম ঋষির স্ত্রী। পরমা সুন্দরী এ নারীকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতুমঋষির রূপ ধরে এসে ধর্ষণ করেছিলেন। এ দেবরাজই আবার লক্ষীন্দরের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী বেহুলাকে অসহায় পেয়ে স্বামীর জীবনদানের আশ্বাস দিয়ে ধর্ষণ করেন।

(২) কুন্তি ঃ পাণ্ডুর স্ত্রী। বিয়ের আগেই তার কুমারী জীবনে সূর্য্যদেবতা কর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে মহর্ষি কর্ণের মাতা হন। আবার বিয়ের পর স্বামীকে ফেলে অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম দেন।

(৩) দ্রৌপদী ঃ অর্জুনের স্ত্রী। অর্জুন মাতা কুন্তির পরামর্শে পাঁচ ভাই (পঞ্চপাণ্ডব) মিলে দ্রৌপদীকে ভোগ করতো। পাঁচ ভাইয়ের ভোগ্যতা হয়েও দ্রৌপদী তৃপ্তি মিটাতে দুঃশাসন, জয়দ্রথ ও কীষকর স্পর্শ লাভ করে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেবের উপস্থিতিতে দেবতাদের সভা মাঝে দুঃশাসন দ্রৌপদীর

www.pathagar.com

বস্ত্রহরণ করে দিগম্বর করলেও সকল দেবতা নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করেন, কেউ কোনো প্রতিবাদ জানাননি।

(৪) তারা ঃ বালির স্ত্রী। বালি বধের পর স্ত্রী তারা দেবর সুগ্রীবের ভোগ্যতা হয়ে থাকে।

(৫) মন্দোদরী ঃ রাবণের স্ত্রী। রাবণ বধের পর দেবর বিভীষণের প্রেমাসক্ত হয়ে বিয়ে করে রাজরাণী হন, যদিও বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। আবার রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলায় কৃষ্ণ কতৃক রাধার বস্ত্রহরণ, স্ত্রী লিঙ্গে-প্রবিষ্ঠ শিব-লিঙ্গের পূজা প্রভৃতি যথার্থই দেবদেবীদের অশ্লীলতার সাক্ষ্য বহন করে।

এভাবে হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রে অশ্লীলতা দেবদেবীদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। অথচ দেবদেবীদের চরিত্র পূতপবিত্র হওয়া উচিত ছিল। এ ছাড়া অনেকের মতে বর্তমানে উদ্ভূত সতীপূজা এবং কুমারীপূজাও অশ্লীলতার একটা বড় উদাহরণ। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে এসমস্ত অশ্লীলতা বন্ধ হওয়া উচিত বলে অনেকেই মনে করেন। সাধারণভাবে বলা যায়, জৈবিক অশ্লীলতা কোনো ধর্মীয় বিষয় হতে পারে না। এখান থেকেই হিন্দু ধর্মের বিকৃতির আভাস মেলে।

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরত্বের ধারণা খুবই জটিল ও দুর্বোধ্য। তাদের মতে, "(১) ঈশ্বর-ঈশ্বরী, (২) ভগবান-ভগবতী, (৩) ব্রহ্মা-সাবিত্রী, পার্বতী, (৪) পরমেশ্বর- পরমেশ্বরী, (৫) শিব-দুর্গা, (৬) নারায়ণ-নারায়ণী, (৭) কামদেব-কামদেবী, (৮) বিষ্ণু-সুমতী, (৯) মহেশ্বর-মহেশ্বরী।" এ সব সৃষ্টিকর্তার শরীক অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার-পরিজন সবই আছে।

ব্রহ্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, "প্রথমে সমুদয়ই তমাসাচ্ছন্ন ছিল। পরে বিরাট মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সে জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সে বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হলে তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মারূপে অবস্থান করেন। পরে উক্ত অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক ভাগে আকাশ ও অপর ভাগে পৃথিবীরূপে সৃষ্টি হয়। অতঃপর ব্রহ্মা দশজন দেবতা (প্রজাপতি) সৃষ্টি করেন, যথা–মরীচি, অত্র, অঙ্গিরা, পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু, বলিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ। এসকল দেবতারা কেউই মানব নয়, তারা সকলেই ছিলেন অতিমানব। ব্রহ্মা দেবর্ষী নারদকেও সৃষ্টি কার্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাতে ঈশ্বর সাধনার ব্যাঘাত হবার আশঙ্কায় নারদ এতে অস্বীকৃত হলে ব্রহ্মা অভিশাপ প্রদানে তাকে গন্ধর্ব ও মানবরূপে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করেন।"

ব্রহ্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছেন, তিনিই চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, স্থল, অগ্নি, বৃক্ষ ইত্যাদি। এ জন্যই হিন্দুরা এবং অন্যান্য মোশরেক জাতি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি, বৃক্ষ প্রভৃতির পূজা করে থাকেন। কিন্তু আমরা জানি স্রষ্টা

www.pathagar.com

ও সৃষ্টি এক নয়। সৃষ্টির ইচ্ছাতে স্রষ্টার জন্ম হয় না, বরং স্রষ্টার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়। তাই নবী-রাসূল, দেব-দেবী, ঋষি-দেবর্ষী, মানব-দানব, জড়-চেতন যা কিছুই হোক না কেন যা একবার অন্য শক্তির ইচ্ছায় জন্মলাভ করেছে সে পরমশক্তি আল্লাহ্ বা ঈশ্বর হতে পারে না। যে বিরাট মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করেন সে মহাশক্তিই একমাত্র ক্ষমতাধর আল্লাহ বা ঈশ্বর হতে পারেন।

পণ্ডিতপ্রবর হিরেন্দ্রনাথ দত্ত ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে পরিষ্কার বলেছেন– "দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এক উত্তর মিমাংসা বা বেদান্ত দর্শন ভিন্ন অন্যান্য দর্শনের উদ্ভাবিত দুঃখহানির প্রণালীর সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নয়। সংখ্যা ও পূর্ব মিমাংসাতে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ন্যায় ও বৈষয়িক দর্শন ঈশ্বরের প্রতিপাদন করেছে বটে কিন্তু তাদের উপবিষ্ট উপায়ের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। পাতঞ্জল দর্শন যদিও ঈশ্বরকে যোগ প্রণালীর সংগে সংযুক্ত করেছেন কিন্তু সে দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরই বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য বটে, তথাপি বেদান্তের প্রণালীতে এবং গীতার প্রণালীতে প্রভেদ অল্প নয়"।

ইহুদী ধর্মের পরিচয়

ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম এ তিন ধর্মের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম আ.-এর ছিলেন দুই স্ত্রী, সারাহ্ এবং হাজেরা। হাজেরার গর্ভে হযরত ইব্রাহীম আ.-এর একটি পুত্র সন্তান হযরত ইসমাঈল আ.-এর জন্ম হয় এবং দীর্ঘ তের বছর পর সারাহর গর্ভে হযরত ইব্রাহীম আ.-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসহাক আ.-এর জন্ম হয়। হযরত ইসহাক আ.-এর পুত্র হযরত ইয়াকুব আ. যার অপর নাম ইসরাইল। এ ইসরাইল বা ইয়াকুব আ.-এর এগার পুত্রের মধ্যে দশম পুত্র ইউসুফ আ. নবী ছিলেন। এছাড়া এই বংশধর অর্থাৎ বনি ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ নবুয়তের ধারায় প্রায় দু'হাজার বছর পর্যন্ত বিশ্বে সর্বাধিক মর্যাদাশালী করেছিলেন। এ মর্যাদাশীল বনি-ইসরাইলেরই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল এবং ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুসা আ.-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল হয়। এর পরে এ জাতির মধ্যে অসংখ্য নবীর আগমন ঘটে। তন্মধ্যে হযরত দাউদ আ.-এর উপর যবুর এবং এ জাতির সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা আ.-এর প্রতি ইঞ্জিল কিতাব নাযিল হয়।

খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে প্রকাশিত হয় 'জেহোভিস্ট পাঠ'। এ পাঠে আল্লাহকে 'জেহোভা' (সদাপ্রভু) নামে অভিহিত করা হয়। তাতে প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

তথ্য ও অতীতকালের বিভিন্ন ঘটনা জুড়ে দেয়া হয়। এ রচনা পাঁচটি পুস্তিকায় বিদ্যমান। একে তারা পঞ্চপুস্তক বা তাওরাত বলে দাবি করেন। এর সাথে আর একটি পুস্তকের নামকরণ করা হয় 'এলোহিস্ট'। কারণ এতে আল্লাহকে এলোহিম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনের নরপতি বখ্‌তনাসের জেরুজালেম আক্রমণ করে ইহুদী সম্প্রদায়ের সবকিছু বিনষ্ট করে ইহুদীদের ধরে ব্যাবিলনে নিয়ে যায় এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও নষ্ট করে ফেলেন। সত্তর বছর পর পারস্য সম্রাট সাইরাস তাদের মুক্ত করে জেরুজালেমে ফিরিয়ে আনার পর ইহুদী ধর্মযাজকরা স্মৃতির উপর নির্ভর করে নিজেদের ইচ্ছামত নতুন করে যে বাইবেল রচনা করেন তাকে সেকেরডেটাল টেক্স বলা হয়। এর মধ্যে পঞ্চ পুস্তককে তাওরাত বলে দাবি করা হয়।

আবার ১৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আন্তাকিয়ার রাজা এন্টিনিউস জেরুজালেম আক্রমণ করে ইহুদী ধর্মশাস্ত্রগুলোকে ভস্মীভূত করেন এবং ইহুদী ধর্মশাস্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়ে জেরুজালেমে যিউশ দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানে যিউশ দেবতার পূজা চলতে থাকে। কয়েক বছর পরে ইহুদী মাকাবীর হাতে এন্টিনিউসের পরাজয় ঘটলে ইনি এযরা ও নহিমিয়ার নামে কতগুলো কাগজ পত্র দাখিল করে সেগুলোকে উক্ত ধর্মগুরুদ্বয়ের সংকলিত বলে ঘোষণা করেন এবং কাতবিম নামে আর একখণ্ড এর সাথে সংযোগ করেন। এরপর ৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ৭ সেপ্টেম্বর রোমান রাজা টাইটেস সমগ্র জেরুজালেম ধ্বংস করে এদের পুস্তকগুলো নিজ রাজ্যে নিয়ে যান এবং ইহুদীগণকে দেশান্তরিত করে সেখানে অন্য জাতীয় লোকদের বসিয়ে দেন। ফলে বিক্ষিপ্ত ইহুদীদের বহু কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, উপকথা, যাজক কথিত বিবরণ, অনুমান ও কল্পনাকে আশ্রয় করে 'তাওরাত' বা Old testament গ্রন্থ সংকলন করেন। এর ফলে এদের মধ্যে দুটো দলের সৃষ্টি হয়। প্রথম দল সাদুকীরা বলতে থাকেন যে মোজেসের পঞ্চ পুস্তক ছাড়া আর কিছু মানব না। আর দ্বিতীয় দল ফরিশিয়রা মোজেসের পঞ্চ পুস্তক ছাড়া অন্যগুলো যে Old testament-এর অংশ তা দাবি করতে থাকেন। এই সকল কারণে দেখা যায় যে ইহুদী ধর্ম-পুস্তকগুলোতে যাজকেরা নিজেদের ইচ্ছামত বহু কাহিনী, আদি ঐশীবাণীর বহু ওলট-পালট, সংযোজন, বিয়োজন করে পরে একটা ধর্মপুস্তক রূপে খাড়া করেছেন।

বর্তমানে 'এ প্রোক্রাইফ' নামে পরিচিত যে ৩৫ খানা পুস্তকের নাম করা হয়েছে প্রোটেসট্যান্ট পণ্ডিতরা সেগুলোকে জাল বলে গণ্য করেছেন। এ ৩৫

www.pathagar.com

খানা পুস্তকের মধ্যে আবার বহু পুস্তকের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়েছে (Chartes রচিত Procryphy Oxford press ১৯১৩)।

হযরত দাউদ আ.-এর নামে যে পুস্তকটি বাইবেলে সংযোজিত হয়েছে সেটা যবুর কিতাবের বিকৃত রূপ বলে অনেকে মনে করেন। ইহুদীদের বাইবেল যা ৩৯টি পুস্তকের সমন্বয়ে রচিত তাকে The old testament (পুরাতন নিয়ম) বলে। এখানে যোগ-বিয়োগ দেদার হয়েছে।

বিভিন্ন কারণ ও ঘটনা উপলক্ষে ইহুদীরা সংগীতের মাধ্যমে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতেন। এ প্রসঙ্গে এডমন্ড জ্যাকোব বেশকিছু উপলক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে নানা বিষয় ও ঘটনা উপলক্ষে রচিত বিভিন্ন সঙ্গীত বাইবেলে স্থান লাভ করেছে। যেমন–ভোজন সংগীত, ফসল কাটার গান ইত্যাদি। এছাড়াও বিশেষ কোনো কর্মকাণ্ড উপলক্ষে রচিত গান যেমন, বিখ্যাত কূপ খননের গান (গণনা পুস্তক ঃ ২১-১৭), বিবাহ সংগীত, সংগীত সম্পর্কিত সংগীত এবং বিলাপ সংগীত। যুদ্ধ সংক্রান্তও বেশকিছু সংগীত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, দেবরা সংগীত (গণনা পুস্তক, বিচার কর্তৃগণ ঃ ৫, ১-৩২) এবং সদা প্রভুর (জেহোভা) ইচ্ছায় অর্জিত বিজয়ের গান (গণনা পুস্তক, বিচার কর্তৃগণঃ ১০, ৩৫)। এছাড়াও বাইবেলে প্রচলিত নীতিবাক্য ও প্রবাদ স্থান পেয়েছে।

১৯৪১ সালে এ, লডস্ নামক একজন গবেষক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন জেহোভিস্ট ধারার পুস্তকগুলো তিন জন লেখকের রচনা। এলোহিস্ট ধারার পুস্তক রচয়িতার সংখ্যা চার জন। গণনা পুস্তকের লেখকের সংখ্যা ছয় জন। সেকোরডেটাল সংস্করণের পুস্তকসমূহ কম-বেশি নয় জন লেখকের রচনার সমষ্টি।

জেরুজালেমের বাইবেল স্কুলের প্রধান ফাদার ডি, ভক্সের মতে উপরোক্ত সংখ্যক লেখক ছাড়াও বাইবেলের এ পঞ্চ-পুস্তকের রচয়িতা হিসেবে আরও আটজন লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়।

হযরত মুসা আ. (মোজেস) নিজেই বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' (তাওরাত) লিখে গেছেন—এ ধারণা আজ পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরাই ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে কার্ল স্ট্যাডট প্রথম প্রশ্ন উত্থাপন করেন–"দ্বিতীয় বিবরণীতে মুসা আ.-এর মৃত্যুর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে (৩৪, ৫-১২) তা মুসা আ.-এর নিজের পক্ষে রচনা করা কি করে সম্ভব?"

বাইবেল স্কুলের প্রধান ফাদার ডি.ভক্স অন্যান্য সমালোচকদের উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেন–"ওইসব সমালোচকবৃন্দ স্বীকার না করে পারেননি যে,

www.pathagar.com

পুরাতন নিয়মের বাইবেলের অন্তত একাংশ মুসা আ.-এর রচনা নয়।" এ হলো পুরাতন নিয়ম-এর বাইবেল। মানব হস্ত বাইবেল নামক ধর্মগ্রন্থটিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, কোনটি ঐশীবাণী আর কোনটি মানব রচিত তা চিহ্নিত করার কোনো উপায় নেই। আসল-নকলে সব একাকার হয়ে গেছে। এ কারণে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষিত মহল গরমিল ও ভুলত্রুটি দেখে বাইবেলকে ঐশীবাণী রূপে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। ফলে দার্শনিক ও বিজ্ঞানিরা নাস্তিক ও ধর্ম নিরপেক্ষবাদী হয়ে যাচ্ছে।

হযরত মুসা আ.-এর প্রবর্তিত ইহুদী ধর্ম ছিল বিশুদ্ধ একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীতে বনি ইসরাইল বংশে যত নবী-রাসূলগণ এসেছেন তাঁদের সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসা আ.-এর প্রবর্তিত ইহুদী ধর্মকে বিকৃতি মুক্ত রাখা। তাঁরা সকলেই একমাত্র ইহুদী ধর্মই প্রচার ও পালন করে গেছেন। ইহুদীদের মতো অন্য কোনো জাতিকে অসংখ্য নবী দ্বারা এত অনুগ্রহ করা হয়নি। আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ ক্রমান্বয়ে তাদেরকে এমন গর্বোদ্ধত ও দুরাচারী করে তুলেছিল যে, আল্লাহর অনেক নবীকে তাদের পছন্দ না হওয়ায় তারা হত্যা করেছিল। বাইবেলে উল্লিখিত 'সখরিয়' ও তৎপুত্র 'জন দ্যা ব্যাপ্টিস্ট' এবং কুরআনে উল্লিখিত হযরত জাকারিয়া আ. ও তৎপুত্র হযরত ইয়াহিয়া আ.-এর হত্যা দুটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ (যথাক্রমে ২ বংশাবলী ২৪ ঃ ২১-২২, মথি ঃ ১৪ ঃ ৬-১১)।

মুসা নিজ জাতির জন্য বিলাপ করে বলেছিলেন–"যে দিন থেকে আমি তোমাদের দেখেছি, সেদিন থেকেই দেখেছি তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী" (ডিউট্রোনমি ৯ঃ ২৪)। তাঁর এ বাণীতে প্রতিভাত হয়, মুসা আ.-কে ইসরাইলীয়রা হতাশ করেছিল। তাঁর প্রতি তীব্র বাধা ও আল্লাহর নির্দেশের প্রতি উদ্ধত আচরণের জন্য হযরত মুসা আ. তাদেরকে তিরস্কার করতে বাধ্য হন। যেমন-"আমি জানি তোমরা বিদ্রোহী এবং একরোখা। দেখ যখন এ দিনে আমি তোমাদের সাথে জীবিত আছি, এখনও তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, আমার তিরোধানের পর তোমাদের এ বিদ্রোহ আরও ততোধিক বৃদ্ধি পাবে" (ডিউট্রোনমি, ৩১ঃ২৭)। পরবর্তী পরিচ্ছদে ইহুদীদের প্রতি প্রভুর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়ে জ্বলে উঠেছে এবং তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরও বলেছেন–"তারা আমাকে হিংসুটে হতে বাধ্য করেছে। স্রষ্টার সাথে নয় ইহুদীরা তাদের আত্মগরিমার জন্য আমাকে রাগান্বিত করেছে। এবং আমি তাদেরকে সেসব হিংসুটে জাতিদের মধ্যে নিক্ষেপ করব এবং তাদেরকেও আমি রাগান্বিত করব সে সমস্ত মূর্খ জাতির সাথে" (ডিউট্রোনমি ৩২ ঃ ২১)।

www.pathagar.com

মুসা আ.-এর প্রবর্তিত ইহুদী ধর্ম খাঁটি একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে প্রচলিত ইহুদী ধর্মের আকিদা বিশ্বাস হচ্ছে, ফেরেস্তাগণ আল্লাহর কন্যা, আর আল্লাহ প্রতিটি মানুষের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষই আল্লাহ। ইহুদীগণ খ্রিস্টানদের মতই হযরত ওজায়ের আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করেন।

খ্রিস্ট ধর্মের পরিচয়

হযরত ঈসা আ. (যিশুখ্রিস্ট) প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম শহরের নিকট বেথেলহেম জনপদে কুমারী মাতা মরিয়মের (মেরী) গর্ভে অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং গালীল প্রদেশের নাসরতে প্রতিপালিত হন। আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত ঈসা আ.-এর ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছিল তার নাম 'ইঞ্জিল'। পবিত্র ইঞ্জিলের ভাষা ছিল 'হিব্রু'। হিব্রু ভাষার এক শাখাভাষা হলো এরামাইক ডাইলেক যা ছিল যিশুখ্রিস্টের মাতৃভাষা। কালের আবর্তে তাওরাতগ্রন্থ বিকৃত হওয়ার দরুন হযরত মুসা আ.-এর পরে অসংখ্য নবীর আবির্ভাব ঘটে। তারা নতুন কোনো ধর্মমত প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তাওরাতগ্রন্থকে বিকৃতি-মুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করার মিশন নিয়ে একের পর এক পৃথিবীতে আগমন করেন। বনি ইসরাইল বংশে এ ধারার সর্বশেষ নবী ছিলেন ঈসা আ.।

এখানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে–যিশুখ্রিস্ট কাদের প্রতি নবীরূপে প্রেরীত হয়েছিলেন ? এ ক্ষেত্রে যিশুর ভাষ্য হচ্ছে–"আমাকে কেবল ইসরাইল বংশের হারানো মেষদের (পথভ্রষ্টদের) নিকটেই পাঠানো হয়েছে" (মথি ঃ ১৫ ঃ ২৪)। "একজন কেনানীয় স্ত্রীলোক তার ভূতে-ধরা মেয়েটিকে সারাবার জন্য ঈসা আ.-এর পায়ে ধরে অনুরোধ জানালে ঈসা আ. (ইসরাইল ব্যাতীত অন্য জাতির উপকার করতে অপারগতা প্রকাশ করে) বললেন, ছেলেমেয়েদের খাবার কুকুরের সামনে ফেলা ভালো নয়" (মথি ঃ ১৫ ঃ ২৬)।

যিশু শীষ্যদের বিদায়কালীন ভাষণে বলেন–"তোমরা অ-ইহুদীদের নিকটে বা শমরীয়দের কোনো গ্রামে যেও না, বরং ইসরাইল জাতির হারানো মেষদের নিকট যেও। তোমরা যেতে যেতে এ কথা প্রচার করিও যে, বেহেস্তী রাজ্য নিকটে এসেছে" (মথি ঃ ১০ ঃ ৫-৭)। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, যিশুখ্রিস্ট একমাত্র ইহুদী জাতির প্রতি প্রেরিত নবী ছিলেন। তাঁর বাণী প্রচারের জন্য তিনি শিষ্যদেরকে কেবল মাত্র ইহুদীদের নিকট যাবার জন্য নির্দেশ দেন এবং পরজাতীয়গণের নিকট যেতে বারণ করেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে–যিশুখ্রিষ্টের মিশন কি ছিল ? এখানে যিশুর ভাষ্য হলো–"এ কথা মনে করিও না, আমি মুসার শরীয়ত আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নাই বরং পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যই বলছি, আসমান ও যমীন শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যতদিন না শরীয়তের সমস্ত কথা সফল হয়, ততদিন সে শরীয়তের এক বিন্দু কি এক মাত্রা মুছে যাবে না। তাই হুকুমগুলোর মধ্যে ছোট একটি হুকুমও যে কেউ অমান্য করে এবং লোকদেরকে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয়, তাকে জান্নাতী রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে। কিন্তু যে কেউ সে হুকুমগুলো পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাকে বেহেস্তী রাজ্যে বড় বলা হবে" (মথিঃ ৫ঃ১৭-১৯)। অতএব সুসমাচারে বর্ণিত যিশুর বাণী হতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি তাওরাতের বিধিবিধান কিংবা গ্রন্থটিকে বাতিল করতে আসেননি বরং এটাকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছেন।

তিনি আরও ঘোষণা করেছেন যে, "বিধিবিধানের সামান্যতম একটি আজ্ঞাও যদি কেউ অমান্য করে এবং লোকদেরকে তদ্রুপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে হীনতম বলে গণ্য হবে। অপরদিকে যদি কেউ বিধি-বিধানসমূহ পালন করে ও লোকদেরকে তদ্রুপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে।" এখন প্রশ্ন হলো-এ নিষেধাজ্ঞাসমূহ কী ? যিশুর ভাষ্য হলো–"খুন করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা-মাতাকে সম্মান করিও, আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করিও" (মথি ঃ ১৯ ঃ ১৮-১৯)। "ইসরাইলিয়রা শুন–প্রভু, যিনি আমাদের খোদা, তিনি এক আর তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন এবং তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভু, যিনি তোমাদের খোদা, তাকে মহব্বত করবে, তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে" (মার্কঃ ১২ঃ২৯-৩১)। এখানে দেখা যায় যে, যিশু যে আজ্ঞাসমূহ মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন তা হযরত মুসা আ.-এর প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত বা পুরাতন নিয়মে বিবৃত আল্লাহর দশটি আজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত (যাত্রা পুস্তক ঃ ২০ ঃ ১২-১৬)। অর্থাৎ পরকালে পরিত্রাণের জন্য যিশুখ্রিস্ট নতুন কোনো বিধিবিধান আরোপ না করে তাওরাতের বিধিবিধান মেনে চলার নির্দেশ দেন।

যিশুখ্রিস্ট তাওরাতের বিধিনিষেধ শুধু সমর্থনই করেননি বরং ক্ষেত্র বিশেষে আরও অধিক কঠোরতা আরোপ করেন। যেমন–"তোমরা শুনেছ, আগেকার লোকদের নিকট এ কথা বলা হয়েছে, 'খুন করিও না, যে খুন করে সে বিচারের দায়ে পড়বে'। কিন্তু আমি তোমাদের বলতেছি, যে কেউ তার ভাইয়ের ওপর রাগ করে সে বিচারের দায়ে পড়বে। যে কেউ তার ভাইকে বলে, তুমি

www.pathagar.com

অপদার্থ, সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে। আর যে তার ভাইকে বলে, 'তুমি জঘন্য' সে দোযখের আগুনের দায়ে পড়বে" (মথি ঃ ৫ ঃ ২১-২২)।

"তোমরা শুনেছ, এ কথা বলা হয়েছে, 'ব্যভিচার করিও না'। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ স্ত্রীলোকের দিকে কুনজরে তাকায়, সে তখনই মনে মনে তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করল। তোমার ডান চোখ যদি তোমাকে পাপ করায়, তবে তা উপড়িয়ে দূরে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত দেহ দোজখে পড়বার চেয়ে বরং তাহার একটি অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভালো। তোমার ডান হাত যদি পাপ করায়, তবে তা কেটে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত দেহ জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে বরং একটা অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভালো" (মথি ঃ ৫ ঃ ২৭-৩০)।

"আবার তোমরা শুনেছ আগেকার লোকদের নিকট বলা হয়েছে, 'মিথ্যা কসম খেও না, বরং প্রভুর উদ্দেশ্যে তোমার সমস্ত কসম পালন করিও।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, একেবারেই কসম খাইও না" (মথিঃ ৫ঃ৩৩-৩৪)।

"তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে 'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত'। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই করিও না, বরং যে কেহ তোমার ডান গালে চড় মারে তাকে অন্য গালেও চড় মারতে দিও। যে তোমার কোর্তা নেয়ার জন্য মামলা করতে চায়, তাকে তোমার চাদরও নিতে দিও" (মথিঃ ৫ঃ ৩৮-৪০)।

"তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত করিও এবং শত্রুকে ঘৃণা করিও।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুকেও মহব্বত করিও। যারা তোমাদের ওপর অত্যাচার করে তাদের জন্য মুনাজাত করিও ----" (মথি ঃ ৫ ঃ ৪৩-৪৪)। অতএব যিশুখ্রিস্টের মিশন ছিল ইহুদী জাতির মধ্যে তাওরাতকে অনাবশ্যক আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজাল হতে মুক্ত ও পরিশীলিত করে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। তাওরাতের কোনো কোনো বিধিনিষেধ তিনি অধিকতর কঠোরতার সাথে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন আবার কোনো কোনো বিধিনিষেধ সংশোধনপূর্বক অধিকতর কোমল করেন। আল্লাহর রাসূল হিসেবে এ ধরনের সংশোধনের অধিকারী তিনি ছিলেন। আল্লাহর আদেশ ব্যতীত আল্লাহর রাসূলগণ কোনো বিধিনিষেধ বলবৎ কিংবা সংশোধন করেন না।

যিশুখ্রিস্টের বাণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি ঈশ্বরকে প্রেম (মহব্বত) করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকেও প্রেম করতে বলেছেন। এ প্রেম কিভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে যিশু ঘোষণা করেন-"তোমরা যদি আমাকে মহব্বত কর, তবে আমার সমস্ত হুকুম পালন করবে" (যোহন ঃ ১৪ ঃ ১৫)।

www.pathagar.com

"যে আমার সমস্ত হুকুম জানে ও পালন করে, সে-ই আমাকে মহব্বত করে। যে আমাকে মহব্বত করবে, আমার পিতা তাকে মহব্বত করবেন। আমিও তাকে মহব্বত করব আর তার নিকট নিজেকে প্রকাশ করব। ----- যদি কেহ আমাকে মহব্বত করে, তবে সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলবে। --- যে আমাকে মহব্বত করেনা সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে না। যে কথা তোমরা শুনেছ তা আমার কথা নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতারই কথা" (যোহনঃ ১৪ঃ২১-২৪)।

"পিতা যেমন আমাকে মহব্বত করেছেন, আমিও তেমনই তোমাদের মহব্বত করেছি। আমার মহব্বতের মধ্যে থাক। আমি আমার পিতার সমস্ত হুকুম পালন করে যেমন তাহার মহব্বতের মধ্যে রয়েছি, তেমনই তোমরাও যদি আমার হুকুম পালন কর, তবে তোমরাও আমার মহব্বতের মধ্যে থাকবে" (যোহন ঃ১৫ঃ৯-১০)।

"আমার হুকুম এই, আমি যেমন তোমাদের মহব্বত করেছি, তেমনই তোমরাও একজন অন্যজনকে মহব্বত কর। কেহ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয়, তবে তার চেয়ে বেশি মহব্বত আর কারো নেই। যে সমস্ত হুকুম আমি তোমাদের দেই তা যদি তোমরা পালন কর তবেই তোমরা আমার বন্ধু" (যোহন ঃ ১৫ঃ১২-১৪)।

উদ্ধৃত বাণীসমূহ পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বরকে সেই প্রেম করতে হলে তাঁর আজ্ঞাসমূহ মেনে চলতে হবে এবং সেই প্রেমে অবস্থিতি করতে হলে বিধি-নিষেধসমূহ আজীবন পালন করতে হবে। যিশু আরও বলেছেন যে, "যে কেহ তাঁর আজ্ঞা পালন করে না, সে তাঁকে প্রেম করে না"। যোহন ১৪ঃ২৪ পদে যিশু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সত্য প্রকাশ করেছেন যে, 'তিনি তাঁর শিষ্যগণকে যে বাণী শোনাচ্ছেন তা তাঁর নিজের বাণী নয়, এটা ঈশ্বরের বাণী, যিনি তাঁকে মনোনিত নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং ঈশ্বরের নির্দেশবহির্ভূত কোনো কিছুই তিনি বলেন না।' অতএব যিশুর অনুসারী হওয়ার শর্ত হচ্ছে, সর্বদা তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। বিধি-নিষেধ অমান্য করে বা অমান্য করার শিক্ষা দিয়ে যিশুর অনুসারী হওয়া বা তাঁকে প্রেম করা অসম্ভব। সুতরাং যিশুর প্রথম মিশন ছিল পথভ্রষ্ট ইহুদী জাতিকে তাওরাতের বিশুদ্ধ বাণী জ্ঞাত করিয়ে তা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।

এ ছাড়া তাঁর দ্বিতীয় আর একটি মিশন ছিল যা তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরদের এভাবে জানান যে, তাদের মধ্যে তাঁর নবুয়তী কার্যক্রম শেষ হয়ে এসেছে এবং কিছুকাল পরে ঈশ্বর আর একজনকে নবুয়তী কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

যাবার জন্য প্রেরণ করবেন। এ প্রসঙ্গে বাইবেলের ভাষ্য হল–"আমি পিতার নিকট চাইব, আর তিনি তোমাদের নিকটে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দিবেন সেই সাহায্যকারীই সত্যের রূহ" (যোহনঃ১৪ঃ১৬)।

"যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার নিকট হতে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দিব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। ইঁনি সত্যের রূহ, যিনি পিতা হতে বের হন" (যোহনঃ ১৫ঃ২৬)।

"তবুও আমি তোমাদের সত্য কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে সে সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাকে তোমাদের নিকটে পাঠিয়ে দিব। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার সম্বন্ধে এবং খোদার বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দিবেন" (যোহনঃ ১৬ঃ৭-৮)।

"তিনি পাপের সম্বন্ধে চেতনা দিবেন, কারণ লোকেরা আমার ওপর ঈমান আনে না। নির্দোষিতার সম্বন্ধে চেতনা দিবেন, কারণ আমি পিতার নিকট যাচ্ছি ও তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দিবেন, কারণ দুনিয়ার কর্তার বিচার হয়ে গিয়েছে" (যোহনঃ ১৬ঃ ৯-১১)।

"তোমাদের নিকট আরও অনেক কথা আমার বলবার আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেগুলো সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু সে সত্যের রূহ (সাহায্যকারী) যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণসত্যে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজ হতে কোনো কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু শুনেন তাই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন" (যোহনঃ ১৬ ঃ ১২-১৪)।

"সে সাহায্যকারী (পরাক্লিতস) যাকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দিবেন, তিনিই সমস্ত বিষয় তোমাদের শিক্ষা দিবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সে সমস্ত তোমাদের মনে করিয়ে দিবেন" (যোহন ১৪ঃ২৬)।

বাইবেলের নতুন নিয়ম বা ইঞ্জিলের ইতিহাস বড়ই বৈচিত্রপূর্ণ। মুসলমানেরা কুরআন অনুযায়ী জানে ও বিশ্বাস করে, 'ইঞ্জিল কিতাব হযরত ঈসা আ.-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল, হযরত ঈসা আ.-এর ১২ জন হাওয়ারী বা সাহাবী ছিলেন'। তাঁদের মধ্যে 'যোসেফ নামক একজন শিক্ষিত সাহাবী ছিলেন। সাইপ্রাসে জন্মগ্রহণকারী ইহুদী সন্তান যোসেফ ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যিশুখ্রিস্টের প্রতি তাঁর অত্যধিক ভক্তির কারণে তাঁর সহচরগণ তাঁকে 'বার্নাবাস' নামে অভিহিত করেন। তিনি ছিলেন যিশুখ্রিস্টের ১২ জন

www.pathagar.com

সাথীর মধ্যে সবচেয়ে নিকটতম এবং খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। যিশুখ্রিস্ট যা কিছু বলতেন বার্নাবাস তা লিখে নিতেন। তিনিই অধিকাংশ সময় যিশুখ্রিস্টের নিকট হাজির থাকতেন এবং তাঁর বাণীসমূহ লিখে রাখতেন। প্রেরিতদের কার্য বিবরণীতে পাওয়া যায়, যারা যিশুর ব্যক্তিগত শিষ্য ছিলেন বার্নাবাস ছিলেন তাঁদের প্রতিনিধি। জনপল তাদের সাথে কিছুকাল সহযোগিতা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

ইঞ্জিল কিতাব সরাসরি ঈসা আ.-এর কল্‌বে নাযিল হয় এবং দিলে তা গেঁথে দেয়া হয়। এর সাহায্যে হাদীসের মত তিনি লোকদের হেদায়াত করতেন, সাহাবী বার্নাবাস তা লিখে রাখতেন। কাজেই বার্নাবাসের বাইবেল অনেকটা হাদীসের মত এবং তা কোনো প্রকার রদবদল হয়েছে কি না জানা যায় না। প্রথম লিখিত ইঞ্জিল বলতে বার্নাবাসের বাইবেলই ছিল। পবিত্র ইঞ্জিল কিতাব নাযিল সম্পর্কে বার্নাবাসের বাইবেলে ১৬৮ নং সুসমাচারে ঈসা আ. বলেছেন–"বিশ্বাস কর, যখনই আল্লাহ আমাকে বনি ইসরাইল কুলে প্রেরণের জন্য পছন্দ করলেন, স্বচ্ছ আয়নার মত একটি কিতাব আমাকে দান করলেন, যা আমার সিনায় গেঁথে বস্‌ল এমনিভাবে যে, আমি যা-ই বলি সে কিতাব থেকেই তা নিঃসৃত হয়। আর আমার মুখ থেকে যখন সে কিতাবের বাণী নিঃসৃত হবে না, তখন দুনিয়া থেকে আমাকে তুলে নেয়া হবে।" এ সুসমাচারটি সরাসরি কোন ঐশী বাণী নয় বরং এটি একটি ঐশী বাণীর ব্যাখ্যা ও নবুয়ত লাভের অভিজ্ঞতার বর্ণনা, যা এরূপ-'হে নবী! তুমি যা বল তা তোমার সিনায় গেঁথে দেয়া আমার সে কিতাব থেকেই বল, আর যখন তা বন্ধ হয়ে যাবে তখন তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেয়া হবে'।

ঈসা আ.-এর অন্তর্ধানের পর বার্নাবাসসহ তাঁর অনুসারী ও সাহাবীরা বার্নাবাস লিখিত এ বাইবেল দ্বারাই একত্ববাদী ঈসায়ী ধর্ম প্রচার করতে থাকেন এবং এ বাইবেলের সাহায্যে তারা এবাদত বন্দেগীও করতেন। তারা সকলেই ইহুদী ছিলেন এবং ঈসা আ.-এর পুরোপুরি অনুসরণ করতেন। যিশুখ্রিস্টের মতবাদকে বা শিক্ষাকে তারা নতুন ধর্ম হিসেবে নয় বরং সংশোধিত ইহুদী ধর্ম হিসেবেই গ্রহণ করেন। ইহুদী ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যিশুখ্রিস্টের বাণীতে এমন কোনো নির্দেশ ছিল না এবং তারা আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে কোন দলও গঠন করেনি এবং উপাসনার জন্য তাদের কোনো আলাদা এবাদতগাহ্‌ও ছিল না। উল্লেখ্য, ইহুদীদের উপাসনালয়ের সেবিকার গর্ভেই যিশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেন। মূলত তৌরাত গ্রন্থের পর যবুরগ্রন্থ যেমন মুসার শরিয়ত ব্যতীত অন্য কোনো শরিয়তের কথা বলে না, তেমনি ঈসা আ.-ও অন্য শরীয়তের কথা বলেন না। এ সম্পর্কে

www.pathagar.com

কুরআনে বলা হয়েছে-"আমি তাদের পরে মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছিলাম তার পূর্ববর্তী কিতাব তৌরাতের সমর্থকরূপে, তাকে প্রদান করেছিলাম ইঞ্জিল----" (৫ঃ৪৬)।

যিশুর জন্মরহস্য এবং ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কোনো প্রশ্ন তাঁর প্রথমদিকের শিষ্যদের নিকট উঠেনি। যদিও পরবর্তীকালে তা অত্যন্ত গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছিল। যিশু একজন মানুষ এবং অতি প্রাকৃতিকভাবে ঈশ্বর প্রদত্ত অলৌকিক জ্ঞানে ভূষিত বলে তাদের মধ্যে পরিচিত। যিশুর বাণী কিংবা তাঁর জীবনের ঘটনাবলী তাদের মত পরিবর্তনের কোনো কারণও ঘটায়নি। এরিষ্টাইডের মতে 'প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানদের উপাসনা খাঁটি ইহুদীবাদী একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল'। এদেরকে পরবর্তী-কালে জুডিও খ্রিস্টান বলে অভিহিত করা হয়। যিশু এবং তাঁর শিষ্যদের অনুসারীরাই ছিল জুডিও খ্রিস্টানদের লোক।

তাসুসের অধিবাসী, রোমের নাগরিকত্ব লাভকারী ইহুদী 'জন পল' ছিলেন যিশুর শিষ্যদের ঘোর শত্রু। কিন্তু যিশুর কথিত মৃত্যুর ৪০ বৎসর পর ৭০ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ তিনি দাবি করে বসলেন যে যিশুর আত্মা এসে তাকে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা দিয়ে গেছেন। বার্নাবাসসহ যিশুর শিষ্যগণ প্রথমদিকে জন পলের সাথে তাদের মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিছু দিন পরস্পর পরস্পরকে ধর্মীয় সহযোগিতা করেন। কিন্তু বিরোধ দেখা দেয় যখন পল যিশুর বাণীতে নতুন সংযোগ ঘটাতে যাচ্ছিল।

যেমন-যিশু খোদার পুত্র খোদা, খাদ্যে হারাম-হালাল বাদ, খাতনা নিষিদ্ধ, যিশুর ক্রুশারোপিত হয়ে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত, খোদার হুকুম পালন রহিতকরণ, ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি। বার্নাবাসসহ সকল ঈসায়ীরা তাকে বর্জন করে এবং বার্নাবাস তাকে 'শয়তান কর্তৃক প্রতারিত ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করেন। এ মতোবিরোধের কারণে তাদের ধর্ম প্রচার ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। এখান হতেই যিশুর বাণী বিকৃত করে পলের সহচরেরা তাদের মর্জিমাফিক রেকর্ড করে নিয়ে এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেন। ফলে যিশুর শিষ্যদেরকে সরে দাঁড়াতে হয় এবং বিশেষ করে বার্নাবাস এখান থেকে প্রেরিতদের কার্যাবলীতে অদৃশ্য হয়ে যায়। কারণ প্রেরিতদের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছিল পলের অনুগামীদের দ্বারা। পল কোনো দিন যিশুকে দেখেনি বা জানতেনই না, অথচ যিশুর পদপ্রান্তে অবস্থানের শিষ্যদের পরিবর্তে এমন একজন ব্যক্তিই সম্মুখ সারিতে আগমন করেন। যিনি যিশুর দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ত্রয়োদশ শিষ্যরূপে পরিচিত হন।

www.pathagar.com

বার্নাবাসসহ ঈসা আ.-এর সাহাবীদের মৃত্যুর পর জুডিও খ্রিস্টানরা বিভিন্ন ধর্মগুরুর অধীনে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বার্নাবাসের বাইবেলকে উৎস হিসেবে নিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন।

এদিকে স্বঘোষিত ধর্মগুরু জনপল রোমান রাজশক্তির সহায়তায় ত্রিত্ববাদের একটি আলাদা ধর্মমত ঈসা আ.-এর নামে প্রচাররত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পলীয় খ্রিস্টানরা বিভিন্ন ধর্মগুরুর অধীনে বিভিন্ন স্থানে পলীয় খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করেন।

এ দু'দলের প্রচণ্ড বিরোধিতা ও প্রতিযোগিতার মুখে পলীয় খ্রিস্টানরা গস্‌পেল লেখা শুরু করেন। বিভিন্ন ধর্মগুরুগণ বিভিন্ন গস্‌পেল বা ইঞ্জিল লিখে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। পলীয় ধর্মগুরুদের দেখাদেখি জুডিও ধর্মগুরুরাও বার্নাবাসের বাইবেলকে উৎস করে বিভিন্ন গস্‌পেল লেখা শুরু করেন।

রোমান শাসকদের আনুকূল্যে পলীয় খ্রিস্টানিটির গীর্জাসংস্থা গঠিত হয়, কিন্তু জুডিও খ্রিস্টানরা কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে জুডিও খ্রিস্টানদের চেয়ে পলীয় খ্রিস্টানিটির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এ গীর্জাসংস্থা ১৭০ খ্রিস্টাব্দে পলের পত্রাবলী মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের সুসমাচারগুলো গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য সুসমাচারগুলোর রচয়িতাগণ কেউই যিশুর সহচর ছিলেন না। বরং অবলুপ্ত সুসমাচারগুলোর রচয়িতাদের কেউ কেউ যিশুর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন।

পরবর্তীতে স্বনামধন্য পণ্ডিত বিশপ লুসিয়ানা ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং বাইবেল থেকে ত্রিত্ববাদ মুছে ফেলেন। তিনি ৩১২ খ্রিস্টাব্দে শহীদ হন। পরে তাঁর খ্যাতনামা শিষ্য এরিয়াসের দ্বারা একত্ববাদ বিশ্বাস ছাড়িয়ে পড়ে। ফলে পলীয় ত্রিত্ববাদ-গীর্জার ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। সম্রাট কনস্টেনটাইন সম্রাজ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু শাসন ও স্থায়িত্বের জন্য সকল দল ও উপদলকে এক গীর্জার অধীনে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন এ বিতর্ক সারা রাজপরিবারে চরমে উঠে।

রাজমাতা পলীয় ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী, রাজকুমারী কনস্টানটিনা এরিয়াসের একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং সম্রাট কোনো খ্রিস্টধর্মেই বিশ্বাসী ছিলেন না। এ সময় এরিয়াস ও বিশপ আলেকজান্ডারের মধ্যে একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ বিতর্ক যখন চরম আকার ধারণ করে দাঙ্গা হাঙ্গামার উপক্রম হয় তখন সম্রাট শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের সকল মতবাদকে নিসিয়া (Nicia) সম্মেলনে আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে দু'হাজার আটচল্লিশ-জন ধর্মযাজক যোগ দেন। এ সময় চালাক সম্রাট সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও শান্তি

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার জন্য গীর্জার সহযোগিতা প্রয়োজন মনে করে সতের শত ত্রিশজন ধর্মযাজকের মুখ বন্ধ করে দিয়ে মাত্র তিনশত আঠারোজন পলপন্থী ধর্মযাজকের সমর্থিত ত্রিত্ববাদকে সমর্থন দেন।

এভাবে ত্রিত্ববাদ সম্রাজ্যের সরকারি ধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ত্রিত্ববাদ বিরোধী জুডিও খ্রিস্টানদের ওপর চরম গণহত্যা চালানো হয়। গীর্জার অননুমোদিত বাইবেল রাখা ফৌজদারী আইনের আওতায় অপরাধ বলে গণ্য হয়। কোনো এক হিসেবে বিভিন্ন ভাষা সম্বলিত ২৭০ ধরনের বিভিন্ন বাইবেল বিশেষত হিব্রু ভাষায় রচিত যাবতীয় বাইবেলের কপি পোড়ানো হয়। ফলে জুডিও খ্রিস্টানিটি বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়।

এতদিন সম্রাট খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না করেও ত্রিত্ববাদী পলীয় খ্রিস্টধর্মকে সমর্থন করেছেন। অবশেষে সম্রাট নিজে এরিয়াসের একত্ববাদী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন ফলে পুনরায় একত্ববাদ সরকারি ধর্ম বলে স্বীকৃতি পায়। ৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট মৃত্যুবরণ করেন। ৩৪১ খ্রিস্টাব্দে এনটিক সম্মেলনে 'ইহুদীই' খ্রিস্টধর্মের মূল বিশ্বাস রূপে গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে ৩৫১ খ্রিস্টাব্দে সারনিয়ামে এক পরিষদ কর্তৃক তা সমর্থিত হয়।

পরবর্তী পোপ আনারিয়াস হযরত মোহাম্মদ সা.-এর সমসাময়িক ছিলেন। ইসলামের নীতি ও আদর্শ একত্ববাদের সাথে মিল থাকায় তিনি ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সমঝোতা সমর্থন করতে লাগলেন। তিনি ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং তার ৪২ বছর পর ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে এক অধিবেশনে তাঁকে অভিশপ্ত ঘোষণা করা হয়। এখান থেকে আবার খ্রিস্টধর্মে পলীয় ত্রিত্ববাদ প্রাধান্য লাভ করে। ফলে ঈসায়ী ধর্মের বিলুপ্তি ঘটে। আর তখন থেকে আজ পর্যন্ত সেই পলীয় ধর্ম খ্রিস্টধর্ম নাম নিয়ে একটা বিরাট সভ্য জনগোষ্ঠীর মাঝে টিকে আছে।

পরবর্তীকালে এল. এন. এফ সজিন (১৫২৫-১৫৬৫), তার ভাতিজা সজিনী (১৬০৯-১৬৩৫), জন সিকিসুমুড এবং ক্রাসমিস ডেভিড (১৫১০-১৫৭৯) ত্রিত্ববাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বর্তমানেও বহু খ্রিস্টান নর-নারী একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং ত্রিত্ববাদের বিরোধী। গীর্জার ভয়ে তারা নিজেস্ব মতবাদ প্রকাশ করতে পারেন না। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজীর জনৈক অধ্যাপক বলেন, "আমরা যে খ্রিস্টধর্ম পালন করি তা প্রভু যিশুর ধর্ম নয়। এ ত্রিত্ববাদ পলের ধর্ম"।

খ্রিস্টানদের প্রচলিত বাইবেল যা ২৭টি পুস্তকের সমন্বয়ে গঠিত তাকে The new Testament (নতুন নিয়ম) বলে। বাইবেলে নতুন নিয়মে ২৭টি পুস্তকের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ৪টি হলো-মার্ক, মথি, লুক ও যোহন। খ্রিস্ট-সম্প্রদায়

www.pathagar.com

এ চারটিকেই 'ইঞ্জিল বা খোদায়ী বাণী বলে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মনে করেন। এ গ্রন্থচারটির সম্মিলিত নাম হল Gospel (গস্পেল), যা গ্রীক ভাষায় সর্বপ্রথম লিখা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ইঞ্জি লের ভাষা ছিল হিব্রু এবং যিশুর ভাষা ছিল এরামাইক ডাইলেক, অথচ গস্পেল লিখা হয় গ্রীক ভাষায়। শুধু তাই নয় আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যিশুর তথাকথিত তিরোধানের ৩৩ বছর পর অর্থাৎ ৬৩ খ্রিস্টাব্দে লুক তার 'লুক' লিখেন, যোহন ৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'যোহন' লিখেন, মথি ৭৫-৮০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে 'মথি' লিখেন এবং ৫৬ থেকে ৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে কোনো সময় মার্ক তার 'মার্ক' লিখেন। অথচ এ চারজন লেখকের কেউই যিশুর শিষ্য ছিলেন না।

সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যিশুর তথাকথিত তিরোধানের পর ইঞ্জিলের যেসব শিক্ষা লোক সমাজে প্রচলিত ছিল বা যিশুর প্রচারিত যেসব উপদেশ লোক মুখে ছিল সেগুলোকে একত্রিত করে এ চারজন লেখক গ্রীক ভাষায় ঐগুলো লিখে রেখেছিলেন। কাজেই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে লোক মুখে শুনা কোনো বর্ণনার মৌলিকত্ব আর বজায় থাকতে পারে না। যেহেতু ইঞ্জিলে সাহাবীদের মারফত পাওয়া বাণী ইহুদী ঘেঁষা বলে পরিত্যাগ করা হয়েছে। কারণ তাঁরা খাতনাকে জায়েয, শুকরের মাংস ভক্ষণ ও ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলা মাজায়েয বলতেন। তবুও এ চারটি সুসমাচারের মধ্যে যিশুখ্রিস্টের কিছু কিছু বাণী বিকৃত অবস্থায় থাকলেও পরবর্তী তেইশটি পুস্তকে শুধু সেন্টপলের নিজস্ব ব্যক্তিগত চিন্তাধারা সম্বলিত চিঠি-পত্রাদি স্থান পেয়েছে। আবার পলের নীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে এ চারটি সুসমাচারের মধ্যেই কিছু কিছু সংযোজন ও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। পলের বক্তব্য ঈশ্বরের বক্তব্যতো নয়ই, এমনকি যিশুখ্রিস্টের বাণীও নয়। উপরন্তু বাইবেলের কোথাও কুরআনের মত সংরক্ষণের নিশ্চয়তাও নেই। যেমন "নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং একমাত্র আমিই তার সংরক্ষণকারী"(১৫ঃ৯)। এ ছাড়া তাওরাত, যবুর এবং ইঞ্জিলের কোনো হাফেজ বা মুখস্থকারী ছিল বলেও জানা যায় না। ঐশী গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও এ সমস্ত কিতাবে 'সংরক্ষণের নিশ্চয়তা না থাকা' এগুলো বিকৃত বা রদ হয়ে যাওয়ারই ইঙ্গিত বহন করে।

প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম হচ্ছে, 'ত্রিত্ববাদে একেশ্বরবাদ' যার আকিদা বিশ্বাস হচ্ছে, পাপাচারের শৃঙ্খল মুক্তি। মি. গাওয়ার লিখেছেন-"যদিও খ্রিস্টধর্মের সাধারণ বিশ্বাস ত্রিত্ববাদ এবং এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ ধর্মের অনুসারীরা ভয়ানকভাবে তিন খোদায় বিশ্বাসীর পর্যায়ে পড়ে গেছে। তথাপি খ্রিস্টধর্ম মৌলিকভাবে একেশ্বরবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমনকি গীর্জার আকিদা-বিশ্বাসও খোদাকে একক সত্তা বলেই জানে।

www.pathagar.com

পাপ মুক্তি সম্পর্কে মি. গাওয়ার ব্যাখ্যা করেন- "খোদা ও বান্দাহর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে খ্রিস্টানদের আকিদা-বিশ্বাস হচ্ছে, 'পাপাচারের কারণে বান্দাহ আত্মিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বান্দাহকে নিষ্পাপ করার জন্য ঈসা আ.-এর কুরবানীই যথেষ্ট"।

খ্রিস্টধর্মে খোদায়িত্বের ধারণা বড়ই ঝঞ্ঝাটপূর্ণ এবং দুর্বোধ্য। খ্রিস্টধর্মের ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসের কথা সর্বজনবিদিত। 'পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা' বিশ্বাসকে ত্রিত্ববাদ বলা হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে স্বয়ং খ্রিস্টান পণ্ডিত দার্শনিক ব্যক্তিবর্গের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এতই অসংগত ও মতবিরোধে পরিপূর্ণ যে, কোনো সুনির্দিষ্ট কথা বলা খুবই কঠিন। সে তিনজন খোদা কারা? সে বিষয়েও রয়েছে এখানে বিস্তর মতভেদ। কেউ বলেন, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার সমন্বয়ে ত্রিত্ববাদ গঠিত। আবার কারো মতে পিতা, পুত্র এবং কুমারী মাতা মরিয়মের সমন্বয়ে। আবার এ সমন্বয়ে একের সাথে অপরের কি সম্পর্ক সে বিষয়েও রয়েছে বিস্তর মতবিরোধ। কেউ বলেন, সত্তাগতভাবে প্রত্যেকেই সমন্বিত খোদারই অনুরূপ। কেউ বলেন প্রত্যেকেই পৃথকভাবে এক একজন খোদা, তবে সমন্বিত খোদার মত শক্তিশালী নন। কারো মতে পৃথকভাবে কোনো সত্তাকেই 'খোদা' বলা যাবে না, বরং তিন সমন্বয়ই শুধু 'খোদা' হতে পারেন। কেউ মনে করেন, ঈসা আ. পরিপূর্ণ খোদায়ী সত্তা ছিলেন না; তাঁকে খোদার প্রতিচ্ছবি বা সাদৃশ্য বলা যায়, যা খোদায়ী বৈশিষ্ট্যের প্রতিমূর্তি। 'আপন বৈশিষ্ট্যে তিনি পিতার মতই সত্তা' একথা বলা কোনো ক্রমেই শোভা পায় না। কারো মতে, মৌলিকভাবে পিতাই একমাত্র খোদা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা খোদার দান। কোনো দার্শনিকের মতে প্রকৃতপক্ষে পিতা-পুত্র ত্রিত্ববাদকে কেউ তুলনা করেছেন রক্ত, মাংস ও হাড়ের সাথে। রক্ত, মাংস ও হাড় মিলে যেমন শরীর গঠিত হয়, তেমনি পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর মিলে হয় একেশ্বর। ত্রিত্ববাদকে কেউ তুলনা করেছেন আংটিতে খোদিত নক্শার সাথে। কেউ আবার তুলনা করেছেন আয়নার প্রতিবিম্বের সাথে। অনেকে বলেন 'একত্ববাদে-ত্রিত্ববাদ বা ত্রিত্ববাদে একত্ববাদ এক দুর্ভেদ্য ও রহস্যময় গোপন বিষয়' যা সম্পূর্ণরূপে আমাদের বোধের আওতা বর্হিভূত।

খ্রিস্টধর্মের বক্তব্য অনুযায়ী খোদায়ী সত্তায় 'একত্ববাদ' যেমন মুখ্য, তেমনই মুখ্য 'ত্রিত্ববাদ'। এখানে কোনোটিকেই ছোট করে দেখার উপায় নেই। খ্রিস্টান পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং এমন কিছু অগ্রহণযোগ্য ও অযৌক্তিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা মূলত সমস্যাকে আরো

www.pathagar.com

বিতর্কিত করে তুলেছে। আর এ বিতর্কের অবসানের ধারায় সৃষ্টি হয়েছে খ্রিস্টতত্ত্ব বা খ্রিস্টলজী নামে পৃথক একটি বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার। কিন্তু এতেও সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি বরং সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন বিতর্কের।

প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি হলো–(ক) যিশুখ্রিস্ট শাব্দিক অর্থে ঈশ্বর পুত্র এবং স্বয়ং ঈশ্বর। (খ) মানবজাতির পাপ মোচনার্থে যিশুখ্রিস্ট ক্রুশারোপিত হয়ে নিহত হন এবং পরে পুনরুজীবিত হন। তিনি প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মানব জাতির অতীত ও বর্তমানে অনুষ্ঠিত এবং ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। (গ) যারা (ক) ও (খ)-এ বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারা হযরত মুসা আ.-এর তাওরাত গ্রন্থে বিধিবদ্ধ এবং যিশু কর্তৃক সমর্থিত যাবতীয় বিধি নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেবল মাত্র মৌখিক বিশ্বাস স্থাপনই পরলোকে পরিত্রাণ লাভের জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের পরে কোনো সৎকাজ করার কিংবা অসৎকাজ পরিহারের বাধ্য-বাধকতার প্রয়োজন নেই। যেমন মন চায় তেমনিভাবে জীবনযাপন করা যেতে পারে। বাইবেলই প্রমাণ করে এ অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব মতবাদ যিশুখ্রিস্ট আদৌ প্রচার করেননি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তাওরাতের বিধি-বিধানসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে গেছেন। যিশুখ্রিস্টের অন্তর্ধানের পর জনপল এ নতুন মতবাদ উদ্ভাবন করেন।

ত্রিত্ববাদের ক্ষেত্রে কুরআনের উক্তি হচ্ছে–"নিশ্চয় কতক অবিশ্বাসী আছে যারা বলে আল্লাহ তিনের একজন, যদি তারা এরূপ কথন হতে নিবৃত না হয় তবে তাদের ওপর এক বেদনাদায়ক শাস্তি নিপতিত হবে যা অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে" (৫ঃ৭৩)।

বাইবেলে পলের বক্তব্য হচ্ছে–"পৌল দামেস্কের উম্মতদের সঙ্গে কয়েক দিন রইলেন এবং সময় নষ্ট না করে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মজলিসখানায় এ কথা প্রচার করতে লাগলেন যে, ঈসা-ই খোদার পুত্র" (প্রেরিতঃ ৯ঃ২০)। " --- স্বভাবে তিনি (ঈসা) খোদাই রইলেন, --- যেন বেহেস্তে, দুনিয়াতে এবং দুনিয়ার গভীরে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই ঈসার সামনে হাঁটু পাতে, আর পিতা-খোদার গৌরবের জন্য স্বীকার করে যে, ঈসা মসীহ-ই প্রভু" (ফিলিপীয়ঃ২ঃ৫-১১)। "আমি, পৌল, তোমাদের বলছি, শুন– খোদার গ্রহণযোগ্য হবার জন্য যদি তোমাদের খাৎনা করানোই হয়, তবে তোমাদের নিকট মসীহের কোনো মূল্য নেই। আবার আমি সকলের নিকট এ সাক্ষ্য দিচ্ছি, যাহার খাৎনা করান হয় সে মুসার গোটা শরীয়ত পালন করতে বাধ্য। তোমরা যারা শরীয়ত পালন করে খোদার গ্রহণযোগ্য হতে চাচ্ছ,

www.pathagar.com

তোমরাতো মসীহের নিকট হতে আলাদা হয়ে গিয়েছ, খোদার রহমত হতে সরে গিয়েছ' (গালাতীয় ঃ ৫ঃ২-৪)। "এ ছাড়া তোমরা মসীহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছ বলে তোমাদের খাৎনা করান হয়েছে। এ খাৎনা কোনো মানুষের হাতে করানো হয় নাই, মসীহ নিজেই তা করেছেন, ---- তোমরা'ত পাপের দরুন এবং খাৎনা না করাবার দরুন মৃত ছিলে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মসীহের সংগে জীবিত করেছেন" (কলসীয়ঃ২ঃ১১-১৩)।

"তিনি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন, আর আমাদের বিরুদ্ধে যে দলীল (শরীয়ত) ছিল তার সমস্ত দাবি-দাওয়াসহ তা বাতিল করে দিয়েছেন। সে দলীল তিনি ক্রুশে পেরেক দিয়ে গেঁথে নাকচ করে ফেলেছেন" (কলসীয় ঃ ২ ঃ ১৪)। "সেজন্য, খাওয়া-দাওয়া বা কোনো ঈদ কিংবা অমাবস্যা বা বিশ্রামবার নিয়ে তোমাদের দোষ দিবার অধিকার কারো নেই" (কলসীয় ঃ ২ ঃ ১৬)।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত প্রেরিত ঃ ৯ ঃ ২০ এবং ফিলিপীয় ঃ ২ ঃ ৫-১১ পদে পল যিশুকে প্রভু, অর্থাৎ ঈশ্বরের আসনে সমাসীন করেছেন; গালাতীয়ঃ৫ঃ২-৪ এবং কলসীয় ঃ ২ঃ১১-১৩ পদে পল ছিন্নত্বকের বিধান রহিত করেছেন; কলসীয়ঃ২ঃ১৪ পদে তাওরাতের সমুদয় বিধি-নিষেধ পল ক্রুশে লটকিয়ে বিদায় করেছেন এবং কলসীয়ঃ২ঃ১৬ পদে পানাহার, উৎসব পালন, বিশ্রামবার পালনের বৈধ-অবৈধতা বিলোপ করেছেন, অর্থাৎ পল তার অনুসারীদের পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করে দিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, পল তার মতবাদ প্রবর্তন ও প্রচারের অধিকার কীভাবে পেলেন ? প্রেরিত-পুস্তিকার নবম অধ্যায়ের ৯ঃ১-৬ পদের বর্ণনায় দেখা যায় যে, পল (যিশুর শিষ্যদের ধরে শাস্তি দিতে) দামেস্ককে যাওয়ার পথে দিব্য দৃষ্টিতে যিশুখ্রিস্টের(?) দেখা পান এবং তিনিই তাকে এ ধরনের শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহর একজন নবী জীবদ্দশায় পৃথিবীতে যে নীতি অনুসরণ ও প্রচার করে গেলেন, পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের পরে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অনুসরণের ও প্রচারের নির্দেশ দিলেন। যদি তাই হয় তাহলে এখানে প্রমাণ হয়, একজন নবী নিজের জীবদ্দশায় ভুল করে মিথ্যা প্রচার করেছেন এবং পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের পর খ্রিস্টবিরোধী একজন সাধারণ ইহুদী মারফত সত্য প্রচার করেছেন! এমন অস্বাভাবিক ঘটনা সাধারণ জ্ঞানে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া পল কোনো দিন যিশুকে দেখেননি। সে ক্ষেত্রে তিনি যাকে দেখেছেন, তিনি যিশুখ্রিস্ট না হয়ে শয়তানের প্রতারণা অথবা পলের ইচ্ছাকৃত প্রতারণাও হতে পারে।

www.pathagar.com

যেহেতু পল ঐ সময়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যিশুর অনুসারীদের ঘোর শত্রু এবং চরম মিথ্যাবাদী ছিলেন। ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি যে নির্লজ্জভাবে মিথ্যাকে বৈধ করেছেন তা হচ্ছে–"কিন্তু আমার মিথ্যার দ্বারা ঈশ্বরের সত্যের গৌরব যদি বৃদ্ধি পায় তবে আমিও বা পাপী বলে বিবেচিত হব কেন?" (রোমীয় ঃ ৩ঃ৭)। এ থেকেই প্রমাণ হয়, খ্রিস্ট ধর্মে পলের প্রচারিত যাবতীয় বিষয় পরিপূর্ণ মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

যিশুর নবুয়তী কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল জুডাইজমকে পরিশীলিত করে প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে নব দীক্ষিত গোত্র, বিকৃত ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এক 'সত্য ইহুদী গোত্র' হিসেবে বিরাজ করত। সেখানে পল নব দীক্ষিতদেরকে ইহুদী সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের ধর্মকে বিকৃত করার মানসে তাওরাত গ্রন্থের যাবতীয় বিধি-নিষেধ এবং যিশুর শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা মাফিক এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। এটা করতে গিয়ে তিনি যিশুকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে তাঁর উপাসনার পদ্ধতি চালু করেন। শুধু তাই নয়, এতকাল যাবত অসংখ্য নবীদের দ্বারা প্রচারিত 'এক ঈশ্বরের' পরিবর্তে 'পিতা ঈশ্বর' 'পুত্র ঈশ্বর' এবং 'পবিত্র আত্মা ঈশ্বর' এ তিন ঈশ্বরের থিওরী উদ্ভাবন করেন।

হযরত ইব্রাহীম আ. থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত একই বংশ ধারার অসংখ্য নবী-রাসূল দ্বারা হাজার হাজার বছর ধরে আল্লাহ মানব সমাজে যে বিধি-বিধানগুলো বলবৎ করার মিশন চালিয়ে এসেছেন, হঠাৎ করে সাধারণ দলছুট একজন ইহুদীর দ্বারা সে সমস্ত বিধি-বিধান আল্লাহ রহিত করে দিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে এমন একটি গাঁজাখুরী অযৌক্তিক বিষয় বিরাট এক জনগোষ্ঠি সহজেই মেনে নিলেন, যদিও আল্লাহ তাঁর বিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে নবী-রাসূল পাঠিয়ে থাকেন।

ধর্মীয় বিধি-নিষেধ রহিত করার পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, মানব জাতিকে দেয়ার মত খ্রিস্টধর্মের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কারণ খ্রিস্টধর্মে মানব জাতির জন্য অবশ্য করণীয় বা বর্জনীয় কিছুই রাখা হয়নি। একজন সাধারণ ইহুদী কী করে একজন নবীর প্রবর্তিত বিধিবিধান রহিত করতে পারেন? যেখানে বাইবেলেই বলা হয়েছে "শিষ্য গুরু হতে বড় নয় এবং দাস কর্তা হতে বড় নয়" (মথিঃ১০ঃ২৪)। এখানে পলের কার্যকলাপ যিশুর বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নিজেকে যিশু হতেও বড় বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার একই গ্রন্থে যিশু এবং পলের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যকে স্থান দিয়ে খোদ বাইবেলের নতুন নিয়মকেই স্ববিরোধী ও বিতর্কিত করে তোলা হয়েছে। এমনকি একই সুসমাচারের মধ্যে যিশুর মুখ দ্বারাই বিপরীতমুখী বাণী বলানো হয়েছে।

www.pathagar.com

যেমন- মথি ঃ ১৫ঃ২৪,২৬ পদে এবং মথি ঃ ১০ঃ৫-৭ পদে যিশু ঘোষণা করেন যে, তিনি একমাত্র ইহুদী জাতির জন্য প্রেরিত নবী এবং শিষ্যদেরকে ধর্ম প্রচারের জন্য পর জাতির নিকট যেতে নিষেধ করেন। অথচ যিশুর কথিত মৃত্যুর পর তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে যে, "তখন যিশু নিকটে এসে তাদের সাথে কথা কইলেন, বললেন, স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা গিয়ে সমুদ্বয় জাতিকে শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদেরকে বাপ্তাইয্ কর" (মথি ঃ ২৮ঃ১৮-১৯)।

দেখা যাচ্ছে এখানে উল্লিখিত মথিঃ১৫ঃ২৪,২৬ এবং মথি ঃ ১০ঃ৫-৭ পদে যিশু নিজের বাণীর বিরোধিতা করে মথি ঃ ২৮ঃ১৮-১৯ পদে শিষ্যদেরকে ধর্ম প্রচারের জন্য পর জাতির নিকট যেতে আদেশ করেছেন এবং সুকৌশলে একেশ্বরবাদের পরিপন্থী ত্রিত্ববাদ সহায়ক ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে এবং তাও যিশুর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের পর। যিশুর মুখ দিয়ে উক্ত বাণীটি বলানোর পর ইহুদীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পল বলে বসলেন, "তিনি (পল) ইহুদীদের নিকট সাক্ষ্য দিতেন যে, ঈসা-ই মসীহ। কিন্তু ইহুদীরা যখন পৌলের বিরুদ্ধে কথা বলে তাকে বাধা দিতে লাগল, তখন পৌল তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কাপড়-চোপড় ঝেড়ে ফেললেন এবং বললেন আপনাদের রক্তের দায় আপনাদেব নিজেদের মাথার ওপরই থাকুক। আমার দায়িত্ব হতে আমি রেহাই পেলাম। এখন হতে আমি অ-ইহুদীদের নিকট যাব (প্রেরিতদের কার্য-১৮ ঃ ৬)।"

এটা নিঃসন্দেহে পৌলের বাণী। এটা ঈশ্বরের বাণীতো নয়-ই এমনকি যিশুখ্রিস্টের বাণীও নয়। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে তৃতীয় ব্যক্তির বক্তব্য কী করে ঐশীগ্রন্থে স্থান পেতে পারে বা ঐশীবাণী হতে পারে ? তাছাড়া ধর্ম প্রচারে ইহুদীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পৌল যিশুখ্রিস্টের আদেশ স্পষ্টভাবে আমান্য করে অ-ইহুদী বা ভিন্ন জাতিদের মধ্যে ধর্ম প্রচারে বের হলেন। এখানে পলের বক্তব্য থেকেই প্রমাণ হয়, শুধু ইহুদীদের নিকট ধর্মপ্রচারই তার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ইহুদীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি তার দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং অ-ইহুদীদের মধ্যে ধর্ম প্রচারে বের হয়ে দায়িত্বহীনের পরিচয় দিলেন। এভাবে একই গ্রন্থ, বাইবেলে যিশু এবং পলের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য স্থান পেয়ে খোদ বাইবেলের নতুন নিয়মকেই স্ববিরোধী ও বিতর্কিত করেছে।

বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ঈসা আ. সম্পূর্ণ সুসমাচারটি এক সঙ্গে প্রাপ্ত হন, যা তাঁর সিনায় গেঁথে দেয়া হয়। ঐশীগ্রন্থ প্রচার সম্পূর্ণ হওয়ার পর তাঁর নবুয়তী দায়িত্বের অবসান ঘটে এবং তা তাঁর জীবদ্দশাতেই। মৃত্যুর পর

www.pathagar.com

তাঁর আর কোনো দায়িত্ব থাকে না; তখন তিনি হয়ে যান ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। প্রয়োজন হলে আল্লাহ আর একজন নবী পাঠাতেন। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে একজন বিশিষ্ট নবীর প্রচারিত বিধি-বিধানে বিভ্রান্তি ঘটানোর জন্য একজন বিশেষ ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যা বিশ্বের মানুষকে অবাক করে দেয়।

আবার চারটি সুসমাচারের মধ্যে একই বিষয়ে বিপরীতমুখী বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন–(ক) যোহন ১৯ঃ১৭ ও মথি ২৭ঃ৩২-পদে ক্রুশ বহন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। (খ) মথি ও লুকের সুসমাচারে যিশুর বংশতালিকায় একমাত্র যিশুর কথিত পিতা কাঠ মিস্ত্রি ইউসুফ ছাড়া আর কোনো মিল নেই। (গ) মথি ১৭ ঃ ১০-১৩-পদে যিশু বলিতেছেন বাপ্তিস্মদাতা 'ইয়াহিয়াই ইলিয়াস নবী'। কিন্তু যোহন ১ঃ১৯-২১-পদে ইয়াহিয়া বলিতেছেন 'আমি ইলিয়াস নই'। বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ীই দুই নবীর মধ্যে একজন মিথ্যা বলছেন। ঈশ্বর কেমন করে তাঁর ঐশী বাণীর মধ্যে স্ববিরোধী ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য রাখতে পারেন (?) যেখানে বাইবেলেই বলা হয়েছে, "ঈশ্বর গোলযোগের ঈশ্বর নহেন"।

খ্রিষ্ট ধর্মে ত্রিত্ববাদ

যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে 'পলাইন খ্রিষ্টবাদ তথা ত্রিত্ববাদ' গড়ে উঠেছিল তা হচ্ছে, 'ক্রুশারোপিত হয়ে যিশুর মৃত্যু এবং পুনরুজ্জীবন'। সুতরাং এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখানে বাইবেলের বক্তব্য হচ্ছে–"ক্রুশে যন্ত্রণাকাতর যিশু হতাশায় বলে উঠলেন, এলী এলী লামা শবক্তানী' অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমায় কেন পরিত্যাগ করেছ?" (মথি ঃ ২৭ঃ৪৬, মার্ক ১৫ঃ৩৪)। এ উক্তির দ্বারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাঁর মনোনীত প্রিয় পাত্রকে বিপদের মুখে ফেলে পরিত্যাগ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক না কেন ঈশ্বরকে দোষারোপ করা চরম ঈশ্বরনিন্দা বা ব্লাসফেমী, যা একজন নবীর পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। হযরত আইয়ুব আ. দীর্ঘ দিন ধরে চরম যন্ত্রণাপ্রদ দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগেছেন। হযরত ইউনুস আ. সমুদ্রে মাছের পেটে ঘন অন্ধকার শ্বাসরুদ্ধকর ও গুমোট উষ্ণতার মধ্যে তীব্র কষ্ট ভোগ করেছেন। হযরত যাকারিয়া আ. (সখরিয়) ঘাতকের অস্ত্রের নিচে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত ইয়াহিয়া আ. (জন দি ব্যপ্টিস্ট)-কে শিরোচ্ছেদ করা হয়েছিল। এই সমস্ত নবীগণ অপূর্ব ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং কেউই সামান্য যন্ত্রণাপ্রকাশক আহ্ উহ্ শব্দটুকু পর্যন্ত করেননি। এক্ষেত্রে একজন নবীর পক্ষে ঈশ্বরকে

www.pathagar.com

দোষারোপ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অতএব উক্ত ব্যক্তি যিশু নন। আর যদি যিশুই হন, তবে উল্লিখিত কথাটি তিনি বলেননি।

হযরত ইব্রাহীম আ.-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পর মহান আল্লাহ অগ্নিকে আদেশ করেছিলেন– "হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও" (কুরআন ২১ঃ৬৯)। অগ্নি তাঁকে স্পর্শ করল না। সেই মহান প্রভুর কাছে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর এ কাতরোক্তিও নিশ্চয় একটা ব্যর্থ আবেদন ছিল না। যদি তিনি উক্ত কাতরোক্তি করেই থাকেন, তবে নিশ্চয় সর্বশক্তিমান প্রভূ যিশুকে কেবলমাত্র মৃত্যুর একটা সাদৃশ্যের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন।

দেখতে হবে, যিশু ক্রুশে মারা যাননি, তা কেমন করে হতে পারে ? এ সম্পর্কে 'আকৃতি বদল' দ্বারা অন্যের মৃত্যুর দু'রকম বর্ণনা আমরা পাই। প্রথমত বার্নাবাসের সুসমাচার এ তথ্য দেয় যে, "যিশুর বিশ্বাসঘাতক শিষ্য য়িহুদা ইস্কারিয়োত যিশুকে ধরিয়ে দিয়ে তার পাপের পরিণামে যিশুর রূপে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং ইহুদীরা তাকেই ক্রুশবিদ্ধ করেছিল"। দ্বিতীয়ত সেন্ট আইরেনাস নামক বর্ণনাকারী বলেন, "যিশুর পরিবর্তে তাঁর ক্রুশকাষ্ঠ বহনকারী কুরীনীয় শিমোনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল"। এ দু বর্ণনার কোনোটিই এখানে গ্রহণযোগ্য হয় না, যেহেতু য়িহুদা ইস্কারিয়োত সম্পর্কে মথির সুসমাচারে বলা হচ্ছে যে, "সে যখন দেখল, যিশুর দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে তখন সে তার উৎকোচের অর্থ ফেরত দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে মুদ্রাগুলো ছুঁড়ে ফেলে অন্যত্র গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরল" (মথি ঃ ২৭ঃ৩-৫)। এটা অবশ্য হতেও পারে পরের সংযোজন।

কুরনীয় শিমোন সম্পর্কে অবশ্য প্রথম তিনটি সুসমাচারে বলা হয়েছে যে, তাকে পেয়ে তাকে দিয়ে যিশুর ক্রুশকাষ্ঠ বহন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, কিন্তু যোহনের সুসমাচারে বলা হয়েছে, যিশু নিজের ক্রুশকাষ্ঠ নিজেই বহন করেছিলেন। তবুও যেহেতু প্রথম তিনটি সুসমাচারের বক্তব্য অনুসারে ক্রুশকাষ্ঠ বহন করতে শিমোনকে বাধ্য করা হয়েছিল, কাজেই তার কোনো পাপ ছিল না। সুতরাং এক্ষেত্রে 'বদলী' থিওরী আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বাইবেলের বর্ণনা থেকেও জানা যায় "ক্রুশযজ্ঞের পরে দেহের ক্ষত নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাদের সামনে আহারও করেছিলেন, তিনি তো কবর থেকে জীবিত হয়ে বেরিয়ে আসা প্রকৃত যিশুই" (যোহন- ২০ঃ২০, লুক- ২৪ঃ৪০-৪৩)।

বদলী ঘটনার কথা ছেড়ে দিলেও চারটি সুসমাচারের মধ্যেই আবার এমন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যদ্বারা যিশুর ক্রুশে আরোহণ স্বীকার করে

www.pathagar.com

নিলেও তার ভিতর দিয়ে কিছু বিভ্রান্তিকর ব্যাপারাদির মাধ্যমে তাঁর প্রাণে বেঁচে পলায়নের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বাইবেলের চারটি সুসমাচারে ক্রুশযজ্ঞ সম্পর্কিত উক্তিগুলো হচ্ছে–

"পিলাত (শাসনকর্তা) জানতেন, লোকেরা হিংসা করেই তাঁহাকে ধরিয়ে দিয়েছে। পিলাত যখন বিচারের আসনে বসেছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, ঐ নির্দোষ লোকটিকে তুমি কিছু করিও না, কারণ আজ স্বপ্নে আমি তার দরুন অনেক কষ্ট পেয়েছি। --- তারা (প্রধান ইমামেরা এবং বৃদ্ধ নেতারা) সকলে বলল, তাকে ক্রুশে দেওয়া হোক! --- তখন তিনি (পিলাত) পানি নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, 'এ নির্দোষ ধার্মিক লোকের রক্তের জন্য আমি দায়ী নই, তোমরাই তা বুঝবে" (মথি ২৭ ঃ ১৮-২৪)।

"সিরকা গ্রহণ করে যিশু বললেন, সমাপ্ত হল, পরে মস্তক নত করে প্রাণ ত্যাগ করলেন। --- তখন সৈন্যরা এসে ঈসার সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেয়া হয়েছিল তাদের দু'জনের পা ভেঙ্গে দিল। পরে ঈসার নিকট এসে সৈন্যরা তাঁর পা ভাঙ্গল না। কিন্তু একজন সৈন্য তাঁর পাঁজরে বল্লম দিয়ে খোঁচা মারল আর তখনই সে জায়গা হতে রক্ত আর পানি বের হয়ে আসল" (যোহন-১৯ঃ৩০-৩৪)।

"যে শত-সেনাপতি ঈসার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে ঈসাকে এভাবে মরে যেতে দেখে বলল, সত্যিই ইনি খোদার পুত্র ছিলেন" (মার্ক- ১৫ঃ৩৯।

"পিলাত আশ্চর্য হলেন যে, ঈসা এত তাড়াতাড়ি মরে গিয়েছেন। সত্য সত্য ঈসার মৃত্যু হয়েছে কি না, তা শত-সেনাপতিকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। যখন সেনাপতির নিকট হতে তিনি জানতে পারলেন যে, সত্যই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন লাশটি ইউসুফকে দিলেন" (মার্ক- ১৫ঃ৪৪-৪৫)।

"পরে আরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ ঈসার লাশটি লইবার জন্য পীলাতের নিকট অনুমতি চাইলেন। ইউসুফ ছিলেন ঈসার গুপ্ত উম্মত, কারণ তিনি ইহুদী নেতাদের ভয় করতেন। পিলাত অনুমতি দিলে পর তিনি এসে ঈসার লাশ নিয়ে গেলেন। আগে যিনি রাত্রি বেলায় ঈসার নিকটে এসেছিলেন, সেই নীকদীমও প্রায় একমন দশসের গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে নিয়ে আসলেন ---। ঈসাকে যেখানে ক্রুশের ওপর মেরে ফেলা হয়েছিল সে জায়গায় একটা বাগান ছিল আর সেখানে একটা নতুন কবর ছিল। সে কবরের মধ্যে কাকেও কখনো দাফন করা হয়নি। সেই দিন ছিল ইহুদীদের ঈদের আয়োজনের দিন, আর কবরটাও নিকটে ছিল বলে তারা ঈসাকে সে কবরেই দাফন করলেন। --- সপ্তাহের প্রথম দিনের খুব সকালে অন্ধকার থাকতেই

www.pathagar.com

মগ্দলীনী মরিয়ম সেই কবরের নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, কবরের মুখ হতে পাথরখানা সরানো হয়েছে।---সে'ই সাহাবীদের নিকটে দৌড়িয়ে গিয়ে বললেন, লোকেরা প্রভুকে কবর হতে নিয়ে গেছে" (যোহন- ১৯ঃ৩৮-৪২, ২০ঃ১-২)।

"যে স্ত্রীলোকেরা ঈসার সঙ্গে গালীল হতে এসেছিলেন তাঁরা ইউসুফের পেছন পেছন গিয়ে কবরটা দেখলেন এবং ঈসার লাশ দাফন করা হলো তাও দেখলেন। অতপর তাঁরা ফিরে এসে লাশের জন্য সুগন্ধিমসলা এবং মলম তৈরি করলেন। এর পর তাঁরা মুসার হুকুম মত বিশ্রাম বারের বিশ্রাম করলেন। সপ্তাহের প্রথম দিনের খুব সকাল বেলায় সে স্ত্রীলোকেরা সে মসলা নিয়ে সেখানে গেলেন। তারা দেখলেন, কবরের মুখ হতে পাথরখানা সরিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু কবরের ভিতরে গিয়ে তারা খোদাবন্ধ ঈসার লাশ দেখতে পেলেন না" (লুক- ২৩ঃ৫৫-৫৬, ২৪ঃ১-৩)।

"তারা প্রত্যুষে উঠে তাঁর সমাধিতে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত দেহ দেখতে পায়নি। আর ফিরে এসে বলল যে, তারা স্বর্গদূতেরও দর্শন পেয়েছেন। দূতেরা বলেছেন, তিনি জীবিত" (লুক-২৪ঃ২৩-২৪)। "সেই একই দিনে, সপ্তাহের প্রথম দিনের সন্ধ্যা বেলায় সাহাবীরা ইহুদী নেতাদের ভয়ে ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে এক জায়গায় মিলিত হয়েছিলেন। তখন ঈসা এসে তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাদের শান্তি হউক' এ কথা বলে তিনি তাঁর দু'হাত ও পাজরের দিকটা (ক্ষতস্থান) সাহাবীদের দেখালেন" (যোহন- ২০ঃ১৯-২০)।

খ্রিস্টানগণ দাবি করেন 'যিশুর ক্রুশারোহণ ও পুনরুজ্জীবন' তাঁরই একটা ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন। ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো–"---এর পরে কয়েকজন আলেম ও ফরীশী ঈসাকে বললেন, 'হুজুর, চিহ্ন হিসেবে আমরা আপনার নিকট হতে একটা আশ্চর্য কাজ দেখতে চাই'। --- (যিশু বললেন) ইউনুস নবী যেমন সেই মাছের পেটে তিন দিন ও তিন রাত্রি ছিলেন, মনুষ্য পুত্রও (যিশু) তেমনই তিন দিন ও তিন রাত্রি মাটির নিচে থাকবেন" (মথি- ১২ঃ৩৮-৪০)।

এখানে প্রথমেই আমরা মথি ২৭ঃ১৮-২৪-পদে দেখতে পাই, পীলাত (শাসনকর্তা) বুঝতে পেরেছিলেন লোকেরা হিংসা করে যিশুকে ধরে দিয়েছে; পিলাতের স্ত্রী যিশুকে শাস্তি দিতে বারণ করেছিলেন; এবং 'এ নির্দোষ ধার্মিক লোকের রক্তের জন্য আমি দায়ী নই, তোমরাই তা বুঝবে' উক্তিটি দ্বারা শাসনকর্তার অনিচ্ছুক মনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইহুদী পুরোহীতদের দাবি প্রত্যাখ্যান করার সাহস শাসনকর্তার ছিল না, তবুও কোনো প্রকারে যিশুকে রক্ষার জন্য তিনি মানসিকভাবে চিন্তিত ছিলেন।

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবে অপরাধীকে ক্রুশের উপর কয়েক দিন রাখা হতো, তার সমস্ত অঙ্গ ও গ্রন্থি ভাঙ্গা পাওয়া যেত। কিন্তু 'যোহন ১৯ঃ৩০-৩৪'-পদে দেখা যায় ক্রুশারোপিত অপর দু'ব্যক্তির পা ভাঙ্গা হলো, অথচ ঈসাকে মৃত দেখে তার পা ভাংলো না। মার্ক ১৫ঃ৪৪-৪৫ ও যোহন ১৯ঃ৩৮-পদে শত সেনাপতির ঈসাকে মরে যেতে দেখা, অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঈসার মৃত্যুতে পীলাতের আশ্চর্য হওয়া এবং শত-সেনাপতিকে ডেকে মৃত্যুর কথা শোনা, আবার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষাকারী 'যিশুর গুপ্ত উম্মত' ইউসুফ ও নীকদীমের হাতে লাশ তুলে দেয়া, নিকটেই পূর্বে তৈরি একটি নতুন কবরে তড়িঘড়ি করে দাফন করা, মগ্দলীনি মরিয়মসহ গালীল থেকে আগত স্ত্রীলোকদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা; এ সবকিছুই যেন পীলাতের স্ত্রী, পীলাত, শত-সেনাপতি, গুপ্ত উম্মতগণ ও মগ্দলীনি মরিয়মসহ গালীল থেকে আগত স্ত্রীলোকদের 'যোগসাজস' প্রমাণ করে। এছাড়া যোহন ১৯ ঃ ৩৪-পদে 'পাঁজরের সে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ও পানি বের হওয়া' যিশুর জীবিত থাকারই সাক্ষ্য বহন করে।

দেখা যায় এখানে গভর্নর পিলাত শত-সেনাপতির মাধ্যমে এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যে, যিশুকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ক্রুশ থেকে নামাতে হলো। তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গ ভাঙ্গা হয়নি। কারণ, দেখা গিয়েছিল এর মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হতে পারে প্রকৃতপক্ষে তিনি মারা যাননি, সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন মাত্র। ইহুদী পুরোহিতরা তাঁকে মৃত ধরে নিয়েছিল এবং অপরপক্ষে তাঁকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত গুপ্তকর্মী বা উম্মতেরা তাড়াতাড়ি একটি নতুন তৈরী কবরে অপসারণ করলেন। সেখানে তারা তাঁকে সুশ্রূষা করে জখমগুলো সারিয়ে সুস্থ করে তোলে। হাঁটতে সক্ষম হবার পর তিনি গোপনে রাত্রি বেলা সে স্থান ত্যাগ করে 'ইসরায়েল কুলের হারানো মেষদের অবশিষ্টদের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লেন'। কিন্তু মহান প্রভু তাঁর প্রিয় নবীর সাথে ইহুদী পুরোহিতদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিলেন। "দোয়া করতে করতেই তিনি তাদের ছেড়ে গেলেন এবং তাঁকে বেহেস্তে তুলে নেয়া হলো" (লুক- ২৪ঃ ৫১)।

বাইবেলের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে প্রমাণ হয় 'যিশু ক্রুশে মারা যাননি'। যিশুকে ক্রুশে চড়ানো হলেও তাতে তাঁর মৃত্যু না হলে এবং যে কোনোভাবে মৃত্যুর এক সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে তিনি রক্ষা পেয়ে গেলে সেটাতো তাঁর ক্রুশিফিকেশন (ক্রুশবিদ্ধ) হয় না, হয় তার চোখের দেখা, পুরোদস্তুর দৃষ্টিভ্রম। সুতরাং ক্রুশে যিশুর মৃত্যু না হলে তাঁর পুনরুজ্জীবনের কোনো প্রশ্নই উঠে না। তদুপরি 'মথি- ২৬ঃ৫৬ এবং মার্ক- ১৪ঃ৫০'-পদে

www.pathagar.com

বল হয়েছে, (যখন যিশুকে ধরা হলো) ----"তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁকে ফেলে পলায়ন করল"।

এখান থেকে জানা যায় যিশুর কথিত মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন পর্যন্ত ঘটনাগুলোর বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের উক্তি হচ্ছে– "--- তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি বরং তাদের কাছে এরূপ মনে হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত ছিল এবং এ সম্বন্ধে অনুমান ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৪ঃ১৫৭-১৫৮)।

কুরআনের এ উক্তি থেকে বোঝা যায়, সত্যই তারা একটি নিষ্ফল ক্রুশযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিল। সর্বোপরি ক্রুশযজ্ঞ এবং (খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মের স্বীকৃত মতে) যিশুর ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ একটি অলৌকিক ঘটনা। আর অলৌকিক ঘটনার কোনো যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চলে না। অলৌকিক ঘটনা যদি কোনো যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আওতায় পড়ে তবে তা হয়ে যায় ইহলৌকিক বা জাগতিক বিধি-সম্মত ঘটনা।

গৃহীত বাইবেলের চারটি পুস্তিকাই এ বিষয়ে এক মত যে, কোনো এক শুক্রবার যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন এবং সন্ধ্যার পূর্বেই সমাহিত হন, আবার রবিবার বেলা উঠার পূর্বেই কবর থেকে মৃতদেহ অদৃশ্য হয়ে যায়। এখানে হিসেব মত শুক্রবার সন্ধ্যা হতে রবিবার ভোর বেলা পর্যন্ত দুই রাত ও এক দিনের হিসেব পাওয়া যায়। অথচ খ্রিস্টানরা এ ঘটনাকে যিশুর একটি ভবিষ্যদ্বাণী 'মথি- ১২ঃ৩৮-৪০'-পদের বাস্তবায়ন বলে দাবি করেন। সে মত উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী 'মথি- ১২ঃ৩৮-৪০' অনুসারে যিশু তিন দিন তিন রাত্রি কবরে জীবিত থাকার কথা, যেমন ইউনুস নবী তিন দিন তিন রাত মাছের পেটে জীবিত ছিলেন। কিন্তু খ্রিস্ট বিশ্বাস মতে তিনি কবরে এক দিন দু'রাত মৃত অবস্থায় ছিলেন। যিশু যদি তিন দিন তিন রাত কবরে জীবিত অবস্থায় থাকেন, তবে যিশুর ভবিষ্যদ্বাণী, বাইবেলের তথ্যসমূহ এবং কুরআনের উক্তি (৪ঃ১৫৭-১৫৮ ও ৩৭ঃ১৪২)-এর সাথে মিলে যায়। অথচ হিসেবের এমনি বহু গড়মিল মাথায় নিয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে অংক শাস্ত্রকে হার মানিয়ে বৃহৎ একটি শিক্ষিত সভ্য জাতির মধ্যে আজও খ্রিস্টধর্ম টিকে আছে। কিন্তু মানুষতো জড় পদার্থ নয় বরং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। কাজেই একজন মানুষকে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সত্য উঘাটন ও গ্রহণে ব্রত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বে পলের পত্রাবলী ও চারটি সুসমাচার নিয়ে যে ইঞ্জিল প্রচলিত আছে, যাকে কানুনিক ও প্রমাণিত ধর্মগ্রন্থ বলে অভিহিত করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে ফাদার বায়ন মার্ট ও ফাদার বেনয়েট পাঠকদের সতর্ক করে তাদের রচিত 'সিনোসিস অব দি ফোর গসপেল' নামক পুস্তকে বলেছেন, "একাধিক ঘটনার বেলায় পাঠক যেন মেহেরবানী করে ঘুণাক্ষরেও মনে না আনেন যে, তিনি সরাসরি যিশুর বাণী পাঠ করছেন বা শুনছেন।" উক্ত গ্রন্থে আরো বলেছেন–"যিশুর জীবনী সংক্রান্ত লোক-কাহিনী যেভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে সঞ্চারিত হয়েছিল, বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীও তেমনি একই সমান্তরালে বিবর্তিত হয়েছে।"

১৯৭২ সালে একশত জনেরও অধিক ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট বাইবেল-বিশেষজ্ঞ সম্মিলিতভাবে বাইবেলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুবাদকর্ম সম্পূর্ণ করেন। সেটি হলো 'ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল নিউটেস্টামেন্ট'। এখানে তারা মন্তব্য করেছেন–"(বাইবেল) বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার এলোমেলো এক সাহিত্যকর্মতো বটেই সে সাথে এগুলো অতুলনীয় বৈপরীত্যের সমাহার"।

ফাদার বায়িসমার্ড তার রচিত পুস্তকাংশের ভূমিকায় মন্তব্য করেন- "--- বাইবেলের শব্দাবলী ও রচনার কাঠামো সুদীর্ঘকালের বিবর্তনে যা দাঁড়িয়েছে তাতে তা আর আদি রচনার মত সঠিকত্বের দাবিদার হতে পারে না। আজ যদি কোনো পাঠক জানতে পারেন যে, তিনি বাইবেলে যিশুর বাণী, কাহিনী অথবা তাঁর নিজ ভাগ্য সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে যা পড়ছেন আদতে তা ঠিক এমনিভাবে বলা হয়নি। বরং লেখকদের দ্বারা সেগুলো পরিবর্তিত ও সম্পাদিত হয়েছে। তাহলে তার পক্ষে বিস্মিত কিংবা বিব্রত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। যারা এ ধরনের ঐতিহাসিক গবেষণার সাথে পরিচিত নন, তাদের কাছে গবেষণার এ ফলাফল অদ্ভূত এমনকি কেলেংকারীজনক মনে হওয়াও স্বাভাবিক।"

যোশ ম্যাকডাওয়েল তার 'রেযারেকশান ফ্যাক্টর গ্রন্থে উল্লেখ করেন–" আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি যে, যিশু খ্রিস্টের পুনরুজ্জীবিত হওয়া' মানব জাতির মনের ওপর সত্য বলে চালিয়ে দেয়া একটি জঘন্যতম দুষ্ট, হৃদয়হীন, পাপাসক্ত ভাওতা অথবা ইতিহাসের একটি অতীব কল্পনাবিলাসী ঘটনা।"

মেজর ঈট্স ব্রাউন তার, লাইফ অব এ বেঙ্গল ল্যান্সার' কাব্যে প্রকাশ করেন–"মানুষ বংশাণুক্রমে এমন এক কলংক মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে যে, ব্যক্তিগতভাবে সেজন্য দায়ী না হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে

www.pathagar.com

হবে এবং এ রহস্যময় অভিসম্পাতকে অকেজো করার জন্য এতকিছুর মধ্যে স্রষ্টাকে তাঁর একমাত্র পুত্রকে বলি দিতে হল; এরকম এক অদ্ভূত ধারণা কোনো ধর্মহীন জাতি-গোষ্ঠীও চিন্তা করতে পারেনি।"

জোহানেস লেম্যান তার 'দি জিসাস রিপোর্ট' গ্রন্থের ১২৭ পৃষ্ঠায় বলেন– "ইতিহাসের যিশু এবং গীর্জাসংস্থার খ্রিস্ট-এর মধ্যকার ব্যবধান এতই ব্যাপক হয়ে উঠল যে, তাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের সম্ভাবনা আর থাকলো না"।

জেরুসালেমের এ্যাংগিলকান বিশপ কেনেথ ক্র্যাগ তার 'দি কল অব দি মিনারেট' গ্রন্থে বলেন- "নতুন নিয়ম সে রকম নয়, --- এর মধ্যে রয়েছে সংক্ষিপ্তকরণ ও সম্পাদনা এবং আরও রয়েছে পছন্দ ও সাক্ষ্য। সুসমাচারগুলো লেখকদের আড়ালে গীর্জার ধ্যান-ধারণা প্রসূত। এগুলো অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের ফলশ্রুতি"।

টি.জি টাকার 'তার দি হিস্ট্রি অব দি ক্রিশ্চিয়ান ইন দি লাইফ অব মর্ডান নলেজ' গ্রন্থে বলেন–"যে সম্প্রদায়ের জন্য লেখা হতো তাদের বাস্তব প্রয়োজনের ধ্যান-ধারণাকে তুলে ধরার জন্য সুসমাচার প্রণীত হতো। এ সুসমাচারের মধ্যে গতানুগতিক উপাদান ব্যবহার করা হতো বটে, কিন্তু এটা পরিবর্তন অথবা এতে সংযোজন কিংবা যা লেখকের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হতো তা বিয়োজন করা হতো বিনা দ্বিধায়"।

প্রফেসর জে. আর. ডামিলো তার 'কমেন্ট্রি অন দি হোলি বাইবেল' গ্রন্থে বলেন-"যা মূল পাঠে নেই কিন্তু তার মতে যা থাকা উচিত ছিল, তাই একজন নকলনবীশ কখনও কখনও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি অস্থির স্মরণশক্তির ওপরে নির্ভর করেছেন কিংবা তিনি যে সম্প্রদায়ের লোক তাদের মতাদর্শের সাথে পাঠককে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন।"

প্যারিসস্থ ক্যাথলিক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ফাদার কানেন গিয়েসার তার 'ফেইথ রেজারেকশান, রেজারেকশান অব ফেইথ' গ্রন্থে লিখেন-"কেউ যেন যিশুখ্রিস্ট সম্পর্কিত বাইবেলের কোনো সুসমাচারের বর্ণনাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করেন। কেননা বাইবেল-লেখকগণ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কোনো বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার প্রয়োজনেই হয়তোবা স্ব স্ব জনপদে প্রচলিত লোক কাহিনীকে এভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।"

প্রচলিত খ্রিস্টবাদ ও এর স্বরূপ সম্বন্ধে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ড. রোনাল্ড মেয়ার তার 'জিসাস অর পল' গ্রন্থে বর্তমান খ্রিস্টবাদের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর কথা উল্লেখ করে বলেন-"খ্রিস্টবাদ

www.pathagar.com

বলতে যদি এমন এক খ্রিস্টের ওপর বিশ্বাস বুঝায়, যিনি ঈশ্বরের স্বর্গীয় পুত্র, যিনি স্বর্গ হতে মর্তে অবতরণ করে কুমারী মাতার মাধ্যমে মানবতার মধ্যে প্রবেশ করেন, যেন ক্রুশে স্বীয় রক্তের বিনিময়ে মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন। যিনি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে আরোহণ করে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রভুরূপে প্রার্থনা শ্রবণ, প্রতিপালন ও পরিচালনা করেন। যিনি জগতের বিচার করার জন্য আকাশের মেঘ-মালার সাথে পুনরায় আগমন করে ঈশ্বরের সমস্ত শত্রুদেরকে লোপাট করবেন এবং যিনি তাঁর নিজস্ব লোকজনদেরকে তাঁর সাথে নিয়ে আসবেন, যেন স্বর্গীয় আলোকের গৃহে তারা তাঁর গৌরবান্বিত দেহের মত হতে পারেন এটাই যদি খ্রিস্টবাদ হয়ে থাকে তবে সেই খ্রিস্টবাদের প্রবর্তন আমাদের ধর্মগুরু যিশু করেননি, করেছেন সাধু পল"।

শিকাগোর মুডি বাইবেল ইনস্টিটিউটের ডক্টর গ্রাহাম সক্রোগী তাঁর গ্রন্থে 'ইজ দি বাইবেল ওয়ার্ড অব গড?' প্রশ্নের জবাবে 'এটা মানবীয় কিন্তু ঐশী' শিরোনামে যথার্থই বলেছেন–"বাইবেল মানবীয়। বাইবেল লেখকগণ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বা বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলায় জনপদে চালু জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে লিখেছেন, যদিও অজ্ঞতাসুলভ উৎসাহে কেউ কেউ তা অস্বীকার করে থাকে।"

খ্রিস্টানজগতের বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদের এ সমস্ত করুণ স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রচলিত সুসমাচারগুলো তদানিন্তন 'পলাইন-ত্রিত্ববাদ ও জুডিও খ্রিস্টানদের একত্ববাদের' মধ্যকার তীব্র দ্বন্দ্বের মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট জনপদে চালু জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। তা একান্ত মানব মস্তিষ্কপ্রসূত ও প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করার লক্ষ্যে রচিত এবং আদৌ কোনো ঐশীবাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বাইবেল বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত পাদরী-পুরোহিতরা পর্যন্ত যখন সত্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে এগুলো 'যিশুর বাণী' সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস পোষণ করেন, সেখানে ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে প্রচলিত বাইবেলের মর্যাদা আর থাকে না। তাঁরা মনে করেন 'যিশু সম্পর্কে তৎকালীন জনপ্রিয় লোককাহিনীকে ধর্মীয় মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

মৌলবাদ

বাইবেলের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য, বিভিন্ন সংস্করণে তার বারংবার পরিবর্তন ও পুনঃস্থাপনের গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা খ্রিস্টান জগতের ডক্টর

www.pathagar.com

অব ডিভাইনিটিদের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাদের মৌনতাই প্রমাণ করে বাইবেল কোনো ঐশীগ্রন্থ নয় বরং ঐশীগ্রন্থের পরিবর্তিত ও বিকৃত রূপের সংকলন। ইহুদী নাসারারা তাদের ব্যক্তিস্বার্থে এর মূল বাণীসমূহকে দফায় দফায় পরিবর্তন করে বর্তমান আকারে সংস্করণ করেছেন। যার ফলে মহান প্রভুর সৃষ্টি জগতের সাথে বাইবেলের বাণীসমূহ সময় ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই ভুল তথ্য ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ উক্তিতে সংকলিত অসার বাইবেলকে যাঁরা খাঁটি ঐশীগ্রন্থরূপে অন্ধ বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন এঁদেরকে বস্তুবাদীরা উপহাস করে Fundamentalist' (মৌলবাদী) বলেন। অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের (বাইবেল) 'বিজ্ঞান বিরুদ্ধ উক্তিতে অন্ধ বিশ্বাসী' বলে এভাবে নিন্দা করেন।

ভুল এবং জাল বাইবেল গৃহীত হওয়ার ফলে মধ্যযুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-সমূহ যখন বাইবেলের বিজ্ঞান বিষয়ক বাণীকে একে একে ভুল প্রমাণ করতে লাগলো, তখন গীর্জা সংস্থা বাইবেলের বাণীকে সত্য আখ্যা দিয়ে 'বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্যকে' বাতিল ঘোষণা করেন এবং বিজ্ঞান চর্চাকেই নিষিদ্ধ করে বসেন। এমনকি মত পরিবর্তন না করায় একাধিক বৈজ্ঞানিককে নিগৃহীত করেন।

যদিও 'মৌলবাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো–'মূল বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকা' কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, ভুল ও অযৌক্তিক বস্তুকে আসল বস্তু ধারণায় আকড়ে ধরে থাকাকে 'মৌলবাদ' বলা হয়েছে। অপরদিকে আঁকড়ে ধরা বস্তুটি যদি সঠিক কিংবা যুক্তিসঙ্গত হয় তবে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকাটা মৌলবাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, ফলে 'মৌলবাদ' কথাটা অপবাদে পরিণত হয়েছে। যেমন, রাজার ছেলে নয়, এমন কাউকে রাজপুত্র বলে তিরস্কার করা হয়। সম্প্রতি মৌলবাদ শব্দটির অর্থ আবার 'সন্ত্রাসী'তে রূপ নিতে যাচ্ছে।

সে যুগে নির্মমভাবে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের মাধ্যমে ৫ লাখ একেশ্বরবাদী জুডিও খ্রিস্টানকে যেভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল ইতিহাসে তা'ই খ্রিস্টান মৌলবাদীদের 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' নামে কলংকিত অধ্যায়রূপে বিদ্যমান। খ্রিস্টানদের মধ্যে আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও হানাহানি সম্পর্কে সম্রাট জুলিয়ানের মন্তব্য হচ্ছে–"সাধারণ খ্রিস্টানদের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যতখানি শত্রুতা পোষণ করে, কোনো বন্য জানোয়ারও মানুষের প্রতি ততখানি শত্রু ভাবাপন্ন নয়।" এক্ষেত্রে বলা যায় ঐতিহাসিক-ভাবে 'মৌলবাদ ও মধ্যযুগীয় বর্বরতা' এ কথাগুলো একমাত্র খ্রিস্টানদের বেলাই প্রযোজ্য হয়।

www.pathagar.com

বাইবেলের পুঞ্জীভূত ভুল অবাস্তবতা ও স্ববিরোধিতার প্রশ্নে খ্রিস্টান ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাদাতাদের বিচিত্র রকমের পক্ষে-বিপক্ষের বক্তব্যের সুযোগে পশ্চিমের শিক্ষিত মহল বিশেষ করে বস্তুবাদী ও নাস্তিকরা সবকিছুকে অসত্য বলে রায় দিতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না। ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারাতে আনন্দ ও ভোগের পথে তারা নিজেদের জীবনকে সাজিয়েছেন এবং কিতাবি সংযমকে আনন্দ ও ভোগের প্রতিবন্ধকতা ভেবে তা গুড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছেন।

যুগে যুগে বাইবেলের নতুন নতুন সংস্করণ দুনিয়ার মানুষকে অবাক করে দেয়। প্রতিটি যুগেই বিখ্যাত মনীষীগণের চোখে বাইবেলের অসংখ্য ভুল-ত্রুটি ধরা পড়েছে এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করেছে; কিন্তু তারা যতই ভুল-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করছে ভুল-ত্রুটি যেন ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে অগাস্টাস সাহেব হেগেলের ইতিহাস দর্শনানুসারে ইঞ্জিলে যিশুর জন্মকথা ও অন্যান্য বিষয়গুলোকে কল্পিত উপকথা বলে ঘোষণা করলে খ্রিস্টান জগতে একটা আলোড়ন দেখা দেয়। ফলে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ক্যান্টরবেরী নগরে খ্রিস্টান পণ্ডিতগণের এক সভায় স্থির করা হয় যে, 'জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা অভিনব আবিষ্কারের ফলে প্রথম জেমসের সময় ৬১১ খ্রিস্টাব্দে বাইবেলের যে ইংরেজি সংস্করণ বের হয়েছিল তা সংশোধন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে'। এ কারণে এ সভায় ২৭ জন পণ্ডিতকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হয় এবং এরা পূর্ণ দশ বৎসর পরিশ্রম করে ১৮৮২ সালে বাইবেলের একটি নতুন সংস্করণ বের করেন। এটাই এখন new testament-এর Revised varsion নামে পরিচিত।

ইতোমধ্যে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রোনোবায়স তার 'ক্রিস্টস' নামক পুস্তকে প্রচলিত New testament-এর বিবরণগুলোকে ঐতিহাসিক নিয়মানুসারে ভিত্তিহীন ও অবিশ্বাস্য বলে ঘোষণা করেন এবং যিশুর উপদেশ Sermon on the Mount প্রভৃতি যে গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতগণের উক্তির হুবহু নকল তাও ঘোষণা করেন।

এ সকল কারণে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে গীর্জায় পাঠের জন্য লন্ডন থেকে `The British and foreign Bible Society কর্তৃক যে বাইবেল প্রকাশিত হলো তাতে দেখা যাচ্ছে যে, Old Testament-এর ৯ খানা এবং New testament-এর মোট ১৭ খানা বই স্থান পেয়েছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে বাইবেল কিরূপভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

এরপর পাশ্চাত্যের সত্যানুসন্ধানী ধর্মাচার্য, বাইবেলের ভাষ্যকার ও গবেষকগণ নতুন-পুরাতন নিয়মের বাইবেলের হাজারো ভুল-ভ্রান্তি, গোঁজামিল

www.pathagar.com

পরস্পর বিরোধী বক্তব্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিরোধী গোলমেলে তথ্য সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে প্রশ্ন তুলে এসেছিলেন। আর তাই দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলে ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিন বছর এক রকম নাজুক বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলে, শেষ পর্যন্ত অতি কায়দা করে কাউন্সিল ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়–"বাইবেলের কিছু কিছু বক্তব্য অসম্পূর্ণ ও সেকেলে।"

ইসলাম ধর্মের পরিচয়

তিন জাতির ধর্মীয় পিতা হযরত ইব্রাহীম আ.-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে নবী হযরত ইসমাঈল আ.-এর জন্ম হয়। এবং তাঁরই বংশধারায় কোরাইশ বংশে আব্দুল্লাহর উরশে বিবি আমিনার গর্ভে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ২৯শে আগস্ট মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের সময় ইসলাম ধর্মের প্রর্বতক হযরত মুহাম্মদ সা. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের ৬ মাস পূর্বে পিতা আব্দুল্লাহ এবং ৪ বছর পর মাতা আমিনার ইন্তেকাল হয়। তাঁর দুধমাতা হালিমা ও অভিভাবক ছিলেন পিতামহ আব্দুল মোত্তালিব। বাল্যকালে তিনি ছিলেন রাখাল বালক। আব্দুল মোত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে তিনি প্রতিপালিত হন। কৈশোরে তিনি চাচার সাথে ব্যবসা দেখাশুনা করতেন। যৌবনে তিনি আরবের ধনাঢ্য বিধবা খাদিজার রা. ব্যবসা দেখাশুনার ভার নেন। ২৫ বৎসর বয়সে ৪০ বৎসর বয়স্কা খাদিজা রা.-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হন। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থের নাম আল কুরআন, তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম ইসলাম এবং এর অনুসারীরা মুসলমান নামে পরিচিত।

ইসলামের দাবি অনুযায়ী 'ইসলামই হচ্ছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সত্য ধর্ম, শেষ ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ সা. শেষ এবং চূড়ান্ত নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই, কোনো ধর্ম নেই।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবন চরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি বেশ মজবুত। তাঁর জীবনী এত বেশি পঠন-পাঠন, আলোচনা-সমালোচনা, গবেষণা ও লেখালেখি হয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের জীবনী নিয়ে এক কণাও হয়নি। শুধু তাই নয়, নবী সা.-এর জীবনী শুধু যে তাঁর অনুসারী-ভক্তগণই লিখেছেন তা নয়, বরং হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদী, তাঁর শত্রু-মিত্র,

www.pathagar.com

কট্টর বিরোধীগণও লিখেছেন–যা দিয়ে একটা লাইব্রেরী তৈরী হয়ে যেতে পারে। তাঁর অনুপম পবিত্র জীবনের ছোট-বড় খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে কেউ না কেউ কোনো না কোনো বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী, তাঁর দ্বারা সম্পাদিত ও অনুমোদিত কার্যাবলী একাধিক বিশ্বস্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর আদেশ-নিষেধ তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবীগণ অতি সতর্কতার সাথে লিখে রেখেছেন। অনেকে আবার তা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছেন। পরবর্তীকালে একাধিক বিশ্বস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে তা গৃহীত হয়েছে।

আজ দুনিয়ার ধর্মমত নির্বিশেষে সকল জ্ঞানী-গুণীই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মুসলমানেরা শুধু তাদের নবীরই নয় বরং নবীর সাথে যাদের সামান্যতম সম্পর্কও ছিল তাদের জীবনীকেও যেভাবে সু-সংরক্ষিত করেছেন তা বিশ্ববাসীর জন্য একটি বিস্ময়ের ব্যাপার। রাসূল সা.-এর বাণী, কর্ম এবং তাঁর জীবনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদির বিবরণ বর্ণনাকারীদেরকে রাবি, মুহাদ্দেস ও জীবনীকার বলা হয়। এদের মধ্যে সাহাবা, তাবেঈন এবং তৎপরবর্তী অনেকেই রয়েছেন। তাদের নাম, পরিচিতি, জীবন-ইতিহাস, চরিত্র ও দৈনন্দিন জীবনের রীতি-নীতি তথা অভ্যাস পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি। তাদের এ বিপুল জীবনবৃত্তান্ত সমৃদ্ধ শাস্ত্রকে বলা হয় 'ইলমে আসমাউর রিজাল'। মুসলমানদের এ অমর কৃতিত্বকে স্বীকার করে প্রখ্যাত জার্মান গবেষক ড. প্রিংগার বলেন, "দুনিয়ার এমন কোনো জাতি দেখা যায়নি এবং আজও নেই, যারা মুসলমানদের মত 'আসমাউর রিজাল'-এর বিরাট তত্ত্বভাণ্ডার আবিষ্কার করেছে। যার বদৌলতে আজ প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের জীবন বৃত্তান্ত জানা যেতে পারে।"

'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্রে এসব ব্যক্তিবর্গের নাম, পরিচিতি তথা জীবন - বৃত্তান্ত এজন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, এদের প্রত্যেকেই রাসূল সা.-এর কথা, কাজ তথা জীবন বৃত্তান্তের কিছু না কিছু অংশ অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং বর্ণনাকারীদের বর্ণনা (হাদিস) গ্রহণে যেন তাদের বিশ্বস্ততাকে যাচাই করা যায়।

অমুসলিম বিখ্যাত মনীষীদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ সা.

হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবন চরিত অলোচনা করতে গেলে বিরাট একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ তৈরি হয়ে যাবে। আমরা এখন সে দিকে যাব না, তবে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কর্মজীবনকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অমুসলিম

www.pathagar.com

বিখ্যাত মনীষীরা কে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং কে কি বলেছেন সংক্ষিপ্তভাবে তা জানা প্রয়োজনবোধ করছি। এ সমস্ত ঐতিহাসিক বিখ্যাত মনীষীদের মানসিক সংকীর্ণতামুক্ত সত্যনিষ্ঠ মন্তব্যের ওপর দুনিয়া অবশ্যই সন্দেহাতীত উচ্চ তাৎপর্য আরোপ করে। আর এখান থেকে মুহাম্মদ সা.-এর কর্মজীবনের তথ্য-চিত্র সঠিকভাবেই বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

* ফরাসি লেখক আলফ্রেড দা লা মার্টিন তার তুর্কির ইতিহাসে গর্বভরে লিখেছেন–"উদ্দেশ্যের মহত্ব উপায়-উপকরণের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা, যদি এ তিনটি বিষয়ই মানব প্রতিভার মানদণ্ড হয় তাহলে ইতিহাসের জন্য কোনো মানবকে এনে মুহাম্মদ সা.-এর সাথে তুলনা করবে এমন সাহস কার আছে?"

তিনি আরও বলেছেন–"পুরো মানবেতিহাসে এমন নজীর নেই যে, মানুষ জেনে বা না জেনে নিজেকে কোনো একটি লক্ষ্য উদ্দেশ্যের জন্য স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিলীন করে দেয়। মুহাম্মদ সা. দার্শনিক, বাগ্মী, প্রচারকর্মী, আইনজ্ঞ, শৌর্যবান, বাহাদুর, চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে দিক-দর্শন এবং দাতাও ছিলেন। তিনি খোদায়ী বিধি-বিধান চালু করেছেন। তিনি এমন একটি বিশাল আত্মিক সাম্রাজ্যের স্থপতি ছিলেন; যা চির অনন্তকাল কায়েম থাকবে।"

* মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে প্রফেসর স্টিফেন্স বলেছেন–"মহাবিজ্ঞানপ্রসূত একটি মাত্র উদ্যোগে তিনি একই সঙ্গে তাঁর দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন।"

* পাদরী বসওয়ার্থ স্মিথ বলেছেন–"ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে মুহাম্মদ সা. একাধারে তিনটির স্থাপয়িতা- একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম।"

* ফিলিপ কে হিট্টি বলেন–"মুহাম্মদ সা. তাঁর স্বল্প পরিসরে জীবনের অনুল্লেখযোগ্য জাতির মধ্য থেকে এমন একটি জাতি ও ধর্মের পত্তন করলেন যার ভৌগোলিক প্রভাব খ্রিস্টান ও ইহুদীদের অতিক্রম করে গেল। মানব জাতির বিপুল অংশ আজ তাঁর অনুসারী।"

* ড. মার্কোস উড মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বলেন–"ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় তিনি জীবনের ঝুকি নিয়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন নির্যাতন ভোগ করেছেন, নির্বাসিত হয়েছেন, সহায় সম্পদ হারা হয়েছেন। আত্মীয় স্বজনদের রোষানলে পড়েছেন, কিন্তু কোনো প্রাচুর্যের মোহ,

www.pathagar.com

কোনো হুমকি কিংবা কোনো প্রলোভনই তাঁর ন্যায়ের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।"

* ড. গুষ্টাভ উইল বলেছেন–"তিনি মুহাম্মদ সা. রক্ত পিপাসু নীতি এবং স্বেচ্ছাচারী শক্তি আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও মহান আইন পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি সে ব্যক্তি, যিনি সর্বকালীন আইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সে ব্যক্তি যিনি ক্রীতদাসের কঠোর জীবনকে করেছিলেন নমনীয় এবং দরিদ্র, বিধবা ও এতিমদের দেখিয়েছেন পিতৃসুলভ যত্ন।"

* মি. হোরেস শিপ বলেন–"তিনি মুহাম্মদ সা. আরবকে পেয়েছিলেন প্রাচীন পৌত্তলিকতা অধ্যুষিত গোত্র বিভক্ত এবং পার্শ্ববর্তী রাজশক্তির ভয়ে সদা আতঙ্কিত। তিনি একে রেখে গেলেন ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী এবং মহান ধর্মের ধারক হিসেবে। তিনি পৃথিবীতে নিয়ে এলেন বিপ্লব, শক্তির আধার এক একত্ববাদী ধর্মকে।

* ডি.জি হোসারথ মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বলেছেন–"তাঁর দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ কিংবা তুচ্ছ সবকিছুই একটি অনুসরণীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে যা আজও কোটি কোটি মানুষ স্বজ্ঞানভাবে মেনে চলছে। একমাত্র তিনি ছাড়া মানব জাতির কোনো অংশ নির্ভুল মানুষ হিসেবে আর কাউকেই এমন নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা চলে না।"

* মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে এডওয়ার্ড গিবন বলেছেন–"তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল বিশাল, তাঁর রসিকতা ছিল শালীন ও সদাপ্রস্তুত, তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল উন্নত ও মহৎ, তাঁর বিচার বুদ্ধি পরিষ্কার ও দ্রুত সিদ্ধান্তকারী, চিন্তা ও কাজ উভয় ক্ষেত্রেই অসীম সাহস ছিল তাঁর।"

* পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু বলেছেন–"হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রচারিত ধর্ম, এর সততা, সরলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা, ন্যায়-নীতি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রাণিত করে। কারণ ওই সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবত একদিকে শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, অপরদিকে ধর্মীয় ব্যাপারে নির্যাতিত হচ্ছিল পোপদের হাতে। তাদের কাছে এ নতুন ব্যবস্থা ছিল মুক্তির দিশারী।"

* মি. হোর্মি জে, রুস্তমজি বার এট-ল মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে লিখেছেন–"ইসলামের পয়গম্বর হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি উঁচু-নিচুর পার্থক্য দূরীভূত করে মানব জাতিকে সভ্য ও সাম্যের বাণী শিক্ষা দিয়েছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি মানব জাতির পরিচালক। শাসকগণের মধ্যে তিনি মহোত্তম শাসক ও

www.pathagar.com

নিরহঙ্কারীগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা নিরহংকারী। আমি যতদূর জানি, ইসলাম সাম্যের যে শিক্ষা দিয়েছে তা কোনো ধর্মে দেখা যায় না।"

* দেওয়ান বাহাদুর এস,পি,সিং,এম,এল,এ লিখেছেন–"ইসলামের পয়গম্বর একজন মহান রাষ্ট্রশাসনবিদ ও নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সফলকাম নেতা ছিলেন।

যেহেতু কুরআন যিশুখ্রিস্টকে উচ্চ প্রসংসা করে কাজেই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী-হেতু আমি ইসলামের পয়গম্বরকে সম্মান করতে বাধ্য। যখন একজন খ্রিস্টান প্রতিনিধি এ পবিত্র পয়গম্বরকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর মসজিদের পবিত্র স্থানটি তাদের প্রার্থনা করার জন্য ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। মুসলমানদের শাসন-কর্তাদের আমলে খ্রিস্টানদের গীর্জাগুলো পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়েছে। এ পবিত্র পয়গম্বরের সহনশীলতার উদাহরণ এ দেশে অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে।"

* ইসলামের পয়গম্বর সম্পর্কে এম, এন, রায় লিখেছেন–"মুহাম্মদের কঠোর একেশ্বরবাদ, আরবীয় মুসলমানদের তরবারী সঞ্চালনে এমন অজেয় ক্ষমতা দান করল যে, তা শুধু আরব উপজাতিগুলোর দূষিত পৌত্তলিকতাকেই নষ্ট করল না, জরথুস্ত্রীয় অপপ্রচার থেকে, আচার-ভ্রষ্ট খ্রিস্টধর্মের অঘটন ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে অগণিত মানুষকে মুক্তি দিবার জন্য ইতিহাসের প্রধান ও একমাত্র সহায় হয়ে রইল। আরবদের বিস্ময়কর সামরিক সফলতা এটাই প্রমাণ করে যে, তাদের তরবারী মানব জাতির সেবায় তথা মানবতার অগ্রগতির পথেই চালিত হয়েছিল। ইসলাম অবদান রাখল আদর্শগত ব্যবস্থা নির্মাণে, যা নিয়ে এলো পরবর্তী সামাজিক বিপ্লব। ---- ইসলাম ইউরোপকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে দিল মুক্তি আর তার সঙ্গেই গড়ে উঠল আধুনিক সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ।"

* স্যার গোকুল চন্দ্র নারঙ বলেছেন–"আরবীয় নবীর শিক্ষা যখন অসভ্য আরবদের মধ্যে উজ্জীবিত করে দিল এক নতুন জীবন, তখন তারা হয়ে দাঁড়ালো সমগ্র দুনিয়ার শিক্ষক। আর শিক্ষা, বিজয় ও ঐশী সাহায্যের পতাকা উড়তে আরম্ভ করল একদিকে বাংলা অন্যদিকে স্পেনের ওপর।"

* ইসলামের পয়গম্বর মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে প্রফেসর ভেঙ্কট রত্নম বলেছেন–"মুহাম্মদ সা.-এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণাঙ্গ ও কলঙ্কহীন এবং কতক ব্যাপারে যিশুখ্রিস্টের চেয়ে উন্নততর। মুহাম্মদ সা. কখনো নিজেকে ভগবানের সমান মনে করেননি। তাঁর অনুসারীরা কখনো একবারের জন্যও বলে না যে, তিনি শুধু একজন মানুষের বেশি আরো কিছু ছিলেন। তারা কখনো তাঁর ওপর

www.pathagar.com

ঐশী সম্মান আরোপ করে না। নবী সব সময়ই ভগবানেরই প্রেরিত পুরুষমাত্র বলেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কতক দিক থেকে যিশুখ্রিস্টের চেয়ে মুহাম্মদ সা. মানুষের কাছে উন্নততর দৃষ্টান্ত। পার্থিব ও আত্মিক উভয় ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মানুষের দক্ষ নেতা। শত্রুর প্রতি তিনি ছিলেন সদয়। জীবনের পবিত্রতাকে তিনি ভালবাসতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এক ন্যায়বান ও সত্যবাদী জীবনযাপন করে গেছেন। যিশুখ্রিস্টের বৈপরীত্যে তিনি কঠোর পরীক্ষায়ও কখনো অভিযোগ করেননি। কখনো ভগবানে আত্মসমর্পণ না করে একটি শব্দও উচ্চারণ করে বলেননি- যেমন বলেছিলেন যিশুখ্রিস্ট 'হে প্রভু! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ'।

মুহাম্মদ সা. তাঁর সহচরগণকে শিখিয়েছিলেন পূণ্যকে ভালোবাসতে এবং পাপকে ঘৃণা করতে। খ্রিস্টানজগত ভালো করবে যদি তারা স্মরণ করে মুহাম্মদ সা.-কে। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এমন উদ্দীপনা যা যিশুর নিকট-ঘনিষ্ট অনুসারীদের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বিফল হবে। যিশুখ্রিস্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাঁর অনুসারীরা অরক্ষিত ও মরণের মুখে অসহায় ফেলে পালিয়ে যায়। এর বিপরীতে মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারীরা তাদের আক্রান্ত নবীর চার পাশে ভিড় করে দাঁড়ায় এবং তাঁর প্রতিরক্ষায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করে শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করে। সুতরাং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সা. অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে দুনিয়ার অধিকতর মঙ্গল করে গেছেন।"

* এ.জি লিউনার্ড মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বলেন–"তিনি (মুহাম্মদ সা.) ছিলেন সত্যের জনক। তিনি স্বয়ং ছিলেন সত্য, নিজের কাছে, তাঁর অনুসারীদের কাছে, পরিচিতদের কাছে, সর্বোপরি মহান অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে।" তিনি আরও বলেছেন-"এ পৃথিবীর কোনো মানুষ যদি ঈশ্বরকে দেখে থাকেন, কোনো মানুষ যদি কখনও সৎ ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বরের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতরূপে সে ব্যক্তিটি হলেন আরবের নবী মুহাম্মদ সা.।"

* প্রফেসর সাধু টি, এল বস্বানী বলেছেন–"দুনিয়ার অন্যতম মহৎ বীর হিসেবে মুহাম্মদ সা.-কে আমি অভিবাদন জানাই। মুহাম্মদ সা. এক বিশিষ্ট শক্তি। দয়াময় আল্লাহর মহৎ বাণী নিয়ে ইসলাম অগ্রসর হয়েছে এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার মশাল বহন করে নিয়ে গেছে আফ্রিকা, চীন, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ, রাশিয়া ও ভারতবর্ষে। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল কর্ডোভার বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় যা সুদূর ইউরোপের বিভিন্ন অংশের খ্রিস্টান শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করত; সেসব শিক্ষার্থীদেরই একজন যথাসময়ে রোমের পোপ

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। সে সময় ইউরোপ ছিল অন্ধকারে, তখন স্পেনে মুসলিম পণ্ডিতেরা উচ্চে তুলে ধরেছিলেন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোকবর্তিকা।"]

* ইসলামের নবী সম্পর্কে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন–"মুহাম্মদ সা. এমনই একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন, যাকে না হলে বিশ্ব অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। তাঁর কৃতিত্বময় ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসে এক সমুজ্জল অধ্যায় রচনা করেছে।"

* জি. এম. রডওয়েল বলেন–"বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত যে, মুহাম্মদ সা.-এর যাবতীয় কাজকর্ম এ মহা প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হত যে, মানব জাতি যেন অবজ্ঞা, ও পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, নিগূঢ় সত্য তথা আল্লাহর একত্বের বহুল প্রচার।"

* ড. গেস্টাউলি 'আরব সভ্যতা' গ্রন্থে লিখেন–"ইসলামের সেই উম্মি নবীর ইতিবৃত্ত বড়ই আশ্চর্যজনক। তৎকালের কোনো বৃহৎ শক্তি যে জাতিকে নিজের আওতায় আনতে পারেনি, সে উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে তিনি এক আওয়াজে বশীভূত করেন।

* অতঃপর সে জাতিকে এমন স্তরে উন্নিত করেন, যার দ্বারা পরাশক্তিগুলো তছনছ হয়ে যায়। বর্তমানকালেও তিনি কবরে অবস্থান করে লক্ষ লক্ষ আল্লাহর বান্দাকে ইসলামের কালেমার ওপর অটল রেখেছেন।"

* মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে টমাস কারলাইল বলেন–"মুহাম্মদ সা.-এর চিন্তাধারা ছিল অতি পবিত্র ও চরিত্র ছিল অতি উত্তম। তিনি ছিলেন এক সক্রিয় সংস্কারক, যাঁকে আল্লাহপাক মানুষের হেদায়াতের জন্য নিযুক্ত করেছেন। তাঁর বাণী মূলত আল্লাহরই বাণী, তিনি অক্লান্ত প্রচেষ্টার সাথে সত্যের প্রচার করেন। বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে তাঁর অনুসারী বিদ্যমান। আর এতে সন্দেহ নেই যে তাঁর সততাই জয়যুক্ত হয়।"

তিনি আরও বলেন–"অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারী ছিলেন মুহাম্মদ সা.। আমি বলছি স্বর্গের জ্যোতির্ময় বিদ্যুৎ ছিলেন এ মহান ব্যক্তিটি। অবশিষ্ট সকল লোক ছিল জ্বালানীর মত। অবশেষে তারাও পরিণত হয়েছিল আগুনের স্ফুলিংগে।"

* জি হ্যাগেন্স বলেছেন–"কোনো ব্যক্তি মুহাম্মদ সা.-এর জীবন ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যাপারে যতই চিন্তা-ভাবনা করে ইসলামের সাফল্যসমূহের ব্যাপকতায় সে ততই বিস্মিত হবে। যে ধরনের সংকটময় পরিস্থিতির মোকাবেলা মুহাম্মদ সা.-কে করতে হয়েছে, এমনটি হয়ত খুব

www.pathagar.com

কম নবীর বেলায়ই হয়ে থাকবে। একজন ধর্মীয় দিকপাল, প্রশাসক ও সংস্কারক হিসেবে যেভাবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন এর তুলনা মেলা ভার। কিন্তু আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস ও মজবুত ঈমান ছিল এবং নিজের আদর্শ ও শিক্ষার সত্যতা ও খাটিত্বের অনুভূতি ছিল, অন্য কোন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বই এর কোনো দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে না। মুহাম্মদ সা. একথা প্রমাণ করেছেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরীত নবী ও রাসূল। আর এ ঘটনা এমন যা এর পূর্বে বা পরে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।"

লিও টলস্টয় বলেন–"মুহাম্মদ সা.-এর কর্মপদ্ধতি ছিল মানব চরিত্রের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। আর একথা আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, হযরত মুহাম্মদ সা.-এর শিক্ষা ও আদর্শ ছিল একান্ত বাস্তবভিত্তিক।"

* ঐতিহাসিক ড্রেপার বলেছেন–"তিনি (মুহাম্মদ সা.) নিজেকে অনাবশ্যক ধর্মতত্ত্বের জটিলতার মধ্যে নিয়োজিত করলেন না, কিন্তু ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মিতাচারিতা এবং নামাজ রোজা সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অনুগামীদেরকে সামাজিক উন্নতির যথাযথ ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি দীন-দুঃখীর প্রতি বদান্যতা দেখানো এবং তাদের জন্য দান-ধ্যান করাকে সবার ওপরে স্থান দিলেন।"

* ইসলামের নবী মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে জর্জ বার্নার্ডশ বলেছেন–"আমি বিশ্বাস করি। সমগ্র বৃটিশ সম্রাজ্য এ শতাব্দী শেষ হবার আগেই সংস্কারকৃত মুহাম্মদবাদ গ্রহণ করবে।" কথাটাকে নিশ্চিত করার জন্য জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, "সব সময়েই আমি মুহাম্মদ সা.-এর ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য জীবনী শক্তির কারণে উচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করে আসছি। এটাই একমাত্র ধর্ম যা সর্বকালের পরিবর্তনশীল সমস্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে। আমার মতে বিখ্যাত লোকদের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর দুনিয়া অবশ্যই সন্দেহাতীতভাবে উচ্চ তাৎপর্য আরোপ করবে। মুহাম্মদ সা.-এর ধর্ম সম্পর্কে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে আগামী দিনে তা গ্রহণীয় হবে, যেমন আজকের ইউরোপের কাছে তা গ্রহণীয় হতে আরম্ভ করেছে। মধ্যযুগীয় পাদ্রীবর্গ হয় অজ্ঞতা, নয় দুঃখজনক বিদ্বেষ বা গোঁড়ামীর মাধ্যমে মুহাম্মদ সা.-এর ধর্মকে কুৎসিতভাবে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলেন মানুষ মুহাম্মদ সা. ও তাঁর ধর্ম উভয়কেই ঘৃণা করার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত। তাদের কাছে মুহাম্মদ সা. ছিলেন খ্রিস্টবিরোধী। আমি তাঁকে–এ আশ্চর্য মানুষটিকে অধ্যয়ন করেছি এবং আমার মতে খ্রিস্টধর্ম বিরোধী বলাতো দূরের কথা, তাঁকে অবশ্যই মানবতার উদ্ধারকারী বলতে হবে।"

www.pathagar.com

বৃটিশ বিজ্ঞানী জর্জ বার্নাড'শ আরও বলেন–"যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদ-সম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক অধিনায়কের শাসনাধীনে আনা হতো, তবে মুহাম্মদ সা.-ই সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতা হিসেবে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন"।

* লেন পোল মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বলেছেন–"পৃথিবীর বুকে মুহাম্মদ সা.-এর মত দূরদর্শী এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিতীয় আর একটিও দেখা যায় না। মুহাম্মদ সা. জোর জবরদস্তি বা পরাক্রম মোটেও সমর্থন করতেন না। তিনি মানুষের সীমাবদ্ধতা, তার যোগ্যতা, প্রতিভা এবং দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন। এজন্য মুহাম্মদ সা. তাঁর সাহাবীদের উপদেশ দিতেন, তারা যেন এতটুকু এবাদতই করেন যতটুকু তাদের ধৈর্য ও ক্ষমতার ভেতর আছে। এমনিভাবে অনাগত কালের উদ্ধৃতি দিয়ে মুহাম্মদ সা. তাঁর সাহাবী রা.-এর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—শোন! তোমরা এমন একটি যুগে রয়েছ যখন আমার দেয়া আদর্শের মাত্র এক দশমাংশ ছেড়ে দিলেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর অনাগত দিনগুলোতে তোমরা দেখবে যে গোটা আদর্শের মাত্র এক দশমাংশের ওপর যে ব্যক্তি চলবে তাকেই বাঁচিয়ে দেয়া হবে।

প্রফেসর লা মারটিন বলেছেন, "দার্শনিক সুবক্তা, স্বর্গীয় দূত, আইন প্রণয়নকারী, যোদ্ধা, ধারণায় বশিভূতকারী, যুক্তিপূর্ণ মতবাদের ও মূর্তিবিহীন ধর্মীয় প্রথার পুনঃসংস্থাপনকারী, বিশটি আঞ্চলিক সম্রাজ্যের এবং একটি আধ্যাত্মিক সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এ মুহাম্মদ সা.। যা দিয়ে মানবীয় মহত্বের পরিমাপ করা চলে, তার সকল মানের বিচারেই আমরা যথার্থই এ প্রশ্ন করতে পারি- 'মুহাম্মদ সা.-এর চেয়ে মহত্ত্বের কোনো ব্যক্তি কি আছেন?' মুহাম্মদ সা. বিনম্র, তবু নির্ভিক; শিষ্ট, তবু সাহসী; ছেলে-মেয়েদের মহান প্রেমিক, তবুও বিজ্ঞজন পরিবৃত; তিনি সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে উন্নত, বরাবর সৎ, সর্বদাই সত্যবাদী, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী, এক প্রেমময় স্বামী, এক হিতৈষী পিতা, এক বাধ্য ও কৃতজ্ঞ পুত্র, বন্ধুত্বে অকৃত্রিম এবং সহায়তায় ভ্রাতৃসুলভ। প্রতিকূল ঘটনায় বা সম্পদের সমৃদ্ধিতে অথবা দারিদ্রে, শান্তিকালে বা যুদ্ধে তিনি অবিচলিত, দয়ার্দ্র। তিনি অতিথিপরায়ণ এবং উদার, নিজের জন্য সর্বদাই মিতচারী। কঠিন তিনি মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে, ব্যভিচারীর বিরুদ্ধে, খুনি, কুৎসাকারী, অপব্যায়ী, অর্থলোভী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা এবং এ জাতীয় লোকের বিরুদ্ধে। তিনি ধৈর্য, বদান্যতায়, দয়ায়, পরোপকারিতায়, কৃতজ্ঞতায়, পিতা মাতা ও গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং নিয়মিত আল্লাহর প্রার্থনা (নামায) অনুষ্ঠানে এক মহান ধর্ম প্রচারক।"

www.pathagar.com

* অপরাজিত বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বলেছেন– "মুহাম্মদ সা. ছিলেন এমন রাজা তিনি তার স্বদেশবাসীগণকে তার চতুর্পার্শ্বে সমবেত করেন। তার ১৫ বৎসরের মধ্যে অধিকতর আত্মাকে মিথ্যা দেব-দেবী হতে ছিনিয়ে আনেন। অধিকতর দেবমূর্তি ধুলিস্মাৎ করেন, অধিকতর পৌত্তলিক মূর্তি ধ্বংস করেন, যা পনের শত বৎসরেও মুসা আ. এবং যিশুখ্রিস্টের অনুসরণকারীগণ করতে পারে নাই। মুহাম্মদ সা. একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁকে বস্তুত একজন ঈশ্বর বলা যেতে পারত যদি তিনি যে বিপ্লব এনেছিলেন, তার প্রস্তুতি ঘটনা চক্র দ্বারা না ঘটত।"

সত্যসন্ধানী ইউরোপীয় বিখ্যাত লেখক 'মাইকেল এইচ হার্ট' পৃথিবীর ১০০ জন শ্রেষ্ঠ মহামানবের 'The Hundred' নামক বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থের তালিকায় মুহাম্মদ সা.-এর নাম রেখেছেন একেবারে শীর্ষে। বইয়ের ভূমিকায় এর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে লেখক বলেন, "পৃথিবীর এক'শ জন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় আমি মুহাম্মদ সা.-এর নাম কেন এক নম্বরে বাছাই করলাম তা আমার পাঠকদের বিস্মিত করবে এবং অন্যরা প্রশ্নও তুলতে পারে, কিন্তু তিনি হলেন ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও ইহজাগতিক উভয় দিক দিয়ে চরমভাবে সফলকাম।"

* এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে–"নবী রাসূলদের মধ্যে শুধুমাত্র মুহাম্মদ সা.-এর জীবনকেই সব ধরনের সফলতায় পূর্ণ বলে আখ্যায়িত করা যায়। বিশ্বের কোনো ধর্মের প্রবক্তা বা আহ্বানকারীই তাঁর মিশনকে সফল করে যেতে পারেননি। একমাত্র ইসলামের নবীই এ বিরল দৃষ্টান্ত কায়েম করে দেখিয়ে দিয়েছেন।"

* লিউনার্ড বলেন–"ইতিহাসে মুহাম্মদ সা.-এর মত কোনো সংস্কারক দেখা যায় না, যিনি সময়ের এত অল্প পরিসরে মানুষের জীবনে এতবড় অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক সংস্কার সাধন করে গিয়েছেন।"

* বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, কংগ্রেস নেতা, লালা লাজপত রায় বলেন– "একথা ঘোষণা করতে আমার মোটেই দ্বিধা সংকোচ নেই যে, ইসলামের নবীর প্রতি আমার সর্বাপেক্ষা বেশি শ্রদ্ধা রয়েছে। আমার মতে ধর্মীয় শিক্ষক এবং সংস্কারকদের মাঝে তিনিই মর্যাদার অধিকারী।"

* এড ওয়ার্ড মন্টন, নবী মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বলেন–"চরিত্র গঠন ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ সা. যে সাফল্য লাভ করেছেন, সে প্রেক্ষাপটে তাঁকে মানবতার মহান দরদী নেতা বলে বিশ্বাস করতেই হয়।"

www.pathagar.com

* বসওয়ার্থ স্মীথ বলেন–"তিনি (মুহাম্মদ সা.) ছিলেন ধর্ম ও রাষ্ট্রের নেতা, একাধারে পোপ (ধর্মযাজক) ও কাইজার (শাসক), কিন্তু পোপের কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব এবং কাইজারের সৈন্য সামন্ত এর কোনোটিই তাঁর কাছে ছিল না। ছিলনা তাঁর কোনো রক্ষী বা বিশেষ বাহিনী, তাঁর কোনো রাজপ্রাসাদও ছিল না। ছিল না কোনো স্থায়ী আমদানী। রাষ্ট্র শাসন ও রাজ্য চালনার খোদায়ী অধিকার যদি কখনও কোনো মানুষের ভাগ্যে জুটে থাকে, তবে তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সা.। কারণ সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও এজন্য তাঁর কোনো বাহ্যিক অবয়ব ছিল না, ছিল না কোনো বৈষয়িক অবলম্বন।"

তিনি আরও বলেন–"মরুভূমির একজন রাখাল বা সিরিয়ার একজন বণিক, হেরাগুহার একজন ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি বা নিছক সংস্কারক, মদীনার একজন দেশত্যাগী ব্যক্তি বা সর্ববাদী সম্মত বিজয়ী, এসকল বিভিন্ন অবস্থায় আমরা যখন মুহাম্মদ সা.-এর দিকে নজর দেই, তখন সকল অবস্থায় তাঁকে একই অবস্থায় দেখতে পাই। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এমন কোনো ব্যক্তি আমরা দেখতে পাবো না, যার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এত পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর অন্তরের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাইরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে কোথা থেকে কোথায় গিয়েছে, কিন্তু কোনো অবস্থায় মূল বস্তুর কোনো পরিবর্তন নেই।"

* আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদী প্রফেসর জুলুস ম্যাসারম্যান তার 'হু আর দি ওয়ার্ল্ডস গ্রেট লিডার্স' নামক নিবন্ধে লিখেন যে, সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হচ্ছেন মুহাম্মদ সা.।"

* মনীষী আলফ্রেড মার্টিন বলেন–তাঁর (মুহাম্মদ সা.-এর) অক্ষয় কীর্তি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এত দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর দেশের গোত্রভিত্তিক মানুষদেরকে একটি মহোত্তম জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মধ্যযুগীয় আরবভূমিতে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান মতবাদের দ্বারা তা কোনো ক্রমেই সম্ভব হতো না।"

* মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে লেনপোল বলেন–"সাধুতা ও ধর্মপ্রচারক হিসেবে মুহাম্মদ সা. যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও অনুরূপ শ্রেষ্ঠই ছিলেন।"

* ইসলামের পয়গম্বর সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম মূর বলেছেন–"যারা মুহাম্মদ সা.-কে অস্বীকার করেছে, তাঁর অবমাননা করেছে, তাদেরকে তিনি যে উদারতার সাথে ক্ষমা করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।"

* স্যার উইলিয়াম মূর আরও বলেন–"মহানবী সা.-এর আবির্ভাবকালীন সময়ের মত সামাজিক অধোগতি আর কখনও ঘটেনি এবং মহানবী সা.-

www.pathagar.com

এর তিরোধানের সময় সমাজ-জীবন যে পূর্ণতা পেয়েছিল তাও আর কখনও দেখা যায়নি।"

* ভারতের মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এস.কে রামকৃষ্ণ রাও তার 'দ্যা প্রফেট অব ইসলাম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন– "ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোতে দেখা যায় যে, "মুহাম্মদ সা.-এর সমকালীন সকল ব্যক্তি বন্ধু এবং সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে যে, ইসলামের প্রচারকদের মাঝে সদগুণাবলী, নিষ্কলংকতা, সততা, উদারতা, নৈতিকতা, চরম নিষ্ঠা ও চরম বিশ্বাস জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং মানবীয় প্রত্যেক গণ্ডিতে বিরাজমান। এমনকি ইহুদীরা এবং যারা তাঁকে বিশ্বাস করতো না তারাও তাদের ব্যক্তিগত কলহের যথাযথ এবং ন্যায়পরায়নতার সাথে বিচারের জন্য তাঁকে বিচারক হিসেবে ডাকতো।"

* জন দা ভেন পোট মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বলেছেন–"সাধারণ অর্থে লেখাপড়া না করলেও তিনি বিশ্ব প্রকৃতিকে এত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন যে, তাঁর শত্রুদের সূক্ষ্মতম ধূর্তামিপূর্ণ মনোভাবও অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন এবং অনুসারীদের সামান্যতম আকাঙ্ক্ষার কথাও বুঝতে পারতেন। তাঁর বাচনভঙ্গি অত্যন্ত মধুর ও অলংকারময় ছিল। কথা বলার সময় তাঁর চেহারায় এমন সুন্দর নমনীয়তা ফুটে উঠতো, যার ফলে তাঁর দৃঢ়তা ও আবেগ প্রবণতা বুঝে ওঠা সম্ভব হতো না।"

জন দা ভেন পোট আরও বলেন–"একটি মহৎ মনের সারল্য নিয়েই তিনি অতি সামান্য কর্ম করতেন। এমনকি সারা আরবের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তিনি নিজের হাতেই আপন ছেঁড়া কাপড়-চোপড় সেলাই করতেন, উষ্ট্র দোহন করেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, বাতিও জ্বালাতেন।

* রেভারেন্ড ডাব্লু স্টীফেন বলেন–"মুহাম্মদ সা. মূর্তিপূজার মত জগা-খিচুড়িপূর্ণ দর্শনের স্থলে নির্ভেজাল তাওহীদ আকীদা প্রতিষ্ঠা করে মানুষের চারিত্রিক মান উন্নত করেন। আর সংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত করে একটি সুসমন্বিত ও ভক্তিভিত্তিক উপাসনার রীতি প্রবর্তন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এ আকীদা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে আবর্জনার মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, ভয়ঙ্কর, অসভ্য ও উচ্ছৃঙ্খল গোত্রগুলোকে একসূত্রে গেঁথে এক শক্তিশালী দলে পরিণত করেন। তিনি আরবের প্রচলিত অনেক ঘৃণ্য রেওয়াজ ও প্রথার ভিত্তিমূলে চরম আঘাত হানেন এবং লাগামহীন যৌনাচারের স্থলে একাধিক বিবাহের এক সতর্ক ও বিধিবদ্ধ রীতি প্রবর্তন করেন। কন্যা হত্যার বর্বর নিয়মকে সমূলে উচ্ছেদ করেন, তুর্কি, ভারতীয়, আফ্রিকান এবং স্থানীয় অসভ্য লোকেরা অবশেষে মূর্তিবিগ্রহগুলোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হয়।"

www.pathagar.com

নবী সম্পর্কে বিশিষ্ট মনীষী ড্রেপার বলেন–"যে মানুষটি সমগ্র মানবজাতির ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তিনিই হচ্ছেন মুহাম্মদ সা.।"

আমেরিকান গবেষক জর্জ ক্রবাইট বলেন–"নারী জাতির অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে মালিকানা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ সা.-এর বলিষ্ঠ অবদান রয়েছে, যা তিনি নিজ উম্মতের স্ত্রীগণকে দানকরে গেছেন। আইনের চোখে স্ত্রীদের এই একই অধিকার রয়েছে, যা তাদের স্বামীদের জন্য রয়েছে।"

* Dr. Steingass quoted in T.P. Hughes Dictionary of Islam, গ্রন্থে বলা হয়েছে–"মুহাম্মদ স.-কে যারা কুরআনের রচয়িতা হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বক্তব্য অযৌক্তিক এবং অমূলক। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি কীভাবে আরবি সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় লেখক হতে পারেন ? কীভাবেই বা তিনি শাশ্বত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ বর্ণনা করলেন যা সে সময় অপর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি ? এমনকি আজও এর মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতির সন্ধান লাভ করা সম্ভব হয়নি ?"

* ভারতের বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলেছেন–মুহাম্মদ সা. যে নারী জাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আদেশ করে গিয়েছেন, বিশেষ করে বিধবাকে; যার অবস্থা আরব ও ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় ও নৈরাজ্যজনক ছিল, তাকে দয়া ও ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখতে হুকুম করে গিয়েছেন, এসব কথা অস্বীকার করা যায় না।

* বসওয়ার্থ স্মীথ, মোসে কারলাইল সরোজিনি নাইডু, এমার্সন, ক্রাবাইট প্রমুখ বিশ্ব বিখ্যাত মনীষীগণ মুহাম্মদ সা.-কে নারী মুক্তির প্রবক্তা বলে স্বীকৃতি দান করে ঘোষণা করেন যে, "নারী জাতিকে তার বিভিন্ন অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ সা. বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছেন এবং এ সমস্ত অধিকার ইতোপূর্বে নারী জাতিকে আর কেউ দিতে পারেনি।"

তাঁরা আরও বলেন–"স্বামী যাতে স্ত্রীর প্রতি সৎ ও সদয় ব্যবহার করে সেজন্য তিনি নতুন বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন। স্বামীর অসদাচরণের বিরুদ্ধে স্ত্রীদের আইনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। জাহেলী যুগের প্রথাসিদ্ধ প্রচলিত নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহের রীতি বন্ধ করেন এবং সদ্য প্রসূত কন্যাকে জীবন্ত কবর দানের পাশবিকতা উৎখাত করে তিনি নারী জাতিকে মুক্তি দান করেন এবং তাদের অবস্থানে শুভ পরিবর্তন সাধন করেন।"

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এইচ,আর, গীবন তাঁর 'মোহামেডানিজম' গ্রন্থে লিখেছেন –"আজ এটা এক বিশ্বজনীন সত্য যে, মুহাম্মদ সা. নারীদেরকে এক উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।"

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের মন্তব্য

* ইসলাম সম্পর্কে ভারতীয় ঐতিহাসিক ড. তারাচান লিখেছেন- "বিশ্বাসের সরল সূত্র, উত্তমরূপে বর্ণিত ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনের গঠনতন্ত্রীয় তত্ত্ব নিয়ে ইসলাম দৃশ্যপটে উপস্থিত হলো। --- যে ধর্ম তিনি প্রচার করেছেন তা অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল। এ ধর্মে খুব কমসংখ্যক উপদেশাবলী ও আচার অনুষ্ঠান বর্তমান, কারণ কুরআন অনুসারে আল্লাহ মানবের ভারকে হালকা ও সরল করতে চেয়েছেন। তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় দৈনন্দিন প্রার্থনা (নামাজ), উপবাস (রোজা), তীর্থযাত্রা (হজ্জ), দান (যাকাত) এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসই হলো এ ধর্মের প্রধান স্তম্ভ। সামাজিক দিক থেকে এ ধর্মের সর্বাপেক্ষা প্রভাবনীয় বৈশিষ্ট্য হল- মুসলমানদের মধ্যে একত্ব ও ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা এবং পুরোহীত শ্রেণীর অনুপস্থিতি।"

* ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাহাত্মা গান্ধী বলেছেন- "ইসলাম তার গৌরবময় দিনগুলোতে অসহিষ্ণু ছিল না। তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল দুনিয়ার শ্রদ্ধা। প্রাচ্য যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত প্রাচ্যের আকাশে উদিত হলো এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিল স্বস্তি। ইসলাম একটা মিথ্যা ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সাথে হিন্দুরা তা গ্রহণ করুক, তাহলে আমার মত তারাও একে ভালোবাসবে।

অনুচরদের জীবনী থেকে শুরু করে আমি খোদ নবীর জীবনী অধ্যয়নে উপনীত হলাম, দ্বিতীয় খণ্ড বন্ধ করলাম যখন, তখন দুঃখিত হলাম এ জন্য যে সে মহৎ জীবন সম্পর্কে আর কিছু পড়ার রইল না আমার। আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে আমার বিশ্বাস জন্মাল যে, তরবারী নয় যার সাহায্যে ওই সময়ে জীবনের পরিকল্পনায় ইসলামের আসন অর্জিত হয়েছিল তা ছিল নবীর কঠোর সারল্য, সম্পূর্ণ অহম বিলোপ, চুক্তির প্রতি সযত্ন-সম্মান, বন্ধুজন ও অনুসারীদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, তাঁর নির্ভিকতা।"

তিনি আরও বলেন–"পুরোহিত প্রথা আর নয়, নবী মুহাম্মদ সা. ভেঙ্গে দিলেন পুরোহিত প্রথার যাদু। আল্লাহ ও মানুষের মাঝে কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল না। আরম্ভ থেকেই তা ছিল এক গণতান্ত্রিক ধর্ম। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কোন প্রথা। কুরআন পাঠের মাধ্যমে প্রত্যেকেরই প্রবেশাধিকার ছিল ঐশীবাণীতে, যা ব্যাখ্যাত হতো মুক্তভাবে, ধর্মসভার স্বেচ্ছা সীমিতকরণ ব্যতিরেকেই। এ দিক থেকে ইসলাম খ্রিষ্টধর্মের অনুরূপ কোনো সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেনি, বস্তুত যে গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

ধারণা ইসলামে প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে, খ্রিস্ট ধর্মে তার আরম্ভ হলো মাত্র জাতীয়তাবাদ ও ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম-বিপ্লবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে।"

* ধর্মনেতা গুরু নানক বলেছেন-"বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে, এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ। সাধু, সংস্কারক, গাজী, পীর, শেখ ও কুতুবগণ অশেষ উপকার কুড়াবেন যদি তারা পবিত্র নবীর ওপর দরুদ পাঠান। মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং দোযখে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই।"

* প্রফেসর স্নাউক হারগ্রোনজে ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন-"মানবীয় জাতি সংঘের আদর্শ অন্য কোনো ধর্মের চাইতে ইসলামের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ মুহাম্মদ সা.-এর ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ এত গুরুত্ব সহকারে সকল মানবজাতির সাম্যের নীতিকে গ্রহণ করেছে যে তাতে লজ্জায় পতিত হয়েছে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি।"

* জি. ডাব্লিউ লাইটস অপ্রিয় সত্য কথা বলেছেন-"পৃথিবীতে বহুসংখ্যক ধর্ম এসেছে, যেগুলো তাদের মূলরূপ হারিয়ে ফেলেছে। এসবের আদর্শ নাস্তানাবুদ হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠে যে, মুহাম্মদ সা. যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন এর শিক্ষা আদর্শ কত দিন পর্যন্ত বাঁকি থাকবে। এ প্রশ্নের জবাবের জন্য আমাদের শুধু মুহাম্মদ সা.-এর ব্যক্তিত্বকে সামনে রাখতে হবে।"

* ডেনিস বলেন-"বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ ধরনের সংস্কৃতি আরব ভূমি থেকে জন্ম নিয়েছে। এমন এক সময় তার উদ্ভব, যখন তীব্রভাবে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল।"

* ইসলাম সম্পর্কে ঐতিহাসিক হিট্টি তার 'হিস্ট্রি অফ দি আরব' নামক গ্রন্থে লিখেছেন-"শর্তহীন একত্ববাদ ও খোদায়ী কুদরতের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস" ইসলামের এ বুনিয়াদী আকিদাই সর্বশক্তির কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে 'অল্পে তুষ্টির' মত এমন এক মহৎ গুণ বিদ্যমান, যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে অবর্তমান। এ কারণেই মুসলিম বিশ্বে আত্ম হত্যার ঘটনা বিরল।

* মহাত্মা গান্ধী বলেন-"আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি যে, ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করেনি, বরং এর পেছনে রয়েছে রাসূলে আরবী সা.-এর দৃঢ় গুণাবলী। তাঁর এ সকল গুণাবলীই মানবাত্মাকে বশীভূত করেছে।"

* প্রফেসর ভাইওয়ান গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন-"ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে যে সমস্ত বইয়ে মুহাম্মদ সা. ও তাঁর ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে

www.pathagar.com

লেখা ছাপা হয়েছে, আজকের শিক্ষিত সমাজে সেগুলোর কোনো মূল নেই। যেমন, ইসলাম তলোয়ারের জোরে এসেছে। এ দাবিটি এখন ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।"

* এডওয়ার্ড গীবন বলেন- "মুসলমানদের প্রতি একটি মিথ্যা অপবাদ চাপানো হচ্ছে যে, প্রত্যেক ধর্মকে তলোয়ারের জোরে শেষ করে দেওয়া হোক' এটি একটি ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদ। মুসলমানদের ইতিহাস ও আল-কুরআনের গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সকল ধর্মাবলম্বীর সাথে উদারতার শিক্ষা দেয়। মুহাম্মদ সা. শুধু চারিত্রিক শক্তিবলেই সকল জাতি ও গোত্রের ওপর বিজয় লাভ করেছেন, তালোয়ারের জোরে নয়।"

* প্রফেসর রামদেব তাঁর বৈদিক ম্যাগাজিনে বলেন- "এটা বলা ভুল যে, ইসলাম তরবারী দ্বারা প্রসার লাভ করেছে। বরং এটাই প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলাম প্রচারে কখনো তরবারী ব্যবহৃত হয়নি।"

* খ্রিস্টান সুপণ্ডিত Jaehin wach তাঁর Comparative study of Religious নামক গ্রন্থে লিখেন-"ইসলাম এমন এক সঞ্জীবনী শক্তি, যা হাজার ঘাত-প্রতিঘাত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী কৃষ্টি ও সভ্যতার রক্ষক।"

* জন মারফী ইসলামের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে বলেন-"ইসলামের আদর্শ মানুষের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে।"

* ইসলাম সম্পর্কে সরোজিনী নাইডু বলেন-"যখন একজন সাধারণ মুসলমান দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজে একজন বাদশাহর সাথে দাঁড়িয়ে আপন প্রভুর সামনে সেজদা করে এবং বলতে থাকে 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ' তখনই ইসলামের ভ্রাতৃত্ব প্রমাণিত হয়।"

* ভারতের প্রাক্তন জনৈক মন্ত্রী বলেন-"আমি দীর্ঘদিন যাবত এমন একটি ধর্মের অনুসন্ধান করে যাচ্ছিলাম, যে ধর্ম আমাদের মানবতার উচ্চাসনে আসীন করার দায়িত্ব নিবে। এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন গবেষণা করার পর যে সত্য আমার সামনে ধরা পড়েছে তা এই যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যার মাঝে কোনো অপবিত্রতা ও সংমিশ্রণ নেই।"

* মহাত্মা গান্ধী বলেন-"পাশ্চাত্য জাতিসমূহ দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের দ্রুত প্রসারে আজ সংকিত, অথচ সেই ইসলাম স্পেনকে সভ্যতার আলো দেখিয়েছে। ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ এ কারণে শঙ্কিত, তারা জানে যে, আফ্রিকান জনগোষ্ঠী ইসলাম

www.pathagar.com

গ্রহণ করলে তারা সম-অধিকারের দাবি করবে এবং তজ্জন্য সংগ্রামও চালাবে। আমি নিজে দেখেছি যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেও সে ধর্মের অধিকার অর্জন করতে পারেনি, তারা ইসলাম গ্রহণ করামাত্র মুসলমানদের সাথে একসূত্রে গেঁথে যায়।"

* জার্মানের ধর্ম বিশেষজ্ঞ Mr. Spugicurg তাঁর `Living Religions of the world' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন-"ইসলাম আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক চরিত্র গঠনের এমন এক সুন্দর, স্বচ্ছ, শক্তিশালী, অটুট ও অজেয় আইন-বিধান কায়েম করেছে, যা শত সহস্র বছর মানুষকে সুপথ দেখিয়ে স্থিতিশীলতার এক অমোঘ দৃষ্টান্ত কায়েম করেছে।"

বিশ্বখ্যাত অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে আল কুরআন

* আল কুরআন সম্পর্কে ঐতিহাসিক গীবন বলেন-"সকল রকম সন্দেহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুহাম্মদ সা.-এর ধর্মমত সম্পূর্ণ মুক্ত এবং কুরআন স্রষ্টার একত্বের এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

* প্রফেসর টমাস কারলাইল কুরআন সম্পর্কে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন-"আমার নিকট এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কুরআনের মধ্যে সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা গুণাবলী সর্বযুগেই সমভাবে বিদ্যমান এবং এ কথাটি দিবালোকের মত সত্য যে, পৃথিবীতে যদি সুন্দর ও কল্যাণকর কিছু সৃষ্টি হয় তবে তা কুরআন থেকেই হতে পারে।"

* মি. এস লিডর বলেন-"কুরআনের শিক্ষা হতেই দর্শন বিভাগের উদ্ভব হয়েছে এবং এটা উন্নতির এরূপ চরম শিখরে পৌঁছে ছিল যে, ইউরোপের বড় বড় সম্রাজ্যের শিক্ষাকেও অতিক্রম করেছিল।

* ইসলামের ঘোর বিরূপ সমালোচক স্যার উইলিয়াম মূর কুরআন সম্পর্কে বলেছেন-"কুরআনের স্বাভাবিক এবং নৈসর্গিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বকে এরূপে প্রমাণ করা হয়েছে, যা মানুষের মনকে আল্লাহর তাবেদারী এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে।"

* মি. এমানুয়েল ডি. উইন্স বলেন-"ইউরোপে কুরআনের আলো যখন পৌঁছে তখন ইউরোপ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। এর মাধ্যমে গ্রীকদের লুপ্ত-প্রায় জ্ঞান-বিজ্ঞান পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।"

* ড. গীবন বলেন-"কুরআন একত্ববাদের প্রধান সাক্ষ্য। একজন একত্ববাদী দার্শনিক যদি কোনো দিন ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তবে তার পক্ষে

www.pathagar.com

ইসলামই উপযুক্ত। মোটকথা, সারা জগতে কুরআনের তুল্য ধর্মগ্রন্থ পাওয়া দুষ্কর।"

* জার্মান গবেষক আইকম কী বলভ লিখেন-"আল কুরআন পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়। এর ওপর আমল করলে যাবতীয় রোগ-ব্যাধি এবং জীবাণু সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।"

* পাদ্রী রেভারেন্ড জি এম এডয়েল লিখেন-"আল কুরআনের শিক্ষা মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করেছে। বস্তুতান্ত্রিকতার বাহু থেকে মানুষকে দিয়েছে মুক্তি। একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত এবং তাঁর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

* ফরাসী গবেষক ড. মোরেল বলেন-"আল কুরআন শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য যে সকল গ্রন্থ এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তার মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা ও তাৎপর্যপূর্ণ হলো আল কুরআন। মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এর বাণীসমূহ গ্রীক দর্শনের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এর প্রতিটি অক্ষর ও শব্দ মহান আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও স্তুতি বর্ণনায় সত্যই ব্যাক্যময়।

কুরআন একদিকে যেমন জ্ঞানীদের জন্য শব্দ ভাণ্ডার, আর কবিদের জন্য বাক্যালংকারের সমারোহ, তেমনি ঐতিহাসিক, শাসক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে এর গুরুত্ব ও সমাদর এনসাইক্লোপেডিয়ার চেয়েও বেশি।"

* মি. ভূপেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন-"আল কুরআন এক চিরন্তন আদর্শ। দীর্ঘ তেরশ' বছর পরও কুরআনী শিক্ষার প্রভাব এত বেশি শক্তিশালী যে, নীচ বংশের একজন নগণ্য লোকও ইসলাম গ্রহণ করার পর বড় বড় খান্দানী মুসলমানের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।"

* জার্মানীর খ্যাতনামা কবি ও দার্শনিক গ্যাটে গুরুত্বসহকারে কুরআন অধ্যয়ন করে বলেন-"যত বেশি বিরক্তি নিয়েই আমরা এ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না কেন, সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রন্থ সকল বিরক্তির অবসান ঘটায়, পাঠককে শান্ত ও সন্তুষ্ট করে, আকর্ষণ করে এবং পরিশেষে এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে পাঠককে বাধ্য করে। এরূপে এর প্রত্যেক অধ্যয়নকারীর অন্তরে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।" তিনি আরও বলেন "কুরআন অতি সহজেই অন্যকে নিজের দিকে টেনে নেয়, আর তার গুণে বিহ্বল করে ফেলে। যার দরুন শেষ পর্যন্ত আমরা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হই। এভাবেই এ পুস্তক দুনিয়ার প্রতিটি ভাষাতেই তার মজবুত ও দৃঢ় প্রভাব রেখে যাবে।"

উল্লিখিত বিখ্যাত মনীষীদের জ্ঞানগর্ভ উক্তিগুলো থেকে মুহাম্মদ সা.-এর জীবনের একটি সুন্দর ও বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁদের উক্তি থেকে এটাই প্রমাণ হয় 'মুহাম্মদ সা. দুনিয়ার একমাত্র সার্বিক সুন্দর ও সফল মানব'।

www.pathagar.com

ইসলাম ও আল কুরআন সম্পর্কেও তাঁরা সর্বদাই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। কাজেই এখানে আপনার বিশ্বাসের বিষয়টিকে একবার পরোখ করে দেখে নেয়া যেতে পারে।

এবার আমরা একটু সন্ধানী দৃষ্টি ফেলি ইসলামের পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থসমূহে। দেখি, সেখানে হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি না? আর যদি থেকে থাকে তাহলে বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী তার যৌক্তিকতাই বা কতটুকু?

এখানে কিছু কিছু ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, তা হচ্ছে 'অমুসলিমদের ধর্মগ্রন্থে, বিশেষ করে মুশরিকদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থে মুসলমানদের পয়গম্বর সম্পর্কিত মন্তব্য বা ভবিষ্যদ্বাণী তালাশ করার প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা কোথায় ?' এ প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে 'হযরত মুহাম্মদ সা. শুধু মুসলমানদের পয়গম্বর নন। হাদিস-কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি দুনিয়ার সকল জাতির সমস্ত মানুষের পয়গম্বর। এ ধরনের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পথভ্রষ্ট জাতিকে সতর্ক করার জন্য শত বিকৃতির মাঝেও ওই সকল জাতি-গোষ্ঠীর ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য থাকাটাই যুক্তিযুক্ত।' কুরআনে বলা হয়েছে, "পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে অবশ্যই এর (কুরআন তথা নবীর) উল্লেখ রয়েছে"–সূরা আশ শু'আরা ঃ ১৯৬। "এমন কোনো জাতি গোষ্ঠী নেই যাদের কাছে আমি সতর্ককারী পাঠাই নাই"–সূরা ফাতের ঃ ২৪। "নবী-রাসূল প্রেরণ করার পূর্বে আমি কোনো জাতিকে ধ্বংস করি না"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৫।

পারসিক ধর্মে আহমদ

পারসিক ধর্মনেতা বলেছেন-"আমি ঘোষণা করছি, হে স্পিতাম জরথুষ্ট্র পবিত্র আহমদ নিশ্চয় আসবেন, যাঁর নিকট হতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে" (জিন্দাবেস্তা ১৩ পরিচ্ছেদ, অনুবাদ-ম্যাক্স মুলার)। এখানে দেখা যায় পারসিকরা 'আহমদ' নামক একজন অনাগত আগমনকারীর অপেক্ষা করছেন। উল্লিখিত বাণীটি একমাত্র মুহাম্মদ সা.-এর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ তিনিই 'আহমদ' অর্থাৎ প্রশংসাকারী।

বৌদ্ধ ধর্মে মৈত্রেয়

বৌদ্ধ ধর্মনেতা গৌতমবুদ্ধ বলেছেন–"মানুষ যখন গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসবেন, তাঁর নাম 'মৈত্রেয়' অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।"

www.pathagar.com

আনন্দ তখন বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার তিরোধানের পর কে আমাদেরকে শিক্ষা দিবেন ?' তখন বুদ্ধ বলেন, "--- আমিই জগতের প্রথম এবং শেষ বুদ্ধ নই। এক সময় এ পৃথিবীতে অন্য একজন বুদ্ধের আগমন হবে, যিনি আমার চেয়েও পবিত্র ও আলোকপ্রাপ্ত এবং অনন্যসাধারণ চরিত্রের অধিকারী। তিনি আমার মত এক পূর্ণাঙ্গ ও নিষ্কলুষ ধর্মমত প্রচার করবেন।" আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কীরূপে তাঁকে চিনব ?"

বুদ্ধ বললেন, "তাঁর নাম হবে মৈত্রেয়।" এখানে লক্ষ্য করা যায় বৌদ্ধরা 'মৈত্রেয়' নামক একজন অনাগত অবতরণকারীর আগমনের অপেক্ষা করছেন। মৈত্রেয় অর্থ 'শান্তি ও করুণার বুদ্ধ'। বুদ্ধের এ বাণীটিও হযরত মুহাম্মদ সা.-এর দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কারণ ইসলামের মতে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সা.-ই 'রহ্‌মাতুল্লিল আলামিন' বা 'বিশ্বজগতের শান্তি ও করুণা' বলে পরিচিত।

হিন্দু ধর্মে শেষ অবতরণকারী!

গবেষকদের মতে হিন্দু ধর্ম প্রাচীনতার অন্ধকারে বিকৃতির শেষ সীমায় পৌঁছালেও তার মধ্যে অনাগত শেষ অবতরণকারী সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে তা দেখলে সত্যিই হতবাক হয়ে যেতে হয়। ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বহু প্রাচীন একটি ধর্মে আল্লাহ এবং তাঁর শেষ অবতরণকারী সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য সত্যিই যেন একটি অলৌকিক ব্যাপার। হিন্দু-ধর্মগ্রন্থের এ ধরনের মন্তব্য যেন আল্লাহ এবং তাঁর অনাগত শেষ অবতরণকারীর প্রতি সত্যতার স্বীকৃতি দিয়ে আপন অনুসারীদেরকে সতর্ক করারই ইঙ্গিত বহন করে।

বেদ-বেদান্ত ঐশীবাণীর বিকৃত রূপ বলে অনেকেই ধারণা করেন, তবে কোন্ নবীর ওপর এটা অর্পিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক সংগৃহীত বেদ প্রায় ৪,৭০০ বছরাধিক পূর্বের কোনো নবীর ওপর অর্পিত ঐশীগ্রন্থের বিকৃত রূপ বলে কেউ কেউ ধারণা করেন।

মহর্ষি বেদব্যাস তাঁর মূল বেদগ্রন্থ অনুসরণে সহজবোধ্য করে পুরাণসংহিতা রচনা করেন। পরবর্তীকালে বেদ ও পুরাণসংহিতা বহু খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং সেগুলো অবলম্বনে বহু গ্রন্থ রচিত হয়।

হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, হিন্দু ধর্মের অনুসারীগণ একজন অনাগত মহামানব 'কল্কি অবতার'-এর অপেক্ষা করছেন। আর এ অবতারের আগমন হবে কলি যুগে।

www.pathagar.com

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এ চার যুগের মধ্যে কলি যুগকে শেষ যুগ বলা হয়, তাই 'কল্কি অবতার' বলতে 'শেষ অবতরণকারী' বা শেষ পয়গম্বর বুঝায়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিরাট এক অংশ জুড়ে 'কল্কি অবতার'-এর বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা এ 'অবতারের' অপেক্ষা করে চলেছেন, কিন্তু এটা এমন একটা অপেক্ষা, কিয়ামত পর্যন্ত যার যবনিকাপাত ঘটবার নয়। অর্থাৎ শেষ অবতারের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না। যুক্তিযুক্তভাবে নিশ্চয় শেষ দিনের অনেক আগেই সৃষ্টিকর্তার 'শেষ দূত' দুনিয়াতে আগমন করবেন বিপথগামী লোকদেরকে সুপথে আনতে।

কল্কি পুরাণের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ে কলিকালের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে উপাখ্যানচ্ছলে বলা হয়েছে কলি যুগে মিথ্যা, দম্ভ, লোভ, ক্রোধ, হিংসা, জুয়া, মদ, বেশ্যাবৃত্তি, অধি, ব্যাধি, জরা, গ্লানি, শোক, দুঃখ, ভয়, হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতিতে পূতিগন্ধযুক্ত সমাজ জীবন বিষরূপ আগুনে জ্বলতে থাকবে। এমনি সময়ে, "কল্কি বিপ্রালয়ে (ব্রাহ্মণ পরিবারে) অবতীর্ণ হয়ে সৈন্ধব বাহনে (শ্বেতাশ্ব বাহনে) আরোহণপূর্বক সেনানীবেশে পুনর্বার সত্যযুগের সৃষ্টি করবেন, সেই নিত্যধর্ম প্রবর্তনপ্রিয় পরমাত্মা ভগবান কল্কি অবতাররূপী শ্রীহরি সবাকার রক্ষাবিধান করুন" (১ঃ১ঃ।।৩।। কল্কি পুরাণ)।

এখানে দেখা যায় শেষ যুগের প্রারম্ভে, হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাব কালের পূর্বে, বর্বর আরব জাতির পূর্ণচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সে যুগে আরব দেশের সমাজ-জীবন মিথ্যা, দম্ভ, লোভ, ক্রোধ, হিংসা, জুয়া, মদ, বেশ্যাবৃত্তি, অধি, ব্যাধি, জরা, গ্লানি, শোক, দুঃখ, ভয়, হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতিতে পূতিগন্ধযুক্ত সমাজ জীবন বিষরূপ আগুনে জ্বলছিল; ঠিক এমনি সময়ে মুহাম্মদ সা.-এর জন্ম হয়। এ সম্পর্কে ইসলামের ঘোর বিরূপ সমালোচক স্যার উইলিয়াম মূর বলেছেন- মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাবকালীন সময়ের মত সামাজিক অধোগতি আর কখনও ঘটেনি এবং তাঁর তিরোধানের সময় সমাজ জীবন যে পূর্ণতা পেয়েছিল তাও আর কখনও দেখা যায়নি।"

এ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বিপ্রালয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা উচ্চ পরিবারের কথা বলা হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে হযরত মুহাম্মদ সা. আরবের সবচেয়ে উচ্চ পরিবার কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর বাহনগুলোর মধ্যে একটি ছিল দুলদুল নামক সাদা ঘোড়া (শ্বেতাশ্ব)। হযরত মুহাম্মদ সা.-ই একমাত্র বিশ্বের বুকে পুনর্বার 'সত্যযুগের' সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সে যুগের প্রচলিত ধর্ম (মুশরেক) নয় বরং 'নিত্য-নতুন ধর্ম' ইসলাম প্রবর্তন করেছিলেন।

www.pathagar.com

কল্কির জন্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ-

"শম্ভলে বিষ্ণযশসো গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহম্।

সুমত্যাং মাতরি বিভো কন্যায়াংত্বন্নিদেশতঃ"(১ঃ২ঃ।।৪।।কল্কি পুরাণ)।

অর্থাৎ- কল্কি বলেছেন-'আমি শম্ভল নগরে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতি নাম্নী ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে আবির্ভূত হব।'

এখানে 'শম্ভল'-অর্থে সাগরতীর বুঝায়। প্রাচীনকালে হিন্দু পণ্ডিতগণ সমগ্র পৃথিবীকে ৭টি মহাসমুদ্রে ও ৭টি মহাদ্বীপ বা স্থলভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- জম্বুদ্বীপ, শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, প্রক্ষদ্বীপ, পুষ্করদ্বীপ ও শম্ভলদ্বীপ। এ শম্ভলদ্বীপের কথাই পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, যার প্রধান নগরী মক্কা, এখানেই জন্ম হয় 'শেষ অবতরণকারী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর'।

'বিষ্ণযশা' অর্থ ভগবানের দাস বুঝায়। বিষ্ণ ভগবানের একটি গুণবাচক নাম, যশ অর্থ বান্দা বা দাস। আমরা জানি মুহাম্মদ সা.-এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দাস।

'ব্রাহ্মণ' অর্থে হিন্দুদের উচ্চ বংশ বুঝায়। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পিতা আব্দুল্লাহ আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাতা আমিনাও ছিলেন আরবের সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা।

সুমত্যাং বা 'সুমতি' অর্থাৎ সু-মতি যাহার তিনিই সুমতি, সুস্বভাবা, বিশ্বাসভাজনা। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মাতার নাম 'আমিনা' অর্থাৎ সুশীলা, বিশ্বাসভাজনা, সুস্বভাবা বা সুমতি। এখানে আমরা দেখতে পাই, কল্কি অবতার বা শেষ অবতরণকারীর জন্মস্থান, পরিবার, পিতার নাম, মাতার নাম সবকিছুর যৌক্তিকতায় মুহাম্মদ সা.-এর সাথে সন্দেহাতীতভাবে মিলে যায়।

"দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধব ঃ।

জাতং দদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ" (১ঃ২ঃ।১৫। কল্কি পুরাণ)।

অর্থাৎ-বসন্ত মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে কল্কি অবতার জন্ম গ্রহণ করলে তৎদর্শনে তাঁর পিতৃকুল নিরতিশয় আনন্দিত হলেন'।

এ মন্ত্রে শেষ অবতরণকারীর জন্ম তারিখের ন্যায় অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। এখানে 'মাধব' অর্থ বসন্ত। বসন্তের আরবি রবি এবং রবিউল আওয়াল বলতে বসন্তের প্রথম বুঝায়। রবিউল আওয়াল মাসের (শুক্লপক্ষের) ১২ তারিখে হযরত মুহাম্মদ সা. জন্মগ্রহণ করেন এবং এতে তাঁর পিতৃকুল খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। কলির অবতার বা শেষ অবতরণকারীর এমন সুনির্দিষ্ট জন্ম তারিখ দিয়ে বেদব্যাস সুস্পষ্টভাবে শেষ অবতরণকারী মুহাম্মদ সা.-কেই বুঝিয়েছেন বলে গবেষকগণের বিশ্বাস।

www.pathagar.com

"ম'দৌবতিতা দেবা দ'কারান্তে প্রকৃত্তিতা।
বৃষনং ভক্ষয়েৎ সদা বেদ শাস্ত্রেচস্মৃতা।।" (নামবেদ)

অর্থাৎ-'যে দেবতার নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' বৃষ (গরু)-এর মাংস ভক্ষণ করেন এবং পুনঃবৈধ করেন, বেদ শাস্ত্রাদিতে তিনিই স্মরণযোগ্য'।

এ মন্ত্রে নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' দিয়ে গরুর মাংস ভক্ষণকারী একমাত্র মুহাম্মদ সা.-কেই বুঝানো যেতে পারে। কারণ হিন্দু শাস্ত্রে গরু পূজনীয় দেবতা হওয়ায় তার মাংস ভক্ষণ তাদের জন্য নিষিদ্ধ। এমনকি কোনো কোনো এলাকায় তারা গো হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, যদিও পাদুকা নির্মাণে অজ্ঞতাহেতু দেবতার চামড়ার কোনো বাছ-বিচার করা হয় না।

হিন্দু শাস্ত্রে কুন্তাপসুক্তের অর্থ পাপ দহন বা পাপ মোচন মন্ত্র। বেদের উক্ত কুন্তাপসুক্তে বলা হয়েছে-

"ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে
ষষ্টিংসহস্রানবতিংচ কৌরমআরুষমেষুদদ্মহে"(বেদ-কুন্তাপসুক্ত।।১।।)।

অর্থাৎ- 'হে মানব জাতি মনোযোগ সহকারে এটা শ্রবণ কর। প্রশংসিত পুরুষের স্তুতিগান হবে। আমরা তাঁকে ষাট হাজার নব্বইজন শত্রুর মাঝে শত্রু নির্মূলরত পেলাম।'

এ মন্ত্রে নরাশংস অর্থাৎ যশস্বী বা প্রশংসিত পুরুষ বলতে দুনিয়ার বুকে একজনকেই বুঝায়, যার নাম মুহাম্মদ সা. এবং যার নামের অর্থ প্রশংসিত বা যশস্বী। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সে সময় আরবের জনসংখ্যা ছিল ৬০,০৯০ জন এবং তারা সকলেই ছিল মুহাম্মদের সা. শত্রু। এ সকল শত্রুকে তিনি একে একে নির্মূল করে মিত্রে পরিণত করেছিলেন।

" উষ্ট্রা যস্য প্রবাহিনী বধুমন্তী দ্বির্দশ।
বর্ম্মা রথস্য জিহীষন্তে দিব ঈষমারন উপস্পৃশঃ" (বেদ-কুন্তাপসুক্ত।।২।।)।

অর্থাৎ- 'তাঁর রথ বিশিষ্ট উট টেনে নেয়; তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীও আছেন। তাঁর রথের শিরোভাগ মার্গধাম স্পর্শ করে নিচে নেমে আসে'।

উপরোক্ত মন্ত্রটি একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনেতিহাসের সাথে মিলতে পারে। দুনিয়ার আর কোনো মহামানবের সাথে এর সামান্যতম কোনো মিলও দেখা যায় না।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত মুহাম্মদ সা.-এর বাহন ছিল আজবা ও কাসওয়া নামক বিশিষ্ট দুটি উট। তিনি সস্ত্রীক উটে আরোহণ করে ভ্রমণ করতেন। আর কুরআনে 'মেরাজের' ঘটনায় হযরত মুহাম্মদ সা.-এর বাহন মার্গধাম অর্থাৎ আকাশের শেষ সীমা (সপ্তামাকাশ) পর্যন্ত পৌঁছে আবার নীচে নেমে এসেছিল। কল্কি পুরাণেও এ ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়–

"ত্বাং গরুড়মিদং চাশ্বং কামগং বহুরূপিনম"।।৫।।(কল্কি পুরাণ-বেদ)।

অর্থাৎ- 'এ গরুড়ের অংশ সম্ভূত অশ্বকামগামী ও বহুরূপী' (মহাদেব তা কল্কিকে দান করলেন)।

উপরে বর্ণিত বেদ মন্ত্রটি মুহাম্মদ সা. এর মেরাজ বা নভোচারণের সাক্ষ্য বহন করতে পারে। গরুড় অর্থ পক্ষ বা ডানাবিশিষ্ট বাহন। হযরত মুহাম্মদ সা. ডানাবিশিষ্ট অশ্বাকৃতি 'বোরাকে' চড়ে আকাশের শেষ সীমা বা মার্গধাম পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। বিদ্যুতের সৃষ্টি অশ্ব আকৃতি, অথচ ডানা বিশিষ্ট; তাই এ বাহন ছিল বহুরূপী।

"বচ্যস্ব রেভ বচ্যস্ব বৃক্ষেন পক্কে শকুনঃ।

ওষ্ঠে জিহ্বা চর্চারোতি ক্ষুরোণ ভূরিজোরিব" (বেদ-কুন্তাপসুক্ত।।৪।।)।

অর্থাৎ- 'হে প্রশংসাকারী, সত্যবাণী প্রচার কর, ফলন্ত বৃক্ষোপবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় গান গাও। কাঁচির পাতের মত তোমার ঠোঁট ও জিহ্বা দ্রুতবেগে চালিত হয়'।

দুনিয়ায় 'প্রশংসাকারী' বলে একজন ব্যক্তিই খ্যাতি লাভ করেছেন, যাঁকে আল্লাহ 'আহম্মদ' (প্রশংসাকারী) নামে ভূষিত করেছেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ সা.। কুন্তাপসুক্তের এ মন্ত্রে 'সত্যবাণী' (আল্লাহর বাণী) প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং প্রচারের সফলতায় প্রচারকারী ফলন্ত বৃক্ষে উপবিষ্ট পাখির ন্যায় আনন্দিত হবেন। এখানে ঠোঁট ও জিহ্বার যুক্তিপূর্ণ ধারালো সত্যবাণীতে অধর্ম দ্রুত লোপ পাওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"প্ররেভ ধিয়ং ভরস্য গোবিন্দং বসুবিদম।

দেবত্রেমাং বাচং ক্বধিষুং ন বীরো অস্তা" (বেদ-কুন্তাপসুক্ত।।৬।।)।

অর্থাৎ-'হে স্তুতি পাঠক (প্রশংসাকারী)! জ্ঞান ভাণ্ডারকে শক্তভাবে ধরে রাখ। উহা গরু ও উত্তম সম্পত্তি অর্জন করে। ধনুর্ধর যদ্রুপ তার ধনুকের গতি ঠিক করে তদ্রুপ উহা ধার্মিকদের মধ্যে প্রচার কর'।

এখানে 'জ্ঞান ভাণ্ডার' দ্বারা ঐশীগ্রন্থ (কুরআন)-কে 'গরু' দ্বারা অনুসারী ভক্তবৃন্দকে এবং 'উত্তম সম্পত্তি' দ্বারা নিষ্কলুষ ধর্মকে বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

ধনুর্ধরের উপমা দ্বারা স্থির লক্ষ্যে অটল-অবিচল থেকে সত্য ধর্ম প্রচারের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরোক্ত মন্ত্রে 'স্তুতিপাঠক' যে হযরত মুহাম্মদ সা. এবং 'জ্ঞান ভাণ্ডার' বলতে যে ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে তার সমর্থন পাওয়া যায় 'সামবেদ' থেকে।

"অহ মিধি পিতু ঃ পরিমেধামৃতস্য জগ্রহ
অহং সূর্য ইবাজনি" (সামবেদঃ ২ঃ ৬ঃ ৮)।

অর্থাৎ 'আহম্মদ' তাঁর প্রভুর নিকট হতে শরীয়ত (ধর্মপন্থা) প্রাপ্ত হয়েছেন। এ শরীয়ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ। আমি সূর্য-রশ্মির মত তাঁর নিকট হতে আলো (জ্ঞান) অর্জন করি।" মুহাম্মদ সা. স্রষ্টার নিকট থেকে 'শরীয়ত' পেয়েছেন একথা দুনিয়ার সব জাতিই জানেন। কুরআনে আল্লাহ বহুবার সে কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন, যেমন- "নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি" (সূরা আর রা'দ ঃ ১)।

"রাক্ষো বিশ্ববজনীনস্য যে দেবোমত্যা অতি।
বৈশ্বানরস্য সুষ্ঠতিমা শৃণীত পরিক্ষিতঃ" (বেদ-কুন্তাপসুক্ত।।৭।।)।

অর্থাৎ 'বিশ্বরাজের বিশ্বজ্যোতির উচ্চ প্রশংসা কর। তিনি মানব শ্রেষ্ঠদেব, মানবের পথ প্রদর্শক এবং আশ্রয়দাতা' (অনুবাদ হিন্দু টীকাকার)।

কুন্তাপসুক্তের এ মন্ত্রে উল্লিখিত যে বিশ্বরাজের বিশ্বজ্যোতির প্রশংসা করতে বলা হয়েছে, যিনি মানব শ্রেষ্ঠ দেব, পথ প্রদর্শক এবং আশ্রয়দাতা। তিনি যে 'মুহাম্মদ সা.' তার সমর্থন পাওয়া যায় কুন্তাপসুক্তেরই প্রথম মন্ত্র থেকে। সেখানে এ বিশ্বরাজ বিশ্বজ্যোতিকে 'প্রশংসিত পুরুষ' বলা হয়েছে, যার নামের অর্থ প্রশংসিত, তিনিই হচ্ছেন মুহাম্মদ সা.।

"ইন্দ্রঃ কারুমবু বধুদস্তিষ্ট বি চরা জনম্।
মমেদু প্ররুষ চক্বধি সর্ব ইত তে পরিণাদরি ঃ" (বেদ-কুন্তাপসুক্ত।।১১।।)।

অর্থাৎ- 'ইন্দ্র স্তুতিপাঠক বা প্রশংসাকারীকে জাগ্রত করলেন এবং দিকে দিকে লোকদের নিকট গমন করবার আদেশ দিলেন। তিনি প্রবল ইন্দ্রের যশোগানে (মহিমা ঘোষণায়) আদিষ্ট হলেন। সকল ধার্মিক লোক তাঁর উদ্যমের মর্যাদা উপলব্ধি করে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন'। ঠিক অনুরূপ বাণী আল কুরআনেও দেখা যায়। যেমন-"হে বসনাবৃত ব্যক্তি উঠো লোকদেরকে সাবধান কর এবং তোমার প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর" (সূরা আল মুদ্দাচ্ছির ঃ-১-৩)। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয়টি হচ্ছে, ভগবান লোকদেরকে

www.pathagar.com

সাবধান করার জন্য শেষ অবতরণকারী কল্কিকে আদেশ দিবেন। আল কুরআনে আল্লাহ লোকদের সাবধান করার জন্য রাসূল সা.-কে ওই আদেশটিই দিয়েছেন।

"অমস্বন্তা সতপতি মামহে মে গাব তেতিষ্ঠো অসুরো মঘীনঃ।
ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহ-স্রৈর্বৈশ্বানরঃ ত্রয়ং রুণাশ্চিকেত" (ঋগ্বেদ-৫, ২৭, ১)।

অর্থাৎ-'সারথী, সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, অতিবুদ্ধিমান, শক্তিমান, দয়ালু মামহ্ (প্রশংসিত বা মুহাম্মদ) তাঁর বাণী দ্বারা আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। সর্বশক্তিমানের (আল্লাহর) দাস, সর্বগুণসম্পন্ন, বিশ্বের শান্তিবাহক দশ সহস্র-সহ খ্যাতি অর্জন করেছেন'।

উপরে বর্ণিত বাণীটির প্রতিটি গুণবাচক শব্দ হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্যই প্রযোজ্য হয়। দুনিয়ার আর যে কোনো মানুষের জন্য একসাথে এতগুলো গুণবাচক শব্দ প্রযোজ্য হয় না। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং কৈশোরে তিনি আল-আমিন বা সত্যবাদী উপাধি লাভ করেন। এ ছাড়া এখানে দয়ালু মামহ্, দয়ালু প্রশংসিত বা দয়ালু মুহাম্মদ বলে তাঁরই পরিচয় দেয়া হয়েছে। এর সমর্থনে বলা যেতে পারে আল্লাহ আল-কুরআনে তাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামিন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যার অর্থ বিশ্বের করুণাশীল বা বিশ্বের শান্তিবাহক।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছে, নারী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, পদাতিক ও অশ্বারোহীসহ মাত্র দশ হাজার সহচর নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সা. মক্কায় প্রবেশ করেন। বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে ৬০ হাজার শত্রু তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন আর 'দয়ালু মামহ্' (দয়ালু প্রশংসাকারী) সকলকে ক্ষমা করে দিয়ে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করলেন যা ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জল ঘটনা।

" মে ত্বা আমদন্ তানি বৃষ্ণযা তে সোমাসো বৃত্র হত্যেষু সতপতে।
যত কারবে দশ বৃত্রাষপতি বহিষ্মতে নি সহস্রানি বর্হযঃ" (অথর্ব বেদ ২০ঃ২০ঃ ৬)।

অর্থাৎ- 'হে সত্যবাদী প্রভু; এ পানীয়, এ বীরত্ব এবং এ উদ্দীপক যুদ্ধ নিনাদ আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আমোদ দান করেছে– যখন প্রার্থনাকারী উপাসকের দশ সহস্র শত্রুকে আপনি বিনা যুদ্ধে পরাজিত করেছেন'।

উল্লিখিত বেদমন্ত্রে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনের পরিখার যুদ্ধ বা আহযাবের যুদ্ধের একটি সুন্দর চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়,

www.pathagar.com

এ যুদ্ধে শত্রুদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার, আর মুসলমানরা ছিলেন তিন হাজার। সংখ্যালঘু মুসলমানগণ শত্রুদের পরাজিত করার লক্ষ্যে শহরের চারিদিকে পরিখা খনন করলেন। শত্রুদের অভিযানে তারা ভীত হয়নি বরং যুদ্ধ নিনাদে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। শত্রুরা মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য ও কৌশল লক্ষ্য করে প্রমাদ গোণল এবং বহু চেষ্টা করেও তারা আক্রমণ করতে ব্যর্থ হলো। এর পর প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে যখন শত্রু শিবির ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল তখন তারা কোনো রকম পালিয়ে বাঁচলো। এভাবে বিনা যুদ্ধে দশ হাজার শত্রুকে পরাজিত করেছিলেন।

এখানে পাঠকদের হিসেব মিলাতে আরও কয়েকটি শ্লোক তুলে ধরছি।

"মহেন্দ্রাদ্রিস্থিতো রামঃ সমানীয়াশ্রমং প্রভুঃ

প্রাহ ত্বাং পাঠয়িষ্যামি গুরুং মাং বিদ্ধি ধর্ম্মতঃ" (কল্কি পুরাণ ১ঃ ৩ঃ ১, ২) অর্থাৎ-'মহেন্দ্র পর্বতস্থিত (হেরাপর্বত) প্রভাবশালী পুরুষ রাম তাঁকে (কল্কিকে) স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করে বললেন, 'আমি তোমাকে অধ্যয়ন করাব। ধর্মত তুমি আমাকে গুরু বলে বিবেচনা করবে'।

হিন্দু পণ্ডিতদের মতে 'রা' অর্থ বিশ্ব এবং 'ম' অর্থ ঈশ্বর। তা'হলে 'রাম' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় বিশ্ব + ঈশ্বর= বিশ্বেশ্বর। আর 'পুরুষ' অর্থ রূহ বা আত্মা। এখানে 'পুরুষ রাম'-এর সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় 'ঈশ্বরের আত্মা'।

ইসলামের মতে জিব্রাইলের অপর নাম 'রূহুল আমিন' এ শব্দের অর্থও 'আল্লাহর আত্মা'। তাহলে দেখা যাচ্ছে কল্কির অবতারকে যিনি শিক্ষা দিলেন তিনিই হলেন পুরুষ রাম অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মা বা আল্লাহর আত্মা 'জিব্রাইল'। জিব্রাইল তাঁকে হেরা পর্বতের গুহায় শিক্ষা দিলেন"এক্‌রা বি ইস্‌মি রাব্বিকাল্লাজী খালাক্ব। খালাক্বাল ইনসানা মিন্ আলাক্ব" (সূরা আল আলাক ঃ ১)।

দুনিয়ার কোনো মানুষই হযরত মুহাম্মদ সা.-কে শিক্ষা দিতে পারেনি। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে হযরত জিব্রাইল মারফত তাঁকে শিক্ষা দান করে সুপণ্ডিত করে গড়েছিলেন।

আল কুরআনেও বলা হয়েছে,-"অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাব। অতঃপর তুমি বিস্মৃত হবে না" (৮৭ঃ৬)।

"রত্নৎ সরুং করালঞ্চ করবালং মহাপ্রভম্

গৃহান গুরুভারায়াঃ পৃথিব্যা ভারসাধনম্" (কল্কি পুরাণ ঃ ১ ঃ ৩ ঃ ২৭)।

অর্থাৎ- মহাদেব (ভগবান) কল্কিকে বলছেন, 'এ করাল করবাল (ধারাল অস্ত্র-তরবারী) দিতেছি গ্রহণ কর। এর মুষ্টি রত্নময়। এটা অতিব প্রভাবশালী।

www.pathagar.com

করবালই গুরুভারা পৃথিবীর ভার হরনের প্রধান সহায়ক।' করালঞ্চ করবালং- অর্থ করাল করবাল বা ধারাল অস্ত্র (তরবারী)। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কয়েকটি তরবারী ছিল, এর মধ্যে জুলফিকার ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন– 'আমাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য তরবারী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে' (সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ)। তিনি আরও বলেন–'আমি তরবারীওয়ালা নবী, আমি যুদ্ধওয়ালা নবী' যদিও তাঁর জীবনে সংঘটিত যুদ্ধগুলো আক্রমণাত্মক ছিল না, প্রায় সবগুলো যুদ্ধই ছিল প্রতিরোধমূলক। এখানে করাল করবালের আরও একটি অর্থ হতে পারে, তা হচ্ছে-'আল-কুরআন' বা আল্লাহর বাণী। এ বাণীও ছিল ধারাল অস্ত্র স্বরূপ, যার সাহায্যে সমস্ত অধর্মই লোপ পাওয়া সম্ভব। কল্কি পুরাণে আরও বলা হয়েছে,

".....কল্কিং পুরস্তাদভি সূর্য বর্চ্চসম

শ্যামাং পিষঙ্গাম্বরমম্বুক্ষজেক্ষনং, বৃহদ্ভুজং চারু কিরীট ভূষণম" (কঃ পুঃ-৩ঃ৮ঃ৪৫)।

অর্থাৎ-'কল্কি সূর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, শ্যামল বর্ণ, পদ্মপলাশ লোচন, পীতবসনধারী, বাহুদ্বয় লম্বিত, মস্তকে দিব্য কিরীট শোভিত'। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর একটি উপাধি ছিল 'শামছুদ্দোহা'-অর্থাৎ তেজোদীপ্ত সূর্য। সূর্য যেমন অন্ধকার ভেদ করে দিবস আনে, তেমনি হযরত মুহাম্মদ সা. পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত মানব জাতিকে আলোকোজ্জ্বল সরল সঠিক ও সুন্দর পথ দান করেছিলেন। তাঁর গায়ের রং উজ্জ্বল তামাটে বর্ণের, চোখ দুটো টানা টানা, তিনি পিত (গাঢ় সবুজ) রং-এর পোশাক পছন্দ করতেন, তাঁর বাহুদুটি ছিল লম্বা, তিনি সর্বদা মাথায় টুপি পরতেন এবং যুদ্ধে শিরস্ত্রাণ পরতেন।

"দেবা ধর্ম্ম কৃতযুগং দেবা শোকাশ্চরাচরাঃ
হৃষ্টঃ পুষ্টাঃ সুসন্তুষ্টা কলকৌ রাজনি চাভবন্" (কল্কি পুরাণ- ৩ঃ১৬ঃ২)।

অর্থাৎ- 'তিনি (কল্কি) সিংহাসনে উপবেশন করলে বেদধর্ম, সত্যযুগ, দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জীবগণ হৃষ্টপুষ্ট ও সুসন্তুষ্ট হলেন'। উপরোক্ত শ্লোকটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শাসনামলের ইঙ্গিত বহন করতে পারে এবং শুধু তাঁরই শাসনামলের সাথে হুবহু মিলে যেতে পারে।

"কল্কিরুবাচ।
কালেন ব্রহ্মণো নাশে প্রলয়ে ময়ি সঙ্গতাঃ।
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ কার্যমিদং মম" (কল্কি পুরাণ- ১ঃ৪ঃ২)।

www.pathagar.com

অর্থাৎ-'কল্কি বললেন, কালে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার লয় হলে, সমস্তই আমাতে বিলীন হবে। প্রথমে আমিই ছিলাম, যখন কিছুই ছিল না। সমস্ত জীবকুল এবং সমুদয় পদার্থ আমা হতে উদ্ভুত'। হাদিসে এ ধরনের উক্তির আভাস মেলে যেমন-"প্রথম সৃষ্টি আমি ছিলাম, যখন কিছুই ছিল না, সবকিছু আমার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি, আবার সময়ে সবকিছু আমার উদ্দেশ্যেই বিলিন হবে"।

"এত স্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্য্যেণ সমন্বিত ঃ।
মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিত ঃ
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম্" (ভবিষ্য পুরাণ প্রতিসর্গ পর্বঃ ৩ঃ ৫-৬)।

অর্থাৎ- 'মুহাম্মদ নামে খ্যাত একজন ম্লেচ্ছ (বিদেশী) ধর্মগুরু শিষ্যগণসহ আবির্ভূত হবেন। তিনি মরুভূমির নিবাসী মহাদেব নৃপতি'। এ মন্ত্রে মহামদ অর্থ মুহাম্মদ সা., ম্লেচ্ছ অর্থ বিদেশী (মুহাম্মদ সা. ভারতীয় বেদব্যাসের কাছে বিদেশী বটে), মরুস্থল নিবাসীনম্ অর্থ মরুবাসী। প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্বের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থে শেষ অবতরণকারী মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে মন্ত্রটি নিঃসন্দেহে অলৌকিকতার দাবি রাখে।

"লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী সে দূষক।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জনোমম" (ভবিষ্য পুরাণ প্রতিসর্গ পর্বঃ ৩ঃ ২৫)।

অর্থাৎ- 'তাঁর অনুসারীগণ লিঙ্গের ত্বকচ্ছেদন করবে ও দাড়ি রাখবে। সে উচ্চস্বরে প্রার্থনাধ্বনি (আযান) করবে ও সর্বপ্রকার ভক্ষদ্রব্য (হালাল বস্তু) আহার করবে'। সহজবোধ্য এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ মন্ত্রের জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় না।

"বিনা কৌলং চ পশবস্তেষাং ভক্ষ্যা মতা মম।
মসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরিব ভবিষ্যতি" (ভবিষ্য পুরাণ প্রতিসর্গ পর্বঃ ৩ঃ ২৬)।

অর্থাৎ- 'সে শুকর মাংস ভক্ষণ করবে না। সে পূত তৃণলতা দ্বারা পবিত্র হবার সন্ধানে থাকবে না, বরং যুদ্ধ দ্বারা পবিত্র হবে।" 'শুকর মাংস ভক্ষণ করবে না' এ কথাটার দ্বারা সারা বিশ্বে একমাত্র মুসলিম জাতিকেই বুঝানো যেতে পারে, যার প্রবর্তক শেষ অবতরণকারী মুহাম্মদ সা. প্রতিরোধ-যুদ্ধের মাধ্যমেই সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন।

তস্মাম্মুসলবন্তো হি জাতয়ো ধর্মদূষকাঃ।

www.pathagar.com

ইতি পেশাচধর্মশ্চ ভবিষ্যতি ময়াকৃতঃ (ভবিষ্য পুরাণ প্রতিসর্গ পর্বঃ ৩ঃ ২৭)।

অর্থাৎ- 'ধর্মদ্রোহী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে মুসলমান নামে পরিচিত হবে। আমার দ্বারা এ মাংসাহারীদের ধর্ম স্থাপিত হবে'। এমন সহজ-সরল মন্ত্রে ধর্মদ্রোহী জাতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ করে মুসলমান নামে পরিচিত মাংসাহারী মুসলিম জাতির পরিচয় তুলে ধরতে আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

উপরোক্ত শ্লোকগুলো শেষ অবতরণকারী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত নির্দেশ করে, তবুও যে সমস্ত পাঠক এখনও হিসেব মিলাতে পারছেন না তাঁরা একটু সামনে বাড়িয়ে লক্ষ্য করুন –

"হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মনং অল্লম।
অল্লোহরসল্ল মহমদরঃ কং বরস্য অল্লো অল্লাম,
আদল্লাং বুকমেকং অল্লাবুকং নির্ঘাত কম" (বেদ-আল্লোপনিষদ ৭ঃ ২-৩)।

অর্থাৎ- 'আমার অস্তিত্ব আছে। আমি মহা ইন্দ্রের ইন্দ্র। আমি জৈষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, পরমপূর্ণ ব্রহ্মা। আমি আল্লাহ। আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদের তুল্য আর কে আছে? আমি আল্লাহ, আল্লাহ সহায়, অবিনশ্বর, এক এবং স্বয়ংম্ভূ'।

এখানে মহামনীষী 'বেদব্যাস' আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বও বর্ণনা করেছেন।

"আল্লোহ রসল্ল মহমদরঃ কং বরস্য অল্ল অল্লাম।
ইল্লল্লোতি ইল্লল্লা" (অর্থববেদ-উপনিষদ।।৯।।)।

অর্থাৎ- 'অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই।' এ মন্ত্রটি ইসলামের কলেমা তৈয়েবা- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর সাথে হুবহু মিলে যায়; ফিরে তাকাতে হয় ইসলামের দিকে।

"লা ইল্হা হরতি পাত্তম্ ইল্ল ইল্হা পরম পদম্ জপ্ত বৈকুণ্ঠপর অপ ইনুতিত জপি নাম মোহাম্মদম্"(উত্তরায়ন বেদ অন্কাহি-৫ম পরিচ্ছদ)।

অর্থাৎ- 'লা ইলাহা বললে সমস্ত পাপ মাফ হয়। ইল্লাল্লাহু বললে প্রচুর সম্মানের অধিকারী হয়। যদি চিরতরে স্বর্গে বাস করতে চাও তবে মুহাম্মদের নাম জপ কর'।

www.pathagar.com

এই মন্ত্রে 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'-এর গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা ব্যক্ত করে মুহাম্মদ সা.-এর অনুসরণ করতে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ মন্ত্রটি 'অন-কাহি' বা 'অন-কথা' পরিচ্ছদে উল্লিখিত আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সমাজে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মরণমুখো ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করে মুক্ত আকাশের নিচে তুলসীতলায় রাখা হয় এবং তার কানে 'অন-কথা' পাঠ করে শোনানো হয়। তাই এ মন্ত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ 'অন-কথা' কানে দিবার পর নাকি তার কষ্টের লাঘব হয় এবং অতি সহজে মৃত্যু হয়। এ অন-কথার ফলেই নাকি আত্মার মুক্তি হয় এবং পরকালে পরিত্রাণ পায়। লক্ষ্যণীয় যে, সারাজীবন পূজা অর্চনা করে মুক্তির পথ হয় না, অথচ মৃত্যুর সময় এ 'অন-কথা' উচ্চারণ করলে মৃত্যু সহজ হয়, আত্মা কষ্টের হাত থেকে রেহায় পায়, পরকালের পথ পরিষ্কার হয়। এখানে আরও একটি কথা উল্লেখ করতে হয়, তুলসী তলায় মরণমুখো মানুষের কানে অন-কথা পাঠ করার পর ঘটনাক্রমে লোকটি সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে আর ঘরে উঠতে দেয়া হয় না। জানি না এ প্রথা ওই লোকটির মুসলমান হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে কি না।

সর্বোপরি হিন্দুশাস্ত্রের শেষ অবতরণকারীর জন্ম-যুগের পরিবেশ, নাম, জন্মস্থান, জন্ম তারিখ, পিতার নাম, মাতার নামসহ সার্বিক লক্ষণাদি বিবেচনায় এনে তাঁকে খুঁজতে গেলে শশ্রুধারী, লিঙ্গচ্ছেদী, গরুর মাংসভোজী, উচ্চালাপী, আহম্মদ নামধারী, সারথী, সত্যবাদী, অতিবুদ্ধিমান, শক্তিমান, দয়ালু মামহ্, মরুবাসি মুহাম্মদ সা.-এর দিকে ফিরে তাকাতেই হয়। অন্যথায় শেষ অবতরণকারীকে খোঁজার পদ্ধতি অপূর্ণই রয়ে যায়। ব্যর্থতায় পরিণত হয় হিন্দুদের কল্কি অবতারের অপেক্ষা।

"উপ নরং নোস্তমসি সুক্তেন বচসা বর্ষ ভদ্রেন বচসা বয়ম।

চনো দধিস্ব নো গিরো না বিষ্যেম কদাচন" (অথর্বেদ- সংহিতাকাণ্ড- ২০ঃ১২৩ঃ ১৪)।

অর্থাৎ- 'আমরা মহামানবের প্রশংসা-গান গাই এবং শ্রুতিমধুর স্বরে তাঁরই মহিমা কীর্তন করি। হে বীর! সানন্দে আমাদের এ স্তুতিগান গ্রহণ করুন- তাহলে আমরা বিপদমুক্ত থাকব'। এ ধরনের বাণী আমরা কুরআনেও দেখতে পাই। যেমন-"ইয়া আয়ুহাল্লাজিনা আমানু সাল্লু আলাইহে ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা" (৩৩ঃ৫৬)। অর্থাৎ-'হে বিশ্বাসীগণ! তাঁহার (মুহাম্মদের) ওপর দরুদ ও উত্তমরূপে সালাম জ্ঞাপন কর'। এখানে সকল বিশ্বাসীদের প্রতি রসূল সা.-এর ওপর দরুদ ও সালাম জ্ঞাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

এখানে অপ্রাসঙ্গিক একটি কথা বলতে হয়, হিন্দু ধর্মের মূলগ্রন্থের কোথাও সৃষ্টির প্রতিমাপূজার উল্লেখ দেখা যায় না বরং শ্রীভগবান তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করতে ও তাদের পূজা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন–"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুওমম্" ।।৭ঃ২৪ ।। (ভগবতগীতা)।

অর্থাৎ- 'ক্ষুদ্র জ্ঞানাধিকারী মূঢ়জনেরাই নিত্য সর্বোত্তম পরমভাব না জেনে আমাকে মনুষ্য মৎস্য ও কুর্মাদিভাব প্রাপ্ত মনে করে এসবের পূজা অর্চনা করে'। এ মন্ত্রে পূজা অর্চনাকারীদেরকে মূর্খ, জ্ঞানহীন বা নির্বোধ আখ্যায়িত করে সৃষ্টির (দেব-দেবীদের) পূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

"সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যমি মাশুচঃ" ।। ৮ ঃ ৬৬ ।। (ভগবত গীতা)।

অর্থাৎ- 'সবরকম ধর্মীয় পূজাদি ছেড়ে কেবল আমার স্মরণ গ্রহণ করে আমাকেই অর্চনা কর। আমি তোমাদের সবরকম পাপ থেকে উদ্ধার করব। নিশ্চিত হও শোক করো না।' এরূপ উক্তি কুরআনেও দেখা যায়, যেমন– "তোমরা শুধু আমারই ইবাদত কর, কাউকে শরিক করো না, নিরাশ হইও না আমি উত্তম ক্ষমাকারী" (সূরা আল আনকাবূত ঃ ৫৬, সূরা লুকমান ঃ১ ৩, সূরা আয যুমার ঃ ৫৩)।

আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেই সম্রাট আকবরের শাসন আমলে একজন নওমুসলিম হিন্দু ব্রাহ্মন পণ্ডিত অন্যান্য হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন-"সত্য ব্রাহ্মণ বা সত্য হিন্দু হতে হলে হিন্দু শাস্ত্রে যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে, নতুবা হিন্দু শাস্ত্রের অবমাননা করা হয় এবং তদ্রুপ ক্ষেত্রে হিন্দু বলে অত্মপ্রকাশ করা অন্যায় ও যুক্তিহীন"।

বেদব্যাস বেদগ্রন্থাদি রচনা করে ভগবানের কাছে নিম্নের প্রার্থনা করেছিলেন-

"রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো।
ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্বাচনীয় তাহাখিলন্ড রোর্দুরীকৃতা জন্যায়।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং
ভগবতো যতীর্থ যাত্রাদিনা

www.pathagar.com

ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকল তাদোষত্রয়ং মৎকৃতম" (ভষ্যি পুরাণ- চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

অর্থাৎ 'তুমি রূপ বিবর্জিত, আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করেছি তুমি অখিল গুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তব দ্বারা তোমার সেই অনির্বচনীয়তা দূর করেছি। তুমি সর্বব্যাপী কিন্তু আমি তীর্থ যত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্বব্যাপিত্ব নিরাকৃত করেছি; অতএব হে জগদীশ; তুমি আমার এই বিকলতা দোষত্রয় ক্ষমা কর।' বেদ রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস প্রার্থনায় যেখানে স্রষ্টার রূপ কল্পনা করার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন, সেখানে মূর্তি পূজা কীভাবে স্থান পায়?

মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বাইবেলের উক্তি

মুসা আ. জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে বলেছেন—"তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের মধ্য হতে আমার মত একজন নবী প্রেরণ করবেন। তোমরা তাহার কথা মান্য করবে। প্রভু আরও বলেছেন, আমার কথাই তাঁর মুখ দিয়ে প্রচারিত করব। তিনি শুধু তাই বলবেন, যা আমি বলতে বলব। আমার নামে তিনি যে কথা বলবেন, যা আমি বলতে বলব। আমার নামে তিনি যে কথা বলবেন তা যে না শুনবে তার কাছ থেকে আমি প্রতিশোধ নিব। (তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী-Duet ১৮ অধ্যায় ১৮ঃ১৮, ১৫-১১)।"

তাওরাতের উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে বনি ইসরাইলের ভ্রাতৃসম্প্রদায় বনি ইসমাঈলের মধ্য থেকে এক মহানবীর আবির্ভাবের ইঙ্গিত রয়েছে, যিনি সকল কথা 'প্রভুর' নাম নিয়ে বলবেন এবং প্রভু নিজের কথাগুলো তাঁরই মুখ দিয়ে প্রচার করবেন। প্রভু যা বলতে বলবেন তিনি শুধু তাই বলবেন, এর অতিরিক্ত মনগড়া কোনো কথাই তিনি বলবেন না। তিনি প্রভুর নাম সহযোগে যে কথা বলবেন তা শুনা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ পূর্ববর্তী সকল বিধিবিধান বাতিল হবে এবং তাঁকে গ্রহণ করা সকলের ওপর অবশ্য কর্তব্য বলে নির্ধারিত হবে। যদি কেউ তাকে গ্রহণ না করে বা তার কথা না শুনে তবে প্রভুর আদেশ পালন করেনি বলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।

ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত মুহাম্মদ সা.-ই জগতে একমাত্র ইসমাঈল বংশীয় ধর্ম প্রবর্তক, যার আনীত ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের প্রত্যেক অধ্যায় আল্লাহর (প্রভুর) নাম সহযোগে আরম্ভ হয়েছে। যেমন-"বিসমিল্লাহির

www.pathagar.com

রাহ্‌মানির রাহীম" অর্থাৎ '(শুরু করিতেছি) পবিত্র করুণাময় আল্লাহর নামে'। ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো ধর্মগ্রন্থে এমন কি পবিত্র বাইবেলেও এ ধরনের বিশেষত্ব নেই। শুধু ইসলামের অনুসারীরাই প্রত্যেকটা কাজের শুরুতে 'পবিত্র করুণাময় আল্লাহর নামে' এ কথাটি উচ্চারণ করে থাকে, যা শুধু ইসলামেরই বিশেষত্ব। তবুও খ্রিস্টানজগত সকল প্রকার যুক্তির পাশ কাটিয়ে মোসির ভবিষ্যদ্বাণীর অনাগত চূড়ান্ত নবীকে নিজেদের নবী বলে দাবি করতে কার্পণ্য করেননি। সে কারণেই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিষদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

তাওরাতের উপরোক্ত বাণীতে 'তোমাদের ভ্রাতৃসম্প্রদায়' বলতে বনী ইসরাইলের ভ্রাতৃসম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। আমরা জানি হযরত ইব্রাহীম আ.-এর দুই পুত্র, ইসমাঈল আ. ও ইসহাক আ.। ইসহাক আ.-এর পুত্র ইয়াকুব আ. যার অপর নাম ইসরাইল। অর্থাৎ ইসরাইল সম্প্রদায় বলতে ইসহাক আ.-এর বংশধরকে বুঝায় এবং তাদের 'ভ্রাতৃসম্প্রদায় বলতে ইসমাঈল আ.-এর বংশধরকে বুঝায়। আর এ ইসমাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী একমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-ই হতে পারেন মোসির বর্ণনার প্রতিশ্রুত অনাগত নবী।

খ্রিস্টানগণ ভবিষ্যদ্বাণীটির 'ঠিক আমার মত' অর্থাৎ অনাগত নবী 'ঠিক মুসার মত' এ উক্তির জবাবে যিশুকে মুসার মত বলে দাবি করেন। কারণ মুসা নবী ছিলেন , যিশুও নবী ছিলেন। মুসা ইহুদী ছিলেন, যিশুও ইহুদী ছিলেন। কিন্তু যদি তাই হয় তবে মুসার পরে বাইবেলীয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি-সমূহ–সলমন, আইজাক, ইজকি, ডানিয়েল, হোসা, জোয়েল, মালাচি, জন দি ব্যাপটিস্ট প্রভৃতির বেলাতেও এটা প্রযোজ্য হয়। কারণ তাঁরা সবাই ইসরাইল সপ্রদায়ের নবী ছিলেন এবং তাঁরা ইহুদীও ছিলেন। এখান থেকে বুঝা যায় শুধু ওই দুটি বিষয়ই 'ঠিক মুসার মত' হওয়ার মানদণ্ড নয়। কাজেই 'ঠিক মুসার মত' এটা বিচারের মানদণ্ড নিরূপণের জন্য মুসা আ.-এর সার্বিক দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন–

(১) মুসা ঈশ্বর ছিলেন না, কিন্তু খ্রিস্টানদের মতে যিশু ঈশ্বর ছিলেন। সুতরাং যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(২) মুসা পৃথিবীর পাপের দরুন মৃত্যুবরণ করেন নাই, কিন্তু খ্রিস্টানদের মতে যিশু পৃথিবীর পাপের দরুন মৃত্যু বরণ করেন। অতএব যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(৩) খ্রিস্টানদের মতে যিশু তিন দিনের জন্য নরকে গিয়েছিলেন। কিন্তু মুসাকে সেখানে যেতে হয় নাই। কাজেই যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

www.pathagar.com

(৪) মুসা পুনরুজ্জীবিত হন নাই, কিন্তু খ্রিস্টানদের দাবি অনুযায়ী যিশু পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন। সুতরাং যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(৫) মৃত্যুর পর দুনিয়াতেই মুসার দাফন-কাফন হয়েছিল, কিন্তু যিশু সশরীরে আসমানে গমন করেন। সুতরাং যিশু মুসার মত নয় কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(৬) নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনে মুসার স্বাভাবিক জন্ম হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ এক অলৌকিকতায় যিশুর জন্ম হয়েছিল। কাজেই যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(৭) মুসার একজন মাতা এবং একজন পিতা ছিলেন, কিন্তু যিশুর শুধুমাত্র একজন মাতা ছিলেন। সুতরাং যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(৮) মুসা বিয়ে করেন এবং সন্তান জন্ম দেন, কিন্তু যিশু চিরকুমার ছিলেন। অতএব যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(৯) মুসা শাসক ছিলেন, কিন্তু যিশু শাসক ছিলেন না। সুতরাং যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(১০) মুসা সীমাহীন কষ্ট ভোগের পর নিজেদের লোকদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিলেন, কিন্তু যিশু বাইবেলের মতে, "তিনি (যিশু) তাঁর নিজের (লোকদের) কাছে এলেন, কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করলেন না (যোহন-১ঃ১১)।" অতএব যিশু মুসার মত নয় কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(১১) মুসা নতুন বিধান এনেছিলেন, কিন্তু যিশু 'মথি- ৫ঃ১৭ নম্বর উক্তি' অনুযায়ী ইহুদীদের পুরাতন বিধিবিধান সংশোধন করতে এসেছিলেন। সুতরাং যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(১২) মুসার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু খ্রিস্টানদের মতে যিশুকে নৃশংসভাবে ক্রুশে হত্যা করা হয়েছিল। সুতরাং যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(১৩) মুসা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু যিশু তা করেন নাই। অতএব যিশু মুসার মত নয়, বরং মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(১৪) মুসা পূর্ণ শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু যিশু তা করতে পারেন নাই। অতএব যিশু মুসার মত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ সা. মুসার মত।।

(১৫) মুসা ক্রমান্বয়ে কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু যিশুর সীনায় একসাথে সম্পূর্ণ কিতাব গেঁথে দেয়া হয়। সুতরাং যিশু মুসার মত নয় কিন্তু

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সা. মুসার মত।। এতক্ষণ আর কোনো পাঠকের বুঝতে বাঁকি থাকার কথা নয় যে, কে মুসার মত।

"আমার প্রভু যে কথা বলতে আজ্ঞা করেন নাই, প্রভুর নামে যে কোনো ভাববাদী (ধর্মপ্রচারক) দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে কিংবা দেবতাদের নামে কেহ কথা বলে সেই ভাববাদীকে মারতে হবে" (দ্বিতীয় বিবরণঃ ১৭ঃ১৮-২০)।

দেখা যায় ঠিক অনুরূপ কথা কুরআনেও বলা হয়েছে- "রাসুল সা. যদি কোনো একটি কথাও নিজের থেকে বলতেন তাহলে আমি তাঁর ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম" (সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৪৪ ও ৪৬)।

বাইবেলের উপরোক্ত বাক্যে মুসা আ. বলেছেন, 'যে ভাববাদী বা ধর্মপ্রচারক প্রভুর নাম নিয়ে মিথ্যা বলবে অথবা দেবতাদের নাম নিয়ে কথা বলবে প্রভু সয়ং তাকে বিনষ্ট করবেন'।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত মুহাম্মদ সা. ধর্মের প্রত্যেকটি কথা সর্বদা প্রভুর (আল্লাহর) নাম নিয়ে বলেছেন, অথচ প্রভু তাঁকে বিনষ্ট বা ধ্বংস করেন নাই। এতে প্রমাণ হয় তিনি 'প্রভুর নাম' নিয়ে মিথ্যা বলেননি। এমনকি তাঁকে ধ্বংস করার জন্য সমস্ত আরববাসী, ইহুদী সম্প্রদায় এবং মহাপরাক্রান্ত পারস্য ও খ্রিস্টান রোমক রাজ্যের মিলিত প্রচেষ্টাকেও সদাপ্রভু চরমভাবে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুত নবী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন। সুতরাং মোসির বর্ণনায় প্রতিশ্রুত শেষ নবী অবশ্যই যিশুখ্রিস্ট হতে পারেন না বলে চিন্তাবিদগণ মনে করেন। তাঁরা বলেন, মোসির বর্ণনায় প্রতিশ্রুত সেই চূড়ান্ত নবী হতে পারেন একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সা., যিনি বনী ইসরাইলের ভ্রাতৃ-সম্প্রদায় থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ওল্ড টেস্টামেন্টের 'ইসাইয়াহ' অধ্যায়ের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি মূল হিব্রু থেকে ইংরেজি অনুবাদ।

"He saw two riders, one of them was a rider upon an ass and the other a rider upon a camel he neark need deligentley with much need, (Isaian- 1:7)"

"তিনি (ইসাইয়াহ) দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন, দু'জন আরোহী, একজন গাধায়, অপরজন উটের উপর সওয়ার ---"। কিন্তু ইংরেজি বাইবেলে লিখা হয়েছে-"তিনি দেখলেন গাধায় টানাগাড়ী এবং উটে টানাগাড়ী ---।" প্রাচীন ল্যাটিন অনুবাদে বর্ণিত হয়েছে-"তিনি দু'জন অশ্বারোহী টানাগাড়ী, একজন গাধার উপর সওয়ারী এবং একজন উষ্ট্রারোহী-----।"

www.pathagar.com

অনুবাদে যেভাবেই গড়বড় হোকনা কেন, আমরা যৌক্তিকভাবেই ধরে নিতে পারি, দু'জন আরোহী দ্বারা ইসাইয়াহ নবীর পর দু'জন পয়গম্বরকেই বুঝানো হয়েছে। পরবর্তীতে তা সত্যে পরিণত হয়েছিল এইভাবে–ঈসা আ. গাধায় চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন। ঈসা আ. জেরুজালেমে প্রবেশের ব্যাপারে বাংলা ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে-"পাক কিতাবের কথা মত ঈসা একটা গাধা দেখতে পেয়ে তার উপর বসেছিলেন। কিতাবে লিখা আছে হে সিয়োন-কন্যা ভয় করিও না। দেখ তোমার রাজা গাধার বাচ্চার উপর চড়ে আসছেন" (যোহন-১২ঃ১৪-১৫)।

আবার ইতিহাস এ কথাও সাক্ষ্য দেয়–মুহাম্মদ সা. উটে আরোহণ করে মদিনায় প্রবেশ (হিজরত) করেছিলেন এবং তখন উটই ছিল আরবের প্রধান বাহন। এইভাবে ওল্ড টেস্টামেন্টের উদ্ধৃতিটি বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের 'সলমন' অধ্যায়ের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি মূল হিব্রু থেকে ইংরেজী অনুবাদ।

His mouth is most sweet; yea he is Mohammad altogether lovely. This is my beloved and this is my friend. O daughter of Jerusalam (Song of solomon 5:16). মূল হিব্রু বাইবেলে বাদশা সোলাইমান আ. (সলোমন) অনাগত সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের নাম সুস্পষ্টই উল্লেখ করেছেন 'মহামাদিম' বলে। কিন্তু ইংরেজি বাইবেলে 'মহামাদিম' শব্দটিকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে উল্লিখিত চরণটি হয়েছে– He is altogether lovely. যার অর্থ-'তিনি সার্বিক সুন্দর মানব, অর্থাৎ পরিপূর্ণ আদর্শ মানব। ইতিহাস ও কুরআন-হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন জাগতিক যাবতীয় অপূর্ণতা ও ভুলত্রুটির উর্ধ্বে একজন অভূতপূর্ব সার্বিক সুন্দর মহামানব।

বিখ্যাত অমুসলিম লেখক মাইকেল এইচ হার্ট তাঁর 'দি হান্ড্রেড' গ্রন্থে মুহাম্মদ সা.-কে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং বিকৃতির মাধ্যমে ইংরেজি বাইবেল থেকে মুহাম্মদ সা.-এর নাম বাদ দেয়া হলেও 'সার্বিক সুন্দর' বিশেষণটি সারা বিশ্বের মধ্যে একমাত্র তাঁরই জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।

উপরোক্ত উক্তির মূল হিব্রু চরণটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো, যার চতুর্থ শব্দটিই 'মহামাদিম'।

`Hikko Mamittadim vikullo 'Mohamadim' Zehudi vazen raai benute yapus Halam."

www.pathagar.com

"হিক্কো মামিটাদিম ভিকুল্লু 'মাহামাদিম' জেহ্দুদি ভেজেন রাই বেনউত ইয়াপুস হালাম।"

ওল্ড টেস্টামেন্টে অনাগত নবী সম্পর্কে মোসির ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নামই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তবুও এরপর আমরা দেখব মোসির বাণীর পাশাপাশি যিশু কি বলেছেন?

খ্রিস্টধর্মে পরাক্লতস

ইহুদীদের হাতে যিশু গ্রেফতার হওয়ার আগে এবং লাস্ট সাপারের শেষ পর্যায়ে যিশুখ্রিস্ট একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। এ ভাষণে তাঁর যে নির্দেশ ও বিধান এবং তাঁর তিরোধানের পর কোন্ পথনির্দেশককে অনুসরণ করতে হবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রীক বাইবেলে সেই পথনির্দেশককে 'পরাক্লীতস' বলা হয়েছে, যার বাংলা অর্থ-সহায়, সাহায্যকারী, সান্তনাদাতা বা শান্তিদাতা। বর্তমান প্রচলিত বাইবেলগুলোতে যোহন লিখিত সুসমাচারের 'পরাক্লীতস' শব্দটি বাদ দিয়ে "Holy Gost, Holy Spirit বা Spirit of truth" অর্থাৎ- 'পবিত্র আত্মা, পাক রুহু বা সত্যের আত্মা' এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

আত্মা সম্পর্কে ট্রাইকট তাঁর রচিত 'লিটল ডিকসনারী অব দি নিউ টেস্টামেন্ট' গ্রন্থে লিখেছেন-এ আত্মা যিশুর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং যিশুর বিকল্প হিসেবেই তিনি কাজ করে যাবেন। এ আত্মাকে ক্ষমতাধর পক্ষ সমর্থক অশরীরী আত্মা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যোহনের সুসমাচারে যিশু স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, "যদি তোমরা আমাকে মহব্বত কর, তবে তোমরা আমার সমস্ত হুকুম পালন করবে। আমি পিতার নিকট চাইব, আর তিনি তোমাদের নিকট চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন পরাক্লীতস বা সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দিবেন" (যোহনঃ ১৪ঃ১৫-১৬)।

যিশুর ওই বক্তব্যে মূল গ্রীক ভাষায় 'পরাক্লীতসের' সাথে 'এ্যাকুয়ো' এবং 'লালিও' এ দুটি ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়, যার অর্থ 'বাকশক্তি' ও 'শ্রবণশক্তি'। অর্থাৎ যে উচ্চারণ ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বলে ও শোনে। সুতরাং এ শব্দ দুটি কেবল জীবন্ত মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু কোনো অশরীরী পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব নয়। উল্লিখিত চরণটি দ্বারা বুঝা যায়, যুগে যুগে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সকল নবীগণই মানুষের জন্য সাহায্যকারী

www.pathagar.com

(পরাক্লীতস) হিসেবে দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং আরও একজন সাহায্যকারী বা নবী পাঠানোর জন্য যিশু ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করবেন, যিনি মানুষের মাঝে চিরকাল থাকার জন্য আসবেন। অর্থাৎ তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ দুনিয়াতে সর্বকালের জন্য শেষ সহায় বা সাহায্যকারী হিসেবে বলবৎ থাকবে। সে কারণে মুসলমানদের দাবি হচ্ছে আল-কুরআনই সর্বশেষ এবং চিরকাল বলবৎ থাকার মত সর্বযুগের যুগোপযুগী ঐশীগ্রন্থ।

বিভিন্ন বাইবেলে গ্রীক 'পরাক্লীতস' শব্দটিকে সহায়, সাহায্যকারী, সান্ত্বনাদাতা, জগতের শান্তিদাতা, সত্যের আত্মা, পবিত্র-আত্মা বা পাক রূহ, যেভাবেই উপস্থাপন করা হোক না কেন আল্লাহ বিশ্বনবীর মর্যাদাকে এতটুকু ক্ষুন্ন হতে দেননি। শেষ নবী সা. পূর্ববর্তী নবীগণের সহায়ক হিসেবে কাজ করে আল্লাহর বিধানের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত পূর্ণতা দিয়েছেন। কাজেই তিনিই হতে পারেন শেষ 'সহায়' বা চূড়ান্ত নবী। কুরআনের ভাষায় তিনি 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বা 'জগতের জন্য রহমতস্বরূপ' বা 'তিনিই জগতের শান্তিদাতা'। প্রতিটি নবীর মত হযরত মুহাম্মদ সা.-ও ছিলেন নিষ্পাপ এবং পবিত্র, কাজেই তিনিই হতে পারেন 'পবিত্র আত্মা' বা পাক-রূহ'। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ঐতিহাসিক উপাধি ছিল 'আল-আমিন' বা সত্যবাদী। সুতরাং তাঁরই আত্মা হতে পারে জগতের একমাত্র 'সত্যের আত্মা'।

"সেই সাহায্যকারী অর্থাৎ পবিত্র আত্মা যাকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দিবেন, তিনিই সমস্ত বিষয় তোমাদের শিক্ষা দিবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সে সমস্ত তোমাদের মনে করিয়ে দিবেন" (যোহন-১৪ঃ২৬)। ঠিক এ উক্তির সমর্থনসূচক উক্তি আল কুরআনেও দেখা যায়–"ওহে কিতাবধারীরা (বনী ইসরাইল), নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার রাসূল (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে প্রতিশ্রুত নবী) আগমন করেছেন। তোমরা কিতাবের (তৌরাত-যবুর-ইঞ্জিল) যেসব অংশ গোপন করেছ তা থেকে অনেক কিছুই তিনি বর্ণনা করেছেন"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১৫।

বাইবেলের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায়, ঈসা আ.-এর নিবেদনে ঈশ্বর যে পবিত্র আত্মাকে পাঠাবেন তিনি সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবেন এবং খ্রিস্টধর্মের ভুলে যাওয়া বা লুকিয়ে ফেলা বিষয়গুলো মনে করে বা প্রকাশ করে দিবেন। এ উক্তিটি শুধুমাত্র শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ওপরই প্রযোজ্য হয়। কারণ তিনি বলেছেন, "আমাকে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে" (মেশকাত ৩৬)। খ্রিস্টধর্মের লুকিয়ে ফেলা বা ভুলে যাওয়া অনেক উক্তি কুরআনে ব্যক্ত হয়ে বাইবেলের উপরোক্ত উক্তিটির সত্যতা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- বাইবেলের ভুলে যাওয়া

www.pathagar.com

বাণী কুরআনে স্মরণ করে দিচ্ছে এভাবে-"স্মরণ কর, মরিয়ম-পুত্র ঈসা বলেছিল, হে বনী ইসরাইল আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত আল্লাহর রাসূল, পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সমর্থক এবং পরবর্তী আগমনকারী আহমদ নামক রাসূলের সু-সংবাদদাতা----" (সূরা আস সফ ঃ ৬)। "হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন করছ ? অথচ তোমরা সবই জ্ঞাত" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭১)। বাইবেলের যোহন-১৪ঃ২৬ পদে কুরআনের এ উক্তিগুলোর সত্যতা প্রামাণ করে।

"যে সাহায্যকারীকে (পরাক্লীতস) আমি পিতার নিকট হতে তোমাদের নিকটে পাঠিয়ে দিব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। ইনি সত্যের রূহ যিনি পিতা হতে বের হন" (যোহন- ১৫ ঃ ২৬)।

বাইবেলের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায়, একটা অশরীরী আত্মার পক্ষে কারো বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া সম্ভব নয়, কারণ সাক্ষ্য দেয়া একটা প্রকাশ্য কাজ। একমাত্র মুহাম্মদ সা.-ই তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের মাধ্যমে ঈসা আ. সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে চরম মর্যাদাপূর্ণ সত্য সাক্ষ্য দিয়ে মহিমান্বিত করেছেন। যেমন-"স্মরণ কর সে নারীর কথা, যে রক্ষা করেছে নিজ সতীত্ব, পরে তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকি, আর তাকে, তার পুত্রকে জগদ্বাসীর জন্য করি এক নিদর্শন"(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯১)। ঐতিহাসিক সত্য যে মুহাম্মদ সা. জীবনে একটি মিথ্যা কথাও বলেননি এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে এসেছিলেন তাই একমাত্র তিনিই হতে পারেন বাইবেলে বর্ণিত সেই 'সত্যের রূহ'।

"তবুও আমি তোমাদের সত্য কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দিব। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার সম্বন্ধে এবং খোদার বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দিবেন" (যোহন-১৬ঃ৭-৮)।

যিশুখ্রিস্ট উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে—"তিনি পাপের সম্বন্ধে চেতনা দিবেন, কারণ লোকেরা আমার ওপর ঈমান আনে না। নির্দোষিতা সম্বন্ধে চেতনা দিবেন, কারণ আমি পিতার নিকটে যাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দিবেন, কারণ দুনিয়ার কর্তার বিচার হয়ে গিয়েছে" (যোহন-১৬ঃ৯-১১)।

উপরোক্ত বক্তব্যে যিশু নিজেই বলেছেন, 'মানুষেরা আমার ওপর ঈমান আনে না' এখানে বুঝা যায় অনাগত সাহায্যকারীর (নবীর) ওপর দুনিয়ার

www.pathagar.com

মানুষেরা ঈমান আনবে এবং তিনি সে মানুষগুলোকে পাপের সম্বন্ধে সতর্ক করবেন বলে ইঙ্গিত রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অসংখ্য লোক মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তিনি তাদেরকে পাপ-পুণ্যের সঠিক জ্ঞান দান করেছিলেন।

আবার 'ঈসা আ. যখন দুনিয়া ছেড়ে ঈশ্বরের কাছে যাবেন তখন সেই সাহায্যকারী পাপমুক্ত থাকার (নির্দোষিতার) ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন' যা একমাত্র মুহাম্মদ সা.-এর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। এছাড়া তাঁর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআন পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে যে, পরকালে আল্লাহ কিভাবে মানুষের কৃতকর্মের ফল বিচারসাপেক্ষে নির্দিষ্ট করে রেখে দিয়েছেন। অর্থাৎ কোন্ পাপের কি শাস্তি আল্লাহ তা ঠিক করে রেখেছেন এবং কুরআনের মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন। এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সে অনাগত সাহায্যকারী মুহাম্মদ সা. ছাড়া আর কেউ নয়।

"তোমাদের নিকট আরও অনেক কথা আমার বলবার আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেগুলো সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু সে সত্যের রূহ যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণসত্যে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজ হতে কোনো কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু শুনেন তা'ই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন। (যোহন ১৬ঃ১২-১৪)।

বাইবেলের উপরোক্ত উক্তিতে ঈসা আ. পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে সহ্য করতে পারবে না বলে তাঁর অনুসারীদেরকে সব কথা বলতে পারেন নাই। কিন্তু যখন সেই 'সহায়, পবিত্র আত্মা বা পরাক্লীতস' আসবেন তখন দুনিয়ার মানুষগুলোকে তিনি সরল-সঠিক, সত্য (হেদায়াতের) পথের সন্ধান দিবেন বা সে পথে নিয়ে যাবেন এবং তিনি এ সম্পর্কে যা কিছু বলবেন সবই সত্য কথা বলবেন। কারণ তিনি নিজের মতলবসিদ্ধ কোন কথাই বলেন না। যা কিছু আল্লাহ তাঁকে বলতে বলেন তিনি শুধু তাই বলেন। এ ধরনের কথা আমরা কুরআনেও দেখতে পাই– "তিনি (নবী) তাঁর খেয়াল খুশীমত কোনো কথা বলেন না। তিনি তা'ই বলেন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়" (সূরা আন নাজম ঃ ৩-৪)।

আবার 'তিনি নিজ হতে কোনো কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু শুনেন তাই বলবেন' এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়, সেই 'সহায় বা সত্যের রূহ' কোনো অশরীরী বা বিদেহী আত্মা নয়। কারণ শুনা ও বলার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় ও বাকশক্তির প্রয়োজন যা কোনো অশরীরী আত্মার পক্ষে প্রযোজ্য হয় না,

www.pathagar.com

বরং তা কেবল শরীরী আত্মার পক্ষেই সম্ভব হতে পারে। অশরীরী আত্মা কেবল মানুষের মনে ভাবের উদয় ঘটাতে পারে।

'আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন'। অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের কথা বলবেন। এ ক্ষেত্রেও অশরীরী আত্মা প্রযোজ্য হয় না বরং শরীরী আত্মার ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হয়। আমরা জানি হযরত মুহাম্মদ সা. জীবনের বহু অকাট্য-সত্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা হাদীস কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

'তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন' এক্ষেত্রেও বিদেহী আত্মা অকার্যকর। কারণ মহিমান্বিত করা একটি প্রকাশ্য কাজ যা শুধু শরীরী আত্মাই করতে পারে।

স্বয়ং খ্রিষ্টধর্মেই কুমারী মাতার গর্ভস্থ সন্তান যিশুখ্রিষ্টের পিতার দিক থেকে বংশ পরিচয় দিয়ে অবৈধতার ইঙ্গিত করে তাঁকে চরম অপমান-অপদস্ত করেছেন। তাদের মাঝে কথিত অশরীরী আত্মা থাকা সত্ত্বেও তারা যিশুকে মহিমান্বিত করতে পারেননি। পারেননি তাঁকে আর তাঁর মাকে অপবাদমুক্ত করতে বরং করেছেন অপবাদযুক্ত। আবার দেখা যায় ইহুদীরাও তাঁকে প্রকাশ্যভাবে জারজ বলে অপমানিত করছেন। একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সা.-ই তাঁর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে চরম মর্যাদাপূর্ণ সত্য সাক্ষ্য দিয়ে যিশুর মাতাকে অপবাদমুক্ত এবং যিশুকে তাঁর আসল পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে মহিমান্বিত করেছেন, যা পূর্বেই সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। মোট কথা বাইবেলের এই উক্তিটির সবদিক বিবেচনায় এনে বিচার করলে দেখা যায় সেই 'সত্যের রূহ' হযরত মুহাম্মদ সা. ছাড়া আর কেহ নয়। কারণ ভষ্যিদ্বাণীর সমর্থনে ভাবী আগমনকারী বা পয়গম্বরের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা একমাত্র মুহাম্মদ সা.-এর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে রূপায়িত হয়েছে।

বার্নাবাসের বাইবেলে আল্লাহর রাসূল সা.

ঐতিহাসিকদের মতে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নিসিয়া সম্মেলনে বাতিলকৃত বার্নাবাসের বাইবেল ওই সময় পর্যন্ত এন্টিওক ও আলেকজান্দ্রিয়ার গীর্জাসমূহে প্রামাণ্য বাইবেল হিসেবে চালু ছিল। খ্রিস্টান জগতে বাতিল বলে গণ্য বার্নাবাসের উক্ত বাইবেলের একটি কপি ৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পোপ বাজেয়াপ্ত করে তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে গোপন রাখেন। ১৫৬৫ সালে পোপ

www.pathagar.com

সিক্সট্স-নাইন (Sixtos-IX)-এর সময় তাঁর বন্ধু ফ্রা মারিনো এটির খোঁজ পান। তিনি তার মাতৃভাষা ইটালিয়ান-এ তা অনুবাদ করেন। বর্তমানে ইটালিয়ান পাণ্ডুলিপিটি ভিয়েনার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। ১৯০৭ সালে অক্সফোর্ডের লন্সডেল ও লোরা র‍্যাগ নামক দুই পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে অক্সফোর্ডের ক্লারেনডন প্রেস থেকে এটি ছাপা হয়। খ্রিস্টান জগতের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও বর্তমানে বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে বার্নাবাসের এ বাইবেলটি পৃথিবীর বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। বার্নাবাসের এ বাইবেলটিতে হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বহু ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

ঈসা বললেন, "---- আল্লাহর প্রেরিত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর সান্ধ্যবুলিতে ভাববাণী প্রচার করেছেন। একমাত্র আমার পরে নবী ও আউলিয়াদের মুকুটমণি রূপে যিনি আসবেন তিনিই নবীদের যাবতীয় ভাববাণীর ওপর আলোকসম্পাত করবেন, যেহেতু তিনি হবেন আল্লাহর রসূল"।। ১৭।।

বার্নাবাসের বাইবেলে উপরোক্ত বাণীতে ঈসা আ. অনাগত নবীর আগমনের ইঙ্গিতের সাথে এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, দুনিয়ার সমস্ত নবীগণ সংক্ষিপ্ত বিধান (শরীয়ত) প্রচার করেছেন কিন্তু অনাগত নবী পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণের যাবতীয় বিধানের ওপর বিশদ আলোকপাত করবেন। অর্থাৎ অনাগত নবী-প্রবর্তিত বিধানে পূর্ববর্তী নবীদের বিধানের সন্নিবেশ ঘটবে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "আল কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচনা নহে, পক্ষান্তরে এটা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক এবং এতে কোন সন্দেহ নেই, এটা জগতসমূহের রবের বিধানের বিশদ ব্যাখ্যা" (সূরা ইউনুস ঃ ৩৭)। বাস্তবেও হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রবর্তিত বিধানে পূর্ববর্তী বিশিষ্ট নবীদের বিধানের সন্নিবেশ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সা.-ই হতে পারেন অনাগত সেই নবী।

"ঈসা তখন বললেন, ------ সকল নবীরই আবির্ভাব হয়েছে দুনিয়ায়, শুধু আল্লাহর রাসুলের আগমন এখনও বাকি যিনি আবির্ভূত হবেন আমার পর, আল্লাহ চেয়েছেন যে, আমি যেন তাঁর পথ প্রস্তুত করি"।।৩৬।। উল্লিখিত বাণীতে 'যিনি আবির্ভূত হবেন আমার পর' এ কথার দ্বারা ঈসা আ. তাঁর পরের আগমনকারী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর দিকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন।

"আদম নিজে পায়ের ওপর খাড়া হয়েই দেখলেন বায়ুমণ্ডলে সূর্যের মত দেদীপ্যমান একটি বচন, 'আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর

www.pathagar.com

রাসূল।' ------ হে আমার মাবুদ আল্লাহ! ------ এ কথাগুলোর তাৎপর্য কি যে, ------ তবে কি আমার আগে আর কোনো মানবের জন্ম হয়েছে? আল্লাহ বললেন, ------ যাঁর নাম তুমি দৃশ্যমান দেখলে সে তোমার সন্তান, যাঁর আবির্ভাব হবে মর্তলোকে এখন থেকে বহুযুগ পর আমার রাসূল রূপে। যাঁর উপলক্ষে এ জগত সৃষ্টি, তাঁর আগমন জগতকে আলোকিত করবে, তাঁর আত্মাকে ঐশী গরিমায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছে প্রথম সৃষ্টির ঊষালগ্ন হতে ষাট হাজার বছর পূর্বে"।।৩৯।।

বার্নাবাসের বাইবেলের উল্লিখিত উক্তিটি একমাত্র মুহাম্মদ সা.-এর জন্যই প্রযোজ্য যা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

"কেননা আল্লাহর রাসূল যাঁকে আপনারা মসীহ্ (ত্রাণকর্তা) বলছেন, আমি তাঁর মোজার বাঁধন বা জুতার ফিতা খোলার যোগ্যতাও রাখি না। তাঁর সৃষ্টি আমার সৃজনের পূর্বে এবং আবির্ভাব আমার পরে। তিনি সত্যের বাণীসহ আবির্ভূত হবেন, যেন তাঁর ধর্মের বিলয় কখনো আর না হয়"।।৪২।।

"অতঃপর ঈসা বললেন, 'তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছো, কেননা রূহানী পর্যায়ে দাউদ তাঁকে (রাসূল সা.) 'হুজুর' সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ আমার 'হুজুরকে' বললেন -----। যদি আল্লাহর রাসূল যাঁকে তোমরা মসীহ্ (ত্রাণকর্তা) বলছ, তিনি দাউদের সন্তানই হতেন তবে কী করে দাউদ তাঁকে 'হুজুর' বলে বর্ণনা করলেন? বিশ্বাস করো, কেননা অবশ্যই আমি তোমাদের বলছি যে, আল্লাহর ওয়াদা ইসমাঈলের জন্যই নির্দিষ্ট, ইসহাকের জন্য নয়"।।৪৩।।

(ঈসা) বললাম, 'হে মুহাম্মদ! আল্লাহ আপনার প্রতি রাজি থাকুন আর আমাকে আপনার জুতার ফিতা বাঁধার যোগ্যতা দান করুন"।।৪৪।।

"রাব্বি (বার্নাবাস) বললেন, 'মুসার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের মাবুদ অবশ্যই শান্তিদূত প্রেরণ করবেন, --- বলুন, আপনিই কি সেই বহুল প্রত্যাশিত আল্লাহ-প্রেরিত শান্তিদূত'? ঈসা জবাব দিলেন, আল্লাহর এ ওয়াদা সত্যই বটে। কিন্তু আমি সেই 'তিনি' নই, তাঁর সৃষ্টি আমার পূর্বে, তাঁর আগমন আমার পরে। রাব্বি বললেন, '----- কি প্রক্রিয়ায় জগতে শান্তিকর্তার আবির্ভাব ঘটবে'? ঈসা উত্তরে বললেন, "----- ইব্রাহীমের প্রতি উচ্চারিত হয়েছিল পবিত্র ওয়াদা এ মর্মে যে, তোমার বংশেই দান করা হবে জগতবাসীর জন্য রহমত"।।৯৬।।

www.pathagar.com

"ঈসা তখন বললেন, '----- আমার ভরসা রাসূলের আগমনের ওপর, যিনি আমার সম্পর্কিত সব মিথ্যাচার রদ করবেন, আর তাঁর দ্বীন প্রসারিত হবে এবং গোটা দুনিয়াই তাতে দীক্ষিত হবে, কারণ এ হলো আমাদের পিতা ইব্রাহীমের প্রতি উচ্চারিত আল্লাহর ওয়াদা। আর যা আমাকে তৃপ্ত করছে তা হলো এই যে, তাঁর প্রচারিত দ্বীন কখনও লুপ্ত হবে না বরং আল্লাহ হবেন এর সংরক্ষক।' ------ শান্তিদূতের নাম ও চিহ্ন কি হবে? ------- ঈসা বললেন, 'শান্তিদূতের নাম হবে প্রশংসিত; কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাঁর আত্মার এ নামকরণ সৃষ্টির আদিলগ্নেই করেছেন, আর তাঁকে স্বর্গীয় জৌলুশে সংরক্ষণ করেছেন------ 'মুহাম্মদ"।।৯৭।।

বার্নাবাসের উল্লিখিত বাণীগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ এ সুস্পষ্ট বাণীগুলো বুঝার জন্য অতি জ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনি আরও বহু বাণী উক্ত বাইবেলে উদ্ধৃত হয়েছে, যেখানে হযরত মুহাম্মদ সা.-কে শান্তিদূত, শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, ও ত্রাণকর্তা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। শুধু একঘেঁয়েমী কাটাতে এবং লিখার পরিসর কমাতে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

বাইবেলের এ সমস্ত স্পষ্ট উক্তি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "হে কিতাবীগণ, তোমাদের নিকট আমার রাসূল আগমন করেছে, সে কিতাব হতে তোমাদের গোপন করা অনেক বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে আবার অনেক বিষয় উপেক্ষাও করে; আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট এসেছে জ্যোতি এবং স্পষ্ট কিতাব"(সূরা আল মায়েদা ঃ ১৫)। "ইসরাইলি আলেমগণ এটা (কুরআন ও রাসূল) সম্পর্কে অবগত আছে, এটা কি ওদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন নয়?" (সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১৯৭)। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর, এবং সত্য গোপন করছ ? অথচ তোমরা সবই জান" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭১)। অতএব আপনার বিশ্বাসের বিষয়টিকে আবারও একবার পরোখ করে দেখে নিতে পারেন।

বিভিন্ন ধর্মে শেষ অবতরণকারীর নাম পাওয়া যায়, মুহাম্মদ, মহামদ, মহামত, মেহোমেট, পরাক্লিতস, মোহামেড, মামহ্, মৈত্রেয় ইত্যাদি। বিভিন্ন ভাষায় এ শব্দগুলো একই অর্থবোধক 'প্রশংসিত'। কাজেই সেই প্রশংসিত ব্যক্তিটিই হতে পারেন শেষ অবতরণকারী মুহাম্মদ সা.।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে ইসলামের নবী সম্পর্কে জানার পর তাঁর প্রবর্তিত গ্রন্থ আল কুরআনের সত্যতা উপলব্ধির জন্য সর্বপ্রথম তা সংরক্ষণের সঠিক ঐতিহাসিক ভিত্তি জানা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস থেকে জানা যায় আল-কুরআন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার মোকাবিলায় প্রয়োজন মত অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। "আমি কুরআন নাযিল করেছি অল্প অল্প করে" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৬। প্রথম অবস্থায় রাসূল সা. ওহীর শব্দগুলো আয়ত্ত করার জন্য ওহী নাযিলের সাথে সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, "হে নবী ত্বরিত আয়ত্ত করার জন্য দ্রুত পাঠ করবেন না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই"-(সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ১৬-১৭)।

এ আয়াতে আল্লাহ নিজে ওহী সংরক্ষণ ও ত্বরিত আয়ত্ত করানোর দায়িত্ব নেয়ায় ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা রাসূল সা.-এর অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যেত এবং তিনি আর কোনোদিন তা ভুলতেন না। এভাবে রাসূল সা.-এর পবিত্র সিনা কুরআন সংরক্ষণের এক সুরক্ষিত ভাণ্ডারে পরিণত হওয়ায় তার মধ্যে আর কোনো যোগ-বিয়োগ বা ভুল-ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এছাড়া অল্প অল্প করে কুরআন নাযিল হওয়ায় নবুয়ত যুগে তা পূর্ণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি বরং খণ্ড খণ্ডভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তাই প্রথম প্রথম কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে হেফ্য বা কণ্ঠস্থ করার প্রতিই জোর দেয়া হয়েছিল।

সীমাহীন আগ্রহ এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে খুব অল্প দিনেই সাহাবীগণের মধ্যে একদল হাফেযে কুরআন তৈরি হয়েছিলেন। এ জামাতের মধ্যে চার খলিফাসহ হযরত তালহা, সা'দ ইবনে মাসউদ, হোযাইফা ইবনে ইয়ামান, সালেম, আবু হোরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব, যায়েদ ইবনে সাবেত (রাদিআল্লাহু আনহুম) এবং হযরত আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহু আনহুমা)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাথমিক অবস্থায় লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা কম থাকায় কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হেফ্য-এর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। রাসূল সা. কুরআন হেফ্য করানোর পাশাপাশি লেখাপড়া জানা বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীকে কুরআন লিপিবদ্ধ করে রাখার কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন। লিপিকারদের মধ্যে চার খলিফাসহ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, উবাই ইবনে কা'ব, যুবাইর ইবনে আওয়াম, মুয়াবিয়া, মুগীরা ইবনে শো'বা, খালেদ ইবনে ওলীদ, সাবেত ইবনে কায়েস, আব্বাস ইবনে সায়ীদ রা.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সে যুগে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ছিল বলে লিপিকারগণ

www.pathagar.com

পাথর, শুকনা চামড়া, খেজুর শাখা, বাঁশের টুকরো, গাছের পাতা এবং পশুর হাড় ব্যবহার করতেন। কোনো কোনো সময় কেউ কেউ কাগজের টুকরো ব্যবহার করেছেন বলেও জানা যায়। এমন একটি পাণ্ডুলিপি রাসূল সা. বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন নাযিলের শুরু থেকেই যে তা লিখা শুরু হয়েছিল হিজরতের পূর্বে নাযিল হওয়া নিম্নের কয়েকটি আয়াত থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"তারা বলে, এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল সন্ধা তাঁর নিকট পাঠ করা হয়" (সূরা আল ফুরকান ঃ ৫)। এ আয়াতে রাসূল সা.-এর শত্রুরা তাঁকে মিথ্যা নবী (!) বলে অভিযোগ করার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। তারা এ বলে গুজব ছড়াতো যে, তাঁর কাছে প্রাচীন উপকথা বর্ণনা করা হয়ে থাকে এবং তিনি তা 'লিখিয়ে' নেন। সুতরাং এখানে শত্রুদের কথার দ্বারাই প্রমাণ হয়, শুরু থেকেই কোরআনের লিখিত দলীল প্রস্তুত করা হতো।

"নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত গ্রন্থে, যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করবে না। এটা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ" (সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৭৭-৮০)। এখানেও লিখিত গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"এ প্রকার আচরণ অনুচিত; এটা উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে, সেটা আছে মহান-উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র গ্রন্থে মহান-পূতচরিত্র লেখক হস্তে লিখিত" (সূরা আল আবাসা ঃ ১১-১৬)। এখানেও লেখক হস্তে লিখিত কুরআনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

"বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ" (সূরা আল বুরুজ ঃ ২১-২২)। এখানেও লিখিত কুরআনের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার হিজরতের পরে নাযিল হওয়া একটি সুরায় শেষ বারের মত ঐশী বিধানগুলোর লিখিত পৃষ্ঠাসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। "আল্লাহর নিকট হতে এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পৃষ্ঠাসমূহ, যাতে আছে সঠিক বিধান" (সূরা আল বাইয়্যেনাহ ঃ ২-৩)।

হযরত ওসমান রা. বলেন, "রাসুল সা.-এর প্রতি কোনো আয়াত নাযিল হওয়ার পর পরই লিপিকার-সাহাবীকে ডেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি কোন্ সুরায় কোন্ আয়াতের পর সংযোজিত হবে তা বলে দিতেন এবং সেভাবেই তা লিপিবদ্ধ করা হতো। লেখা শেষ হলে রাসূল সা. পড়ে শুনতেন এবং কোথাও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তখনই তা শুদ্ধ করিয়ে দিতেন।"

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর রা.-এর যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেযে কুরআন শহীদ হন। এমনিভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে যদি হাফেয সাহাবীগণ শহীদ হতে থাকেন তাহলে কুরআনের কোনো অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ভেবে হযরত আবু বকর রা. হযরত ওমর রা.-এর পরামর্শে শিক্ষিত, তীক্ষ্ণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ওহী লিপিকার, হাফেযে কুরআন, ন্যায়নিষ্ঠ উদ্যমী যুবক হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা.-কে সবগুলো বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি একত্রিত করে পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেন। এবং এ কাজে সহযোগিতার জন্য হাফেযে কুরআন ও ওহী লিপিকার হযরত ওমর রা.-কেও নিয়োজিত করেন।

হযরত আবু বকর রা. সাধারণ ঘোষণা প্রচার করে ওহী লিপিকারদের নিকট রক্ষিত কুরআনের বিচ্ছিন্ন নোস্‌খাগুলো একত্রিত করে হযরত যায়েদ রা.-এর নিকট উপস্থিত করার ব্যবস্থা করেন। এ সমস্ত বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপিগুলো যাচাই করার জন্য হযরত যায়েদ ও হযরত ওমর রা. যৌথভাবেই লিখিত নোস্‌খাগুলো গ্রহণ করতেন এবং একজনের পর অন্যজন স্ব-স্ব স্মৃতির সঙ্গে যাচাই করতেন। এমন কোনো লিখিত আয়াতই গ্রহণ করা হতো না, যে পর্যন্ত অন্তত দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এগুলো খোদ রাসূল সা.-এর সামনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে এবং হাফেযদের তেলাওয়াত সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এভাবে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. অসাধারণ সাবধানতার সাথে সর্বপ্রথম কুরআনের পরিপূর্ণ নোস্‌খা তৈরি করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন।

এ পাণ্ডুলিপি রাসূল সা.-এর নির্দেশিত ধারাবাহিকতায় লিপিবদ্ধ করা হলেও এতে সূরাগুলোর ধারবাহিকতা ছিল না। কারণ এতে প্রতিটি সুরা পৃথক পৃথক করে লিখা হয়েছিল, এজন্য এটি অনেকগুলো 'সহিফায়' বিভক্ত ছিল। এ সহিফাগুলোকে 'উম্ম' বা মূল পাণ্ডুলিপি বলা হতো। মূল পাণ্ডুলিপিটি ধারাবাহিক রূপে প্রচলিত সাত হরফে বা সাত কিরআতেই লিপিবদ্ধ ছিল, যেন প্রয়োজনবোধে সকল উম্মত এটি থেকে নিজ নিজ নোস্‌খা শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

সংকলিত এ নোস্‌খাটি হযরত আবু বকর রা.-এর নিকটই রক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর এটি হযরত ওমর রা. নিজের হেফাযতে নেন। হযরত ওমর রা.-এর শাহাদতের পর নোস্‌খাটি উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রা.-এর নিকট রক্ষিত থাকে।

হযরত ওসমান রা.-এর শাসনামলে দূর-দূরান্তে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে সাত কিরআত-পদ্ধতি বা আঞ্চলিকতায় লিখন-পদ্ধতির কারণে কুরআন

www.pathagar.com

পাঠে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত এলাকার লোক অবগত ছিল যে কুরআন সাত কিরআত পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছিল এবং সেভাবে লিখন-পঠনের অনুমতিও ছিল, সে সমস্ত এলাকায় কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু দূর-দূরান্তের লোকদের নিকট সাত কিরআত পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না থাকায় কোথাও কোথাও কিরআতের বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে নানা মতভেদ দেখা দেয়, এমন কি তা ঝগড়া-বিবাদে রূপ নেয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ কিরআত পদ্ধতিকে শুদ্ধ এবং অন্যদের কিরআত পদ্ধতিকে ভুল বলার গোনাহে লিপ্ত হতে থাকে। এ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে হযরত ওসমান রা. সাতটি শুদ্ধ কিরআত পদ্ধতিতেই তেলাওয়াত সম্ভব হয় এমন একটি লিখন পদ্ধতিতে কুরআনের সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য নোস্‌খা তৈরির কাজে হাত দেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রথম উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার নিকট থেকে মূল পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে আনেন। এ কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি কুরআন বিশেষজ্ঞ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, সায়ীদ ইবনুল আস এবং আব্দুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হেশাম রা.-সমন্বয়ে গঠিত এক জামাতের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং আরও অনেককেই তাঁদের সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাঁরা এ কুরআন লিপিবদ্ধ করার জন্য রাসূল সা.-এর যামানার অনুলিপিগুলো পুনরায় একত্রিত করে হযরত আবু বকর রা.-এর যামানায় লিখিত মূল পাণ্ডুলিপির সাথে নতুনভাবে যাচাই করেন। অতঃপর সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সবগুলো শুদ্ধ কেরআত-পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায় এমন একটি বিশুদ্ধ লিখন-পদ্ধতি অনুসরণে একাধিক নোস্‌খা তৈরি করা হয়। এগুলোর মধ্যে একটি মক্কায়, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়ামানে, একটি বাহরাইনে, একটি বসরায়, একটি কুফায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং অবশিষ্ট একটি নোস্‌খা বিশেষ যত্নসহকারে মদীনায় রক্ষিত ছিল।

মূল 'ওসমানী' অনুলিপিতে নোক্‌তা এবং যের-যবর-পেশ না থাকায় অনারবদের পক্ষে সেটা তেলাওয়াত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে সর্বসাধারণের জন্য তেলাওয়াত সহজতর করার লক্ষ্যে পরবর্তীতে মূল 'ওসমানী' অনুলিপির মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে নোক্‌তা, হরকত (যের-যবর পেশ), মঞ্জিল, পারা, রুকু, ওয়াক্‌ফ বা যতিচিহ্ন প্রচলিত হয়।

মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুরআন হাতে লিখা হতো। যুগে যুগেই এমন একদল নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন, যাঁদের একমাত্র সাধনা

www.pathagar.com

ছিল কুরআন লিপিবদ্ধ করা। কুরআনের প্রতিটি অক্ষর সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে এ সাধক লিপিকারগণ যে অনন্য সাবধানতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইতিহাসে তার অন্য আর কোনো নযীর নেই।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে হিজরি ১১১৩ সনে কুরআন মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সে কুরআনের একটি কপি মিশরের দারুল কুতুবে এখনও রক্ষিত আছে। এর পর প্রাচ্যবিদদের অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কুরআন মুদ্রণ করেন, কিন্তু সেগুলো মুসলিমজাহানে মোটেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে ওসমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কুরআন মুদ্রিত হয়। প্রায় একই সময়ে কাযান শহর থেকেও একটি নোস্‌খা মুদ্রিত হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তেহরানের লিথু মুদ্রণযন্ত্রে কুরআনের আর একটি নোস্‌খা মুদ্রিত হয়। এর পর থেকে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে কুরআনের নোস্‌খা মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত হয়।

কুরআন সত্য!

কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, এ সংরক্ষণধারায় কুরআন বিকৃত হওয়ার কোনো সুযোগই আসেনি। তাই এবার আমরা কুরআন থেকেই কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করব।

ইহুদী-খ্রিস্টান সমালোচকদের মতে বাইবেলের অনুকরণে কুরআন লিখা হয়েছে। কিন্তু বাইবেল তথা দুনিয়ার কোনো গ্রন্থে 'এতে সন্দেহ নেই' বা 'এটা নির্ভুল গ্রন্থ' এরূপ কথা বলা সম্ভব হয়নি। এছাড়া পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলো চাক্ষুষ প্রমাণে ভুলে পরিপূর্ণ, তবে তার মধ্যে সত্য ঐশী বাণীর কিছু কিছু আভাস মেলে মাত্র। অথচ আল-কুরআন শুরুতেই দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে এ গ্রন্থে কোনো সন্দেহ নেই' বা 'এটা নির্ভুল গ্রন্থ। সূরা আল বাকারা ঃ২

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় দেড়হাজার বছরে কুরআনের কোন একটি ঐতিহাসিক বাণী, ভবিষ্যদ্বাণী বা বৈজ্ঞানিক তথ্যসহ কোনো উক্তিই আজ পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয় নাই। এ বাস্তবতা কুরআনের সূরা আল বাকারা ঃ ২ নম্বর উক্তি তথা সমস্ত কুরআন 'নির্ভুল ঐশীগ্রন্থ' হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোন লেখকের জন্ম হয় নাই যার প্রথমবারের লেখার কোনো ভুল পরে আর সংশোধন করতে হয় না। অথচ কুরআনের কথাগুলো ফেরেস্তা মারফত যেভাবে পেয়েছেন, রাসূল সা. ঠিক সেভাবেই সাহাবীদের নিকট বলেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই তা সেভাবেই লিখে ফেলা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বসেরা পণ্ডিতগণও আজ পর্যন্ত তার মধ্যে বিন্দুবৎ কোনো প্রকার ভুল ধরতে পারেন নাই। কুরআনের এই চিরনির্ভুলতাই তার সঠিক ঐশীগ্রন্থ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

প্রত্যেক বচনের মধ্যে বচন ভঙ্গির কিছু পার্থক্য থাকে। আমরা দেখি একই ব্যক্তির মুখ দিয়ে প্রকাশিত হাদিস ও কুরআনের বচন ভঙ্গির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। হাদিসের বক্তব্য বক্তা (রাসূল সা.) নিজের মত করে প্রকাশ করেছেন। যেমন–"যে আমার নামে মিথ্যারোপ করে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়"(বুখারী, মুসলিম)। অথচ কুরআনের বক্তব্য বক্তার (রাসূল সা.) দ্বারা অন্যের ইচ্ছে মত প্রকাশ করেছেন। যেমন–"হে নবী বল, আল্লাহ মহান পবিত্র, আমি'তো একজন মানুষ, একজন রাসূল শুধু" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৩)।

হাদীসের বক্তব্য অতি সাধারণ ভঙ্গিমায় প্রকাশিত। কিন্তু কুরআনের বক্তব্য সহজ অথচ অতি উচ্চমানের প্রকাশ ভঙ্গিমা নিশ্চিত করে। এর বাক্য-ছন্দ পুরোপুরি গদ্য নয় অথচ সাহিত্যের গদ্যরীতির অনুপম সরল গভীরতার বলিষ্ঠ গাম্ভীর্য এবং এর মাধ্যমে ব্যক্ত ভাবের প্রকাশ দ্যোতনা নজীর বিহীন। এটা আবার পুরোপুরি পদ্যও নয় অথচ পদ্যের সাবলীল ভাব মাধুর্যের মোহময় পরিবেশ, হৃদয়গ্রাহী সুর-মূর্ছনা এবং আবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তর, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পুরামাত্রায় বিদ্যমান।

তাই দেখা যায় অমুসলিম লেখকের 'দি উইজডম অব দ্যা কুরআন' গ্রন্থে বলা হয়েছে–"প্রাচীন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ আল কুরআন সৌন্দর্য ও হৃদয়গ্রাহীতার এক মনোরম ক্ষেত্র। এর বর্ণনাশৈলী অত্যন্ত নিখুঁত এবং মনোমুগ্ধকর। ছোট ছোট বাক্যগুলোতে যেন ছন্দ ও কবিতার বিচিত্র সব উদাহরণের সমাহার। পাশাপাশি রয়েছে গযব বা শাস্তির ভয়াবহ ঘোষণা আর বিস্ময়কর নানা ঘটনার বর্ণনা। মোট কথা, কুরআনের সঠিক মর্ম ও তাৎপর্যকে কোনো ভাষায় সীমিত গণ্ডিতে ধারণ করা সত্যই কঠিন।"

কুরআনের এ ভাবের অতল গাম্ভীর্য, ভাষা ও বর্ণনার অনুপম সৌন্দর্য, বিস্ময়কর প্রাঞ্জলতা, প্রাণস্পর্শী ঝঙ্কার, ছন্দ ও অনুপ্রাসের মধুর অলঙ্কার, প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা-চাতুর্যের অভাবনীয় সমন্বয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী-প্রকাশ, কুরআনকে বিশ্বের বিরাট বিস্ময় ও শ্রেষ্ঠতম মুজিযা করে রেখেছে। বার বার

www.pathagar.com

পাঠেও বিশ্বাসী-হৃদয় এর প্রতি বিরূপ হয় না। এ বৈশিষ্ট্য বিশ্বের অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই। এর বাক্য-বিন্যাস ও রচনাশৈলী এতোই অপূর্ব যে, উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সমস্ত মানুষ ও জ্বীন সমবেতভাবে কুরআনের অনুরূপ একটি বাক্য রচনা করতে সক্ষম হয়নি, যা এর সত্যতা নিশ্চিত করে।

কুরআন সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. ফ্রেক বলেছেন-"কুরআনের ভাষা এতই প্রাঞ্জল ও বাক্যময়, তার বিষয়বস্তু এতই উঁচু মানের যে, অনুভূত হয় যেন এক মঙ্গলকামী আমাদের মঙ্গল কামনা করে নানাবিধ উপদেশ দিয়ে চলেছেন। এক বিজ্ঞ দার্শনিক যেন এক এক করে খোদায়ী দর্শনের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছেন।"

ডক্টর সেল কুরআন সম্পর্কে বলেছেন–"কুরআন নেহায়েতই মাধুর্যপূর্ণ ও পবিত্র ভাষায় গ্রন্থিত এক পুস্তক। এ পুস্তকই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, কোনো মানুষ এর নমুনা উপস্থাপন করতে সক্ষম নয়। এ এমন এক স্থায়ী মুজিযা, যা মৃতকে জীবিত করার চেয়েও আশ্চর্যজনক।"

মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন-"আল কুরআন এটি ঐশী গ্রন্থ। আমি আল কুরআনের শিক্ষা ও দর্শনের ওপর পড়াশোনা করেছি। একে ঐশীগ্রন্থ বলে গ্রহণ করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আমার কাছে এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে এ দিকটাকেই বেশি প্রতীয়মান হয়েছে যে, মানব প্রকৃতির সঙ্গে এর বিধানাবলীর আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়।

স্যার উইলিয়্যাম ম্যুর বলেছেন-"আল কুরআন অপরিবর্তনীয়। এর কোন অংশ, কোনো পরিচ্ছেদ, এমনকি কোনো শব্দ বা অক্ষরও এমন শোনা যায়নি যে, কোনো সংকলক একে বাদ দিয়েছেন কিংবা কেউ এর মধ্যে কোনো নতুন শব্দ বা বাক্য ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এমন নজির কোথাও পাওয়া যাবে না।

বিশিষ্ট গবেষক জর্জ বিল লিখেছেন-"আল কুরআন অলৌকিক গ্রন্থ। নিঃসন্দেহে আল কুরআন আরবি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। কোনো মহামানবের জ্ঞান ও মেধা এ ধরনের গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম নয়। মৃত প্রাণীকে জীবিত করার চেয়েও কঠিন-দুঃসাধ্য ও অলৌকিক এ গ্রন্থ।"

খ্রিস্টান ঐতিহাসিক মি. বাডলে বলেন-"আল কুরআন বিতর্কের উর্ধ্বে। এটাই একমাত্র গ্রন্থ যার মধ্যে তেরশ' বছরেও কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন সংঘটিত হয়নি। আল কুরআনের সামনে উপস্থাপন করার মত কোনো জ্ঞান ইহুদী এবং খ্রিস্টধর্মে নেই।

www.pathagar.com

কুরআনকে যারা মহান আল্লাহর পরিবর্তে রাসূল সা.-এর রচিত বলে কটাক্ষ করতো তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, "ওরা কি বলে, যে এটা রচনা করে ? (হে রাসূল) বল, তোমরাও এরূপ দশটি সূরা তৈরি করে আন এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি সত্যবাদী হও"–(সূরা হুদ ঃ ১৩।

যখন অবিশ্বাসীরা আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের কোন রকম মোকাবিলা করতে অপারগ হলো তখন তাদের অক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ বলেন, "তারা কি বলে এটা তোমার রচনা ? বল, সত্যবাদী হলে, তবে তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নিয়ে অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর"–সূরা ইউনুছ ঃ ৩৮।

অবিশ্বাসীদের অক্ষমতার জবাবে আল্লাহ আবারও বলেন, "আমার খাছ বান্দার প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ে তোমাদের কোনো সংশয় থাকলে তার মত একটি সূরা রচনা কর এবং ডেকে নাও তোমাদের সাহায্যকারীদের, আল্লাহ ব্যতীত; যদি তোমরা সত্যবাদী হও"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩)। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কুরআনের সব চাইতে ছোট সূরা 'আল কাওছার'-এর প্রথম দুটি আয়াত কাবা শরীফের দরজায় টাঙ্গিয়ে দেয়া হলো–

'ইন্না আত্বাইনা কাল কাওছার
ফাসাল্লিলি রাব্বিকা ওয়ানহার'।

এরপর এর তৃতীয় পংক্তিটি রচনা করে দেয়ার জন্য বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের আহ্বান করা হলো। একটি সূরা'ত দূরের কথা, শুধুমাত্র এর একটি আয়াতের অনুরূপ একটি আয়াত রচনায় তারা ব্যর্থ হলো। পরিশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তৎকালীন আরবের সেরা কবি 'লবিদ' আয়াত দুটোর সাথে ছন্দ মিলিয়ে লিখলেন–

'লাইসা হাযা মিন কালামিল বাশার'।

যার অর্থ হচ্ছে, 'নিশ্চয় এটা কোনো মানব রচিত কালাম (পংক্তি) নয়'। কাফির হয়েও তারা সে সময় বাধ্য হয়েছিল কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকৃতি দিতে। ইসলামের দাবি, এর পর প্রায় চৌদ্দ'শ বছর গত হয়েছে এখনও ওই চ্যালেঞ্জ উঠিয়ে নেয়া হয়নি, আজও তাদের সামনে অবারিত আছে আল-কুরআন। তবু আজ পর্যন্ত কেউ এ খোলা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারবে না বলে আল্লাহ নিজেই কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে, "বলুন যদি মানব ও জ্বীন এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হয় তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না"–(সূরা

www.pathagar.com

বনী ইসরাঈল ঃ ৮৮)। এ আয়াতে 'কখনও' এ কথাটার দ্বারা আল্লাহ পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শেষ পর্যন্ত সময় দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কোনো সময়ই এই চ্যালেঞ্জ থেকে বাদ না পরে। যুগে যুগে ইসলাম বিরোধীরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে কুরআনকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু বার বার ব্যর্থতার গ্লানি নিয়েই তাদেরকে পিছু হটতে হয়েছে।

"আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই, এটা এক মহাসাফল্য"–সূরা ইউনুছ ঃ ৬৪)। "কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না সম্মুখ হতে কিংবা পশ্চাৎ হতে"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৪২। "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এর নিরাপত্তা বিধায়ক"– সূরা আল হিজর ঃ ৯। কুরআনের এ সমস্ত চ্যালেঞ্জিং প্রস্তাবনাগুলোর সত্যতা যাচায়ের জন্য লন্ডন, তাসখণ্ড কিংবা ইস্তাম্বুলের তোপকাপী মিউজিয়ামে রক্ষিত কুরআনের প্রাচীন লিপিগুলো এবং প্রায় দেড় হাজার বছর পরে আজকের দুনিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে সবচাইতে নতুন মুদ্রিত একখণ্ড কুরআনের কপি আপনি যেভাবে খুশী মিলিয়ে দেখুন, কোথাও কোনো গড়মিল দেখতে পান কি না ? এ পরীক্ষা অবশ্য ইতোমধ্যে শতসহস্রবার হয়েছে এবং আপনিও এর বিন্দুমাত্র কোনো অনৈক্য বা গড়মিল দেখতে না পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। স্বীকার করতে বাধ্য হবেন 'পৃথিবীর ইতিহাসে এমন গ্রন্থ আর দ্বিতীয়টি নেই'। এমনকি একই ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বাণী বিশাল হাদীস গ্রন্থের কোথাও এরূপ চ্যালেঞ্জিং একটি বাণীও খুঁজে পাওয়া যায় না।

হাদিসের বাণীগুলো কুরআন নাযিলের সময়ের মধ্যে বর্ণিত হলেও কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কায় সে সময় লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়নি, বরং তা মুখস্ত রাখা হতো। পরবর্তীতে সেগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন হওয়ায় সাহাবীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য, সে সময় কিছু কপট মুসলিম (মুনাফিক) ইসলামের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে বহু হাদিস জাল করে, যা হাদিস বিশারদগণ পরবর্তীতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চিহ্নিত করেন। যদিও রাসূল সা. বলেছেন, "যে কেউ আমার ওপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়"–মেশকাত-৩২, বুখারী। তবুও মুসলিম সমাজে এখনও সেগুলোর চর্চা হয়ে থাকে। এমনকি কোনো কোনো ইমাম সাহেব মসজিদের মেম্বারে দাঁড়িয়ে বা কোনো ধর্মীয় আসরে বা খানকায় এগুলোর অহরহ চর্চা হয়, যা রাসূল সা.-এর ওপর মিথ্যারোপেরই নামান্তর। যেমন- ঈমামুল মোহাদ্দেস হযরত মোল্লা আলী কারী তাঁর মওযুয়াতুল কবির গ্রন্থে বলেন–

www.pathagar.com

১। "রাসূল সা. বলেছেন, আমি আল্লাহকে দাড়ি গোফহীন যুবকের ন্যায় দেখেছি"(হাদিসটি লানতযুক্ত জাল)।

২। যুদ্ধ থেকে ফিরে "রাসূল সা. বলেছেন, আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরলাম। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন- বড় জিহাদ কী ? উত্তরে তিনি বলেন, নফসের সাথে জিহাদ করা" (জাল)।

৩। "রাসূল সা. বলেছেন, পাগড়ী পড়ে নামাজ পড়লে ২৫ গুণ বেশি নেকী" (জাল)।

৪। "আমার উম্মতের ওলামাগণ বনি ইসরাইলের আম্বিয়াদের সমান" (জাল)।

৫। "এলেম দুই প্রকার-একটি দ্বীনি এলেম এবং অপরটি পার্থিব (শারীরিক) এলেম" (জাল)।

৬। "হযরত হুযায়ফা রা. রাসূল সা.-কে প্রশ্ন করেন, ইলমে বাতেন কী? উত্তরে রাসূল সা. বলেন, আমি ইলমে বাতেন সম্পর্কে জিব্রাঈল আ.-কে জিজ্ঞেস করেছি, জিব্রাঈল আ. আল্লাহ পাকের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ বলেন, ইলমে বাতেন হচ্ছে আমার এবং ওলীদের মাঝে গোপন ভেদ (সম্পর্ক)" (জাল)।

৭। ওলী আউলিয়াদের সম্পর্কে আলোচনা করলে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়" (জাল)।

৮। "আল্লাহ মূর্খকে ওলী বানান না, যদি বানান তবে আল্লাহ নিজ থেকে তাকে আলেম বানিয়ে দেন" (জাল)।

৯। "শহীদের রক্তের চেয়ে আলেমের কলমের কালি উত্তম" (জাল)।

১০। "মসজিদে দুনিয়াবী কথা বললে ৪০ বৎসরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়" (জাল, তবে অপ্রয়োজনীয় কথা বললে গোনাহ হবে)।

১১। "কোন আলেমের চেহারার দিকে তাকানো ৬০ বৎসরের নফল এবাদত অপেক্ষা উত্তম" (জাল)।

এরূপ আরও বহু জাল হাদিস রয়েছে, যা সঠিক বলে মনে হলেও আদৌ সেগুলো সঠিক হাদিস নয়। এখান থেকেই প্রমাণ হয়, ঐশীগ্রন্থ ছাড়া মানব রচিত কোনো গ্রন্থই সঠিক নয়।

এ সমস্ত চাক্ষুষ প্রমাণের পাশ কাটিয়ে যারা বলে 'কুরআন মানব রচিত' তাদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, "তারা কি সতর্কতার সাথে কুরআনকে অনুধাবন করে না ? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো উৎস হতে অবতীর্ণ হতো, তবে অবশ্যই তাতে বহু অসামঞ্জস্য এবং অসংগতি থাকতো"–(সূরা

www.pathagar.com

আন নিসা ঃ ৮২)। (যেমনটি দেখা যায় বাইবেলসহ বিভিন্ন ঐশীগ্রন্থে)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে সতর্কতার সাথে কুরআন অনুধাবন করে অসামঞ্জস্য এবং অসংগতি খুঁজে দেখতে বলেছেন। কারণ অবশ্যই 'ভুল' মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং 'নিভুলতা' শুধু আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য যা কেবল কুরআনেই দেখতে পাওয়া যায়।

কাফেররা বলতো, "এ সমস্ত অলিক কল্পনা, হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৫। "আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের বাদ দেব?"–সূরা আস সাফফাত ঃ ৩৬। "তাঁকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ"–সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১০৩। কাফেরদের এ সমস্ত উক্তিকে খণ্ডন করে আল্লাহ বলেছেন–"তিনি যদি আমার নামে কোনো রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, তবে আমি তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তাঁর গ্রীবা, তখন তোমরাও তাঁকে করতে পারতে না রক্ষা" (সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৭)। অনাগত চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনকারীর প্রতি বেদ বাইবেলেও একই ধরনের বণীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। "তারা যার প্রতি এই উক্তি আরোপ করে তার ভাষাতো আরবী নয়, কিন্তু কুরআনের ভাষা পরিষ্কার আরবী"–(সূরা আন নাহল ঃ ১০৩)।

কুরআন আল্লাহ হতে আগত, এ সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই কুরআনে বহুবার বলেছেন। যেমন–"তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যসহ যা এর পূর্বের কিতাবসমূহের সমর্থক। আর তিনি নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল"(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩)।

"আর এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অপর কারও রচনা নয়, পক্ষান্তরে এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে এটি তার সমর্থক এবং আল্লাহর বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে"–সূরা ইউনুছ ঃ ৩৭।

"আলিফ-লাম-রা, এ কিতাব এমন যার আয়াত সুস্পষ্ট ও প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হতে সবিস্তার বর্ণনা"–সূরা হুদ ঃ ১।

"এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন"–সূরা ত্বাহা ঃ ৪।

তিনি কত মহান যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফায়সালার (সমাধানের) কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হন"–সূরা ইউনুস ঃ ১।

www.pathagar.com

"আলিফ-লাম-মিম, এ কিতাবের অবতরণ বিশ্ব পালনকর্তার নিকট হতে, এতে কোনো সন্দেহ নেই"–সূরা হুদ ঃ ১-২।

"কুরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ"–সূরা ইয়াসিন ঃ ৫।

"পরাক্রান্ত পরমজ্ঞানী আল্লাহ হতে এ কিতাব অবতীর্ণ"–সূরা আয যুমার ঃ ১।

"হা-মীম, এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, পরমজ্ঞানী আল্লাহর নিকট হতে"–সূরা আল মু'মিন ঃ ১-২।

"কোনো ভুল তার (কুরআনের) সম্মুখ বা পশ্চাৎ দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না, যা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহ হতে অবতীর্ণ"–সূরা হা-মীম আস্ সাজদা ঃ ৪২।

" এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ"–সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৪৩।

"আমি একে অবতীর্ণ করেছি শবে কদরে"–সূরা আল কদর ঃ ১।

কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এরূপ আরও বহু আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিল হওয়ার ঘোষণা রয়েছে।

কুরআন মানব রচিত নয়

কুরআনে বলা হয়েছে "(হে মুহাম্মদ) বল, যদি এ কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানবকুল ও জ্বীন জাতি সমবেত হয় পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায়, তবুও তারা তা সম্ভব করতে পারবে না"।–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৮)। আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জিং এ প্রস্তাবনাটি কুরআন নাযিলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহাল রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ এর মোকাবিলা করতে সাহস দেখাতে পারেনি।

কুরআন যে দুনিয়ার মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়, এ বিষয়ে ড. রশিদ খলিফা মিশরী গবেষণা করে তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন। তিনি কম্পিউটরের সাহায্যে আল-কুরআনের ৭৪ নং সূরার ৩০ নম্বর আয়াতের উপর গবেষণা চালিয়ে সেখান থেকে তিনি বেশ কিছু আশ্চর্যজনক তথ্য আবিষ্কার করেন। প্রস্তাবিত আয়াতটি হচ্ছে "আলাইহা তিসয়াতা আশারা" (عليه تسعة عشر)। আয়াতে (على) 'আলা' শব্দের অর্থ হয়- উপর, তুলে ধরা,

www.pathagar.com

সম্ভ্রান্ত হওয়া, উচ্চতর করা, উচ্চতর হওয়া, সবার উপর, মাহাত্ম্য ইত্যাদি। আর আলা শব্দের সাথে ব্যবহৃত (ا) 'হা'-এর অর্থ হয়, র, এর, সেখানে, ধর, জেনে রাখ ইত্যাদি। 'তিসআতা আশারা' (تسعة عشر)-এর অর্থ ১৯ (উনিশ)। এখন সহজভাবে আয়াতটির অনুবাদ করলে দাঁড়ায়-

(১) এর উপরে উনিশ।

(২) তার উপরে উনিশ।

(৩) সবার উপরে উনিশ।

(৪) এর মাহাত্ম্য উনিশ।

কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত ৫টি আয়াত–

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন{–সূরা আল আলাক ঃ ১।

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে গ্রথিত বস্তু (রক্তপিণ্ড) হতে"(সূরা আল আলাক ঃ ২)।

"পড় তোমার সম্মানিত রবের নামে" (সূরা আল আলাক ঃ ৩)।

"যিনি শিখিয়েছেন কলমের দ্বারা" (সূরা আল আলাক ঃ ৪)।

"শিখিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না" (সূরা আল আলাক ঃ ৫)।

এ সুরার স্থানাঙ্ক কুরআনের শেষ দিক থেকে ১৯তম এবং এ সুরার আয়াতের সংখ্যাও ১৯। এর পর ৬৮ নং সুরার কিছু আয়াত নাযিল হয়। তৃতীয় বার ৭৩ নম্বর সুরার কতিপয় আয়াত নাযিল হয়। চতুর্থ বারে ৭৪ নম্বর সূরার ৩০টি আয়াত নাযিল হয়। এ ৩০ নম্বর আয়াতটিই হচ্ছে "এর উপরে উনিশ", এর মাহাত্ম্য উনিশ" বা "সবার উপরে উনিশ"।

এখন আমরা কুরআনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, ৩০ নম্বর আলাদা এ আয়াতটি পূর্ব ও পরের আয়াতের সাথে কিছু সামঞ্জস্য এবং কিছু অসাম স্য বজায় রাখে। অধিকাংশ অনুবাদক ৩০ নম্বর আয়াতে 'দোজখে ১৯ জন ফেরেস্তা মোতায়েন করা আছে' বলেছেন। কেউ 'তার উপরে উনিশ' এ অর্থেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এখানে ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ নম্বর আয়াতে শাস্তির স্থান ছাকার সম্পর্কে বর্ণনা আছে। কিন্তু ৩০ নম্বর আয়াতে হঠাৎ করে ১৯ সংখ্যাটির কথা বলা হয়েছে। এর পরের ৩১ নম্বর আয়াতের সাতটি অংশের মধ্যে প্রথম অংশে দোযখে প্রহরী মোতায়েনের কথা উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী ছয়টি অংশে ১৯ সংখ্যার গুরুত্বের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

(২য় অংশ) "সত্য প্রত্যাখ্যান কারীদের পরীক্ষা অথবা বিভ্রান্ত করার জন্যই আমি এ সংখ্যা স্থির করেছি"। এখানে 'ফিতনাত' (فتنة) শব্দের অর্থ-

www.pathagar.com

পরীক্ষা করা, বিভ্রান্ত করা, আগ্রহান্বিত করা, বিমুগ্ধ করা, বিমোহিত করা, আকর্ষিত করা। তবে যেহেতু আল্লাহ মানুষকে হেদায়েত দান করতে চান, সেহেতু এখানে 'ফিতনাত' শব্দের অর্থ-'বিভ্রান্ত করা' না হয়ে 'আগ্রহান্বিত করা, বিমুগ্ধ করা, বিমোহিত করা, আকর্ষিত করা' হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

(৩য় অংশ) "যাতে গ্রন্থ অনুসরণকারীগণের আস্থা সুদৃঢ় হয়। আর বিশ্বাসীগণের যেন ঈমান বেড়ে যায় এবং বিশ্বাসী ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে"।

(৪র্থ অংশ) "কিন্তু যাদের মন সন্দেহ দোষে ব্যাধিগ্রস্থ এবং সত্য প্রত্যাখানকারীরা যেন প্রশ্ন করে-এ অভিনব উপমা দ্বারা আল্লাহ কি ইচ্ছা প্রকাশ করেন ?"

(৫ম অংশ) "এভাবে আল্লাহ যাকে খুশী পথভ্রষ্ট করেন, যাকে খুশী সঠিক পথে চালিত করেন"।

(৬ষ্ঠ অংশ) "তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন"।

(৭ম অংশ) "মানুষের জন্য এগুলো উপদেশ বই কিছুই নয়।"

আমরা আগেই জেনেছি চতুর্থ বার ওহী নাযিলের সময় ৭৪ নম্বর সুরার ৩০ টি আয়াত নাযিল হয়েছে। ঊনিশ সংখ্যার প্রস্তাব সম্বলিত এ ৩০ নম্বর আয়াতের পরেই প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয় সেটা হচ্ছে- 'بسم الله الرحمن الرحيم।" এ আয়াতটি নাযিল হলো কুরআনের মুর্খবন্ধ সুরা ফাতিহা সহযোগে। এ আয়াতের সাথে গবেষক ১৯ সংখ্যার এক আশ্চর্য সংযোগ দেখিয়েছেন। এ আয়াতের অক্ষর সংখ্যা ১৯, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯÷১৯=১), এবং এ ১৯টি অক্ষর দিয়ে শব্দ হয়েছে ৪টি- ইসম, আল্লাহ, রহমান ও রাহিম। এ শব্দগুলো আল-কুরআনে যে যত বার ব্যবহার হয়েছে প্রত্যেকেই ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। যেমন-

(اسم।) 'ইসম'শব্দটি	আল কুরআনে	এসেছে-	১৯ বার,	১৯ ÷ ১৯ = ১
(الله।) 'আল্লাহ'	,, ,,	,, ,,	২৬৯৮ বার,	২৬৯৮ ÷ ১৯ = ১৪২
(الرحمن।) 'আররহমান'	,,	,,	৫৭ বার,	৫৭ ÷ ১৯ = ৩
(الرحيم।) 'আররাহিম'	,,	,,	১৪৪ বার,	১১৪ ÷ ১৯ = ৬
এই ৪টি শব্দ সর্বমোট এসেছে-			২৮৮৮ বার,	২৮৮৮÷১৯= ১৫২

আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আল কুরআনে মোট সুরার সংখ্যা ১১৪টি যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (১১৪÷১৯=৬)। আবার ১১৪টি সুরার মধ্যে

www.pathagar.com

১১৩টিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' আয়াতটি ব্যবহার হলেও আশ্চর্য্যজনকভাবে ১টি সূরায় এর ব্যবহার ২বার হওয়ায় আল কুরআনে আয়াতটির সংখ্যাও দাঁড়ায় ১১৪, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (১১৪÷১৯=৬)।

শুধু তাই নয়, কুরআনের কোনো কোনো সূরার শুরুতে ভাষানীতি বহির্ভূত কিছু শব্দ ব্যবহার হয়েছে যার কোন অর্থ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। ড. রশিদ খলিফা মিসরী এগুলোকে 'কুরআনী কোড' নামে অভিহিত করেছেন।

আলিফ (ا), হা (ح), রা (ر), সীন (س), সাদ (ص), তোয়া (ط), আইন (ع), ক্বাফ (ق), কাফ (ك), লাম (ل), মীম (م), নূন (ن), হা (ه), ইয়া (ي)। এ ১৪টি অক্ষরে গঠিত–

আলিফ লাম মীম (الٓمٓ), আলিফ লাম রা (الٓرٰ), হা মীম (حٰمٓ), তোয়া সীন (طٰسٓ), ইয়া সীন (يٰسٓ), তোয়া হা (طٰهٰ), সাদ (ص), নূন (ن), ক্বাফ (ق), আলিফ লাম মীম সাদ (المٓصٓ), হা মীম আইন সীন ক্বাফ (حٰمٓعٓسٓقٓ), তোয়া সীন মীম (طٰسٓمٓ), কাফ হা ইয়া আইন সাদ (كٓهٰيٰعٓصٓ), আলিফ লাম মীম রা (الٓمٓرٰ)।

১৪টি অক্ষর এ ১৪টি সেটে বা শব্দে মোট ২৯টি সূরায় ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এর মান দাঁড়ায় ১৪+১৪+২৯=৫৭, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (৫৭÷১৯=৩)।

পাশ্চাত্যের সমালোচকগণ অবশ্য এ কুরআনী কোডগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করে থাকেন। তবে তাদের এই বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যও কুরআনেরই অভিব্যক্তি এবং কুরআনের সত্যতার সাক্ষী। তারা এরূপ কথা বলবেই, কারণ 'তাদের অন্তর সন্দেহ দোষে ব্যাধিগ্রস্থ এবং তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী'। উল্লিখিত ১৯ সংখ্যা তাত্ত্বিক ৩০নং আয়াতটির পরের ৩১নং আয়াতের ৪র্থ অংশে বলা হয়েছে "কিন্তু যাদের অন্তর সন্দেহ দোষে ব্যাধিগ্রস্থ এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ যেন প্রশ্ন করে- এ অভিনব উপমা দ্বারা আল্লাহ কি ইচ্ছা প্রকাশ করেন?" এখানে সমালোচকদের বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য এ আয়াতটিরই প্রতিফলন বলে মনে করা যায়।

'কুরআনী কোড' সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন-"তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট (মুহ্কামাত), সেগুলোই

www.pathagar.com

কিতাবের আসল অংশ, আর অন্যগুলো রূপক (মুতাসাবিহাত); সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা বা কুটিলতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে, আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না"–সূরা আন নিসা ঃ ৭।

ড. রশিদ তাঁর গবেষণায় সুন্দরভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, কোনো একটি সূরা যে কোনো একটি বিশেষ কোডের দ্বারা যখন শুরু হয়, সে সূরাতে সেই কোডের অক্ষর বা অক্ষরসমূহ যতবার আসে, সে সংখ্যাটি পৃথকভাবে সকল সময়ই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য এবং সমষ্টিগতভাবেও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন- ৫০ নম্বর সূরা ও ৪২ নম্বর সূরাতে ব্যবহৃত কোডগুলো যথাক্রমে একক অক্ষর ক্বাফ (ق) এবং একাধিক অক্ষর হা-মীম আইন-সীন ক্বাফ (حمعسق)। আপনার হাতের কাছে যে কোনো একটি কুরআন থেকে সূরা দুটির ক্বাফ-এর সংখ্যা গুণে আপনি দেখে নিতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ক্বাফ-এর সংখ্যা ৫৭ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (৫৭ ÷১৯= ৩)। আবার সমষ্টিগতভাবে ৫৭+৫৭=১৪৪, এবং এটাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১১৪÷১৯=৬)। এখানে গবেষক যুক্তি দেখিয়েছেন, যেহেতু ক্বাফ অক্ষরটি কেবল উল্লিখিত দুটি সেটেই কোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং সমষ্টিগতভাবে এদের সংখ্যা ১১৪, যা কুরআনের মোট সূরার সংখ্যার সমান, সে ক্ষেত্রে ক্বাফ অক্ষরটি যদি কুরআনের অদ্যাক্ষর বা প্রতীক হয় তবে কুরআনী কোড 'ক্বাফ' এর মধ্যে কুরআনের ১১৪টি সূরার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তিনি আরও দেখিয়েছেন কুরআনে মোট ১২টি স্থানে লুত সম্প্রদায় সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও 'কাওমে লুত' (قوم لوط) শব্দ ব্যবহার হয়েছে ১১টি স্থানে। এবং আশ্চর্যজনকভাবে ব্যতিক্রম মাত্র একটি স্থানে। অর্থৎ উল্লিখিত ৫০ নম্বর সূরার ১৩ নম্বর আয়াতে ব্যবহার হয়েছে 'ইখওয়ানে লুত' (اخوان لوط) শব্দ। ফলে রক্ষা পেয়েছে ১৯-এর সংখ্যাতাত্ত্বিক অলৌকিক জটিল জালটি। ১২টি স্থানের মধ্যে মাত্র ১টি স্থানে অজানা কারণে এমন অস্বাভাবিক ব্যাতিক্রম না ঘটলে উক্ত ৫০নং সূরায় ক্বাফ-এর সংখ্যা হতো ৫৭-এর স্থলে ৫৮টি এবং ৪২নং সূরার সময়ে ক্বাফ-এর সংখ্যা হয়ে যেত ১১৫টি। ফলে উভয় ক্ষেত্রে ক্বাফ-এর সংখ্যা হয়ে পড়তো ১৯ দ্বারা অবিভাজিত এবং ভেঙ্গে পড়তো কুরআনী কোডের জটিল জালটি।

গবেষক তাঁর গবেষণায় কুরআনের এক ঐতিহাসিক অস্বাভাবিক ঘটনার মাধ্যমে কুরআনী জটিল জালটি রক্ষার আরও একটি ঘটনা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ৭নং সূরায় ব্যবহৃত কুরআনী কোড হচ্ছে– আলিফ লাম মীম সাদ (المص)। উক্ত সূরায় ৬৯নং আয়াতে ব্যবহৃত 'বাসতাতান' (بسطة)

www.pathagar.com

শব্দটি লিখার শুদ্ধরীতি হচ্ছে সিন (س) দিয়ে। আয়াতটি নাযিলের সময় রাসুল সা. 'বাসতাতান' শব্দটি সিন (س)-এর পরিবর্তে সাদ (ص) দিয়ে লিখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিলে সাহাবীগণ উক্ত শব্দে সাদ (ص)এর ব্যবহার আরবী ভাষার প্রয়োগরীতি বিরুদ্ধ বলে জানান। উত্তরে রাসূল সা. জিবরাইল কর্তৃক আল্লাহর বিশেষভাবে নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার কথা জানান এবং আরবি ব্যাকরণগত বিশুদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তা ওভাবেই ব্যবহার হচ্ছে। ৭নং সূরায় সাদ-এর সংখ্যা ৫৭, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (৫৭÷১৯=৩)। এবং ৭, ১৯ ও ৩৮নং সূরায় সম্মিলিতভাবে সাদ (ص)- এর সংখ্যা ১৫২ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (১৫২-১৯=৮)। নিম্নে কুরআনী কোডের জটিল জালের সামান্য একটু উদাহরণ তুলে ধরা হলো-

'আলিফ লাম মিম' এ কোড মোট ৬টি সূরায় ব্যবহার হয়েছে। সূরাগুলোতে ব্যবহৃত কোডের অক্ষর সংখ্যার একটি ছক নিম্নে দেয়া হলো।

সূরা নং ও নাম	মিম	লাম	আলিফ	মোট	ভাজক	ভাগফল
২. আল বাকারা	২১৯৫	+৩২০২	+ ৪৫০২ =	৯৮৯৯	÷ ১৯=	৫২১
৩. আল ইমরান	১২৪৯	+১৮৯২	+ ২৫২১ =	৫৬৬২	÷ ১৯=	২৯৮
২৯. আনকাবুত	৩৪৪	+ ৫৫৪	+ ৭৭৪ =	১৬৭২	÷ ১৯=	৮৮
৩০. রূম	৩১৭	+ ৩৯৩	+ ৫৪৪ =	১২৫৪	÷ ১৯=	৬৬
৩১. লোকমান	১৭৩	+ ২৯৭	+ ৩৪৭ =	৮১৭	÷ ১৯=	৪৩
৩২. সাজদাহ	১৫৮	+ ১৫৫	+ ২৫৭ =	৫৭০	÷ ১৯=	৩০
মোট	৪৪৩৬	+ ৬৪৯৩	+ ৮৯৪৫=	১৯৮৭৪	÷ ১৯=	১০৪৬

(الر) 'আলিফ লাম রা' এই কোডটি মোট তিনটি সূরায় ব্যবহার হয়েছে-

(১২নং)সূরা ইউসুফে ব্যবহৃত কোডের মোট অক্ষরসংখ্যা-২৩৭৫÷১৯=১২৫,

(১৪নং) " ইব্রাহীমে " " " " - ১১৯÷৭÷১৯= ৬৩,

(১৫নং) " হিজর " " " " - ৯১২÷১৯= ৪৮।

তিনটি সূরায় ব্যবহৃত কোডের মোট অক্ষর ৪৪৮৪ ÷ ১৯ = ২৩৬।

উল্লিখিত ওই দুটি কোডের উদাহরণ থেকেই অনুমান করা যায়, এটা কোন দৈব ঘটনা নয়। বিশাল গ্রন্থে এ ঘটনাটি ২/১টি শব্দের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাহীনভাবে দৈবাৎ ঘটে যেতে পারে। তবে ২৯টি সূরায় প্রত্যেকটি কোডের ক্ষেত্রে একইভাবে '১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়া' কুরআনী

www.pathagar.com

কোডের জটিল জালের সঠিক উদাহরণই পেশ করে। এটাকে কোনভাবেই দৈব বলা যায় না। তবু যদি কেউ জোর করে দৈব বলতেই চান তাহলে এটাকে 'পরিকল্পিত দৈব' বলতে হয়।

আল কুরআনের সংখ্যাগত মুজিযা এখানেই শেষ নয়। গবেষণায় দেখা যায় কুরআনে বিপরীতমুখী অনেক শব্দ সমান সংখ্যায় এসেছে। 'দুনিয়া ও আখিরাত' এ দুটো বিপরীতমুখী শব্দ কুরআনে এসেছে সমসংখ্যায়, সর্বমোট ১১৫ বার করে। 'ঈমান ও কুফর' শব্দ দুটো এসেছে ২৫ বার করে। 'ঠাণ্ডা ও গরম' এ দুটো এসেছে ৫ বার করে। 'ফেরেশতা ও শয়তান' শব্দ দুটো এসেছে ৭ বার করে, 'বলো (প্রশ্ন) এবং বললো (উত্তর) দুটো শব্দও এসেছে ৩৩২ বার করে।

আবার বিপরীতমুখী হওয়া সত্ত্বেও যেখানে ওই দুটো শব্দকে বলা হয়েছে সেখানে শব্দগুলো অসমসংখ্যায় এসেছে। যেমন–কুরআনে বলা হয়েছে 'সুদ এবং বাণিজ্য' এক নয়। এদুটো শব্দের একটি এসেছে ৬বার এবং অন্যটি এসেছে ৭বার। অন্যত্র বলা হয়েছে 'জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী' সমান নয়। এখানে জান্নাতের ৮ ও জাহান্নামের সংখ্যা ৭।

আবার দেখা যায় যেখানে একের সাথে অন্যের তুলনা করা হয়েছে সেখানে ওইদুটো নাম বা বস্তু সমান সংখ্যায় এসেছে। যেমন–কুরআনে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছে ইসার তুলনা হচ্ছে আদমের মত' (৩ ঃ ৫৯)। কুরআনে 'ইসা আ. ও আদম আ. এই নাম দুটোও সমান সংখ্যায় ২৫ বার করে এসেছে। ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনে এরকম আরও বহু সংখ্যাতান্ত্রিক মুজিযা আছে। যা দেখে মানুষ হতবাক হয়ে যায়। থমকে যায় সন্ধানী মন। তবে পাঠকের বিরক্তি এড়াতে যেতে হচ্ছে অন্য প্রসঙ্গে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন খ্রিস্টান ধর্মযাজক নওমুসলিম শায়খ আহম্মদ দিদাত কোরআনের উপর ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে তাঁর লিখিত 'Al-Quran the ultimate miracle' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, বর্তমান-পৃথিবীর ৫০০ কোটি মানুষ পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যদি আল কুরআনের মত সমঅক্ষর, সমশব্দ, সমবাক্য ও সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল জাল বিশিষ্ট এমন একটি ধর্মগ্রন্থ লিখার কাজ চালিয়ে যেত, তবে ৪৫০ কোটি বছর পর আজকের দিনে এসে প্রকল্পটির অগ্রগতি দাঁড়াতো সম্পূর্ণ কাজের এক'শ কোটি ভাগের ৩৫ ভাগ (.০০০০০০০৩৫) মাত্র, যা প্রকল্পটির সম্পূর্ণ কাজের তুলনায় অতি সামান্যতম-তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

www.pathagar.com

"বল, যদি এ কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানবকুল ও জ্বীন জাতি সমবেত হয় পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায়, তবু তারা তা সম্ভব করতে পারবে না"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৮।

"বলো আমার প্রভুর বাণীসমূহ লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবু আমার প্রভুর বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, যদিও অনুরূপ আরো সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আনয়ন করা হয়" (সূরা কাহাফ ঃ ১০৯)। এগুলোই প্রমাণ 'কুরআন মানব রচিত নয়'।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন-"(হে রাসূল) বল, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ" (সূরা কাহাফ ঃ ১১০)। এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূল সা.-কে আমাদের মতই একজন মানুষ আখ্যায়িত করেছেন। তাই নবীসুলভ মহৎগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে যখনই কোনো সামান্যতম মানবিক ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়েছে তখনই আল্লাহ তাঁকে সে বিষয়ে মৃদু ধমক বা মৃদু ভর্ৎসনা করে সাথে সাথে সাবধান করে তা সংশোধন করে দিয়েছেন। যেমন–

আল্লাহ বলেছেন, "আপনি যদি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন এ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌছিয়েছি, তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না"(সূরা আল বাকারা ঃ ১২০)।

"আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর আপনি যদি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন নিশ্চয় তখন আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন"(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৫)।

"এবং যারা আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তাহলে আপনিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন" (সূরা ইউনুস ঃ ৯৫)।

"জ্ঞান পৌছাবার পর আপনি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেন তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনার সাহায্যকারী বা রক্ষাকারী থাকবে না"
–সূরা আর রা'দ ঃ ৩৭

"অতএব আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ্‌কে ডাকবেন না, ডাকলে শাস্তিতে পতিত হবেন"(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ২১৩)।

এখানে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে সহজেই অনুমান করা যায় কুরআন আল্লাহর বাণী না হয়ে নবীর নিজের রচিত হলে এভাবে নিজেই নিজেকে ধমক দিয়ে সাবধান করতেন না।

www.pathagar.com

কুরাইশ সর্দারগণ যখন রাসূল সা.-এর সাথে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ক্রীতদাস, গরীব বা নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে তাঁর কাছে থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়, তখন আল্লাহ তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেন–আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না যারা সকাল বিকাল তাদের প্রতিপালকের এবাদাত করে। তাদের হিসেব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় যে আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন, করলে আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন"(সূরা আল আনআম ঃ ৫২)। এ ঘটনা প্রমাণ করে কুরআন আল্লাহর বাণী।

বদরের যুদ্ধে বহু মালামালসহ ৭০ জন কাফের সর্দার মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। গণিমতের মাল ও যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে তখনও কোনো ওহী নাযিল হয়নি। বন্দীদেরকে হত্যা করা হবে বা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হবে, এ ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে রাসূল সা. তাঁর স্বাভাবিক রহমত ও করুণা প্রকাশ করে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেবার পক্ষেই রায় দিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, "নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদেরকে নিজের কাছে রাখা, যে পর্যন্ত না দেশময় কাফিরদেরকে নিপাত করে ; তোমরা চাও দুনিয়ার সম্পদ আর আল্লাহ দিতে চাহেন পরকালের নিয়ামত, আল্লাহ পরাক্রান্ত কৌশলী"(সূরা আল আনফাল ঃ ৬৭)। এ আয়াতে আল্লাহ নবীর কাজকে অনুচিত বলে সমালোচনা করেছেন। এ আয়াত রাসূল সা.-এর নিজের রচিত হলে তিনি কখনও নিজের কাজকে অনুচিত বলে সমালোচনা করতেন না।

তাবুক যুদ্ধের সময় কয়েকজন মুনাফিক রাসূল সা.-এর কাছে মিথ্যা অজুহাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি চাইলে করুণাবশে তিনি তা কবুল করেন। এখানে তাঁর অতি নমনীয় আচরণে আল্লাহ মৃদু ধমক্ দিয়ে কৈফিয়ত তলব করে বলেন, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, কেন অনুমতি দিয়েছিলেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী তা আপনার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত?"(সূরা আত তাওবাহ ঃ ৪৩)। এ আয়াতেও দেখা যায় কুরআন রাসূল সা.-এর নিজের রচিত হলে তিনি নিজেই নিজেকে ধমক দিয়ে কৈফিয়ত তলব করতেন না।

ঘটনাক্রমে রাসূল সা. মধু পান করবেন না বলে স্ত্রীদের সামনে কসম খেলেন। এ ঘটনায় আল্লাহ আবারও মৃদু ধমক দিয়ে কৈফিয়ত তলব করে বলেছেন, "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশী করতে নিজের জন্য তা হারাম করলেন কেন ?"(সূরা আত তাহরীম ঃ১)। এখানেও তিনি তাঁর উম্মতদের সামনে নিজেকে ধমক দিয়ে নিজের কৈফিয়ত তলব করতেন না, যদি রাসূল সা. নিজেই কুরআন রচয়িতা হতেন।

www.pathagar.com

কুরআনের সূরা আল ফজর ৭ আয়াতে 'ইরাম' নামক একটি গোত্র বা শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ কোনকালে দুনিয়ার কোন ইতিহাস এর কোন উল্লেখ ছিল না। সবেমাত্র (১৯৭৩) সিরিয়ার 'এরলুস' নামক এক প্রাচীন শহরে খনন কাজের সময় পাওয়া কিছু লিখনে 'ইরাম' শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়, এখান থেকে তারা ব্যবসা করতো। সুদুর অতীতের গুপ্ত ইতিহাস হালে এসে প্রকাশিত হয়ে প্রমাণ করেছে। "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটা এক মহা সাফল্য" (সূরা ইউনুস ঃ ৬৪)। "এটা সন্দেহমুক্ত নির্ভুল ঐশীগ্রন্থ" (সূরা আল বাকারা ঃ ২) "এতে কোন অনুপ্রবেশ ঘটবে না সম্মুখ দিয়ে বা পিছন দিয়ে, এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ (সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৪২)

অপর এক ঘটনায় রাসূল সা. ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, 'তাঁর পালিত পুত্র হযরত যায়েদ রা. তার স্ত্রী যয়নব রা.-কে তালাক দিবেন এবং পরিশেষে যয়নব রা. রাসূল সা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন।' স্বভাবতই তখন তাঁর অন্তরে যয়নব রা.-কে স্ত্রী হিসেবে পাবার বাসনা জাগে। কিন্তু যখন প্রকৃতই হযরত যায়েদ রা. রাসূল সা.-এর কাছে এসে যয়নব রা.-কে তালাক দেয়ার কথা বললেন তখন রাসুল সা. যায়েদকে 'তালাক যা শরীয়তে জায়েয কিন্তু বৈধ কার্যাবলীর মধ্যে নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অবাঞ্চনীয়' সেই তালাক দিতে নিষেধ করেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ রাসুল সা.-কে আবারও মৃদু লজ্জিত করে বলেছেন,"স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, তাকে যখন আপনি বলেছিলেন তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর; আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করেছিলেন যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন, অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত"(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৭)।

এখানে বিষয়টি ভালোভাবে ভেবে দেখা উচিত যে, যে রাসূল সা. খুব অল্প বয়সে কাবা শরীফ মেরামতের সময় পাথর বহন করতে অন্যান্যের মত পরনের কাপড় খুলে মাথায় বাঁধার ইচ্ছা করামাত্র লজ্জায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। এমন লাজুক স্বভাবের সেই রাসূল সা. লোকনিন্দার ভয়ে যে বিষয়টি অন্তরে গোপন করেছিলেন, সে লজ্জাকর বিষয়টি আবার কি করে নিজেই উম্মতদের সামনে প্রকাশ করতে পারেন, যদি কুরআন তাঁর নিজেরই রচিত হয় ? এ আয়াতগুলোই প্রমাণ করে কুরআন তাঁর নিজের রচিত নয়। তাই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মেনে নিতেই হয় 'কুরআন আল্লাহর বাণী'।

www.pathagar.com

ইফকের ঘটনায় বনি মুস্তালিক যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরার পথে কাফেলার বিশ্রামস্থল থেকে শেষ রাতে রওয়ানা দেয়ার পূর্বে হযরত আয়েশা রা. প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে তাঁর গলার হারটি হারিয়ে যায়। হারটি খুঁজে পেতে বিলম্ব হওয়ায় কাফেলা ভুলক্রমে তাঁকে ছেড়ে রওয়ানা হয়ে যায়। এ সময় কাফেলার ভুলে ফেলে যাওয়া মাল কুড়িয়ে নেওয়ার দায়িত্বেরত হযরত সাফওয়ান রা. বিশ্রামস্থলের চারিদিকে ভাল করে খোঁজাখুঁজি করতে হযরত আয়েশা রা.-কে দেখতে পেয়ে 'ইন্নালিল্লাহী অ ইন্না ইলাইহী রাজিউন' পড়েন। হযরত সাফওয়ান রা. তাঁর উট হযরত আয়েশা রা.-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে উটে আরোহণ করতে বলে তিনি একটু দূরে সরে যান, হযরত আয়েশা রা. উটে সওয়ার হলে তিনি উটের রশি ধরে নিজে পায়ে হেঁটে রওয়ানা দেন। এভাবে তাঁরা সকাল বেলা কাফেলার পরবর্তী বিশ্রামস্থলে এসে পৌঁছেন।

এ ঘটনায় মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই হযরত আয়েশা রা.-এর নামে কুৎসা রটনা করে এবং আরও কয়েক জন নারী-পুরুষ এতে যোগ দেয়। এ পরিস্থিতিতে রাসূল সা. খুবই মর্মাহত হলেন এবং হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে উঠা-বসা হতে বিরত থাকলেন। এর কিছুদিন পর তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর ঘরে এসে বসলেন, সে সময় হযরত আয়েশা রা.-এর পিতা-মাতাও সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা চলাকালে সকলের উপস্থিতিতে রাসূল সা.-এর মধ্যে ওহীর লক্ষণ দেখা দিলে তাঁকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বাভাবিক হয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন–'আয়েশা, তোমার জন্য সু-সংবাদ। আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করে ওহী নাযিল করেছেন।' হযরত আয়েশা রা.-এর মা বললেন, 'আয়েশা দাঁড়াও এবং রাসূল সা.-এর কাছে যাও।' হযরত আয়েশা রা. বললেন, 'না মা, আমি এ বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারও ঋণ স্বীকার করি না, আমি দাঁড়াব না। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন' (আয়াতগুলো হচ্ছে- (সূরা আন নূর ঃ ১১-২০)।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, হযরত আয়েশা রা. রাসূল সা.-এর সহধর্মিণী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে যাঁর কাছ থেকে দোষমুক্তির আয়াত নাযিল হয়েছে সেই পরম করুণাময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। যদি কুরআন রাসূল সা.-এর নিজের রচিত হত তবে তাঁর সহধর্মিণী আয়েশা রা. নিশ্চয় সে কথা জানতেন এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। হয়তো'বা এত পরে আয়াত রচনা করার জন্য স্বামীকে ভর্ৎসনাও

www.pathagar.com

করতেন। কুরআনে রাসূল সা.-এর একজন শত্রু হিসেবে আবু লাহাবের নাম উল্লেখ রয়েছে। উক্ত আয়াত নাযিলের পর আবু লাহাব অন্যান্যদের মত ইসলাম গ্রহণ করলে মিথ্যা প্রমাণিত হতো আল কুরআন। বাস্তবতায় আবু লাহাব ইসলাম গ্রহণ করলো না, আর চিরসত্যই রয়ে গেলো আল কুরআনের বাণী।

"রোমানরা নিকটবর্তী ভূ-খণ্ডে বা ভূ-পৃষ্ঠের সর্বনিম্ন অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে। এ পরাজয়ের পর অচিরেই তারা বিজয়ী হবে। বিজোড় বছরের মধ্যেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আল্লাহরই রয়েছে পূর্বেও এবং পরেও। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে"(সূরা আর রূম ঃ২-৪)। কুরআনের এ অজানা তথ্যও নিকট-ভবিষ্যদ্বাণীটি সম্পর্কে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– পারসিকরা ছিল অগ্নি-উপাসক। তারা অনির্বাণ বা চিরন্তন অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে রেখে তার উপাসনা করত। পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজ ৬০৩ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে খ্রিস্টান জগতের ওপর মহা ধ্বংসতত্ত্ব চালিয়ে এ শহরে ৯০ হাজার খ্রিস্টানকে হত্যা করেন। বড় বড় গীর্জা ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে রাট-পাদ্রীকে তাঁরা বন্দী করে নিয়ে যান। খ্রিস্টানদের পবিত্র ক্রুশকাষ্ঠকেও তাঁরা ছিনিয়ে নেন।

পারভেজ বিজয়ের নেশায় সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে লিখেছিলেন 'তুমি বল তোমার খোদার ওপর তোমার ভরসা আছে। তোমার খোদা জেরুজালেমকে আমার হাত থেকে রক্ষা করল না কেন'? পরে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পারসিকরা মিশর পর্যন্ত দখল করে নিল। এ সময় পারভেজ জানাল 'রোমন সম্রাট, আমি কাইজোরকে (রাট-পাদ্রী) সেই সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা দিব না যতক্ষণ সে পায়ে জিঞ্জির বাঁধিত অবস্থায় আনিত না হবে এবং শুলবিদ্ধ খোদাকে ছেড়ে অগ্নি-খোদাকে গ্রহণ না করবে।

খ্রিস্টানরা ছিলেন ঈসা আ.-এর উম্মত। তাঁরা আল্লাহ, পরকাল ও নবীকে বিশ্বাস করতেন। কাজেই মুসলমানদের সহানুভূতি তাঁদের দিকেই ছিল। আর পৌত্তলিকদের সহানুভূতি ছিল অগ্নি উপাসক পারসিকদের প্রতি। পৌত্তলিকরা মুসলমানদেরকে এই বলে উতক্ত করত যে 'তোমাদের খোদার চেয়ে অগ্নি খোদাই বেশি শক্তিশালী'। এ ঘটনায় ৬১৫ সালের দিকে রোমানদের বিজয় লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করে 'সূরা রুম' নাযিল হয়।–সূরা আর রূম ঃ ২-৪।

৬২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে রোমানরা জয়ের পথে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে তারা আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুস্ট্রর জন্মস্থান আরামিয়া ধ্বংস করে ও পারস্যের সবচেয়ে বড় অগ্নি-কুণ্ডটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। এভাবে

www.pathagar.com

আল্লাহর কুদরতে পারসিকদের চিরন্তন বা অনির্বাণ শিখাকুণ্ড মানুষের হাতেই নির্বাণ লাভ করল। আর এ বছরই বদর যুদ্ধে মুসলমানরা মক্কার কাফিরদের ওপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করল। এ দুই বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দিত হলো। আর এইভাবে ৮/৯ বৎসরের মধ্যে কুরআনের উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হলো, যা সত্যসন্ধানী চিন্তাশীল অমুসলিম ও নাস্তিকদেরকে আজও তাক লাগিয়ে দেয়।

এই আয়াতের আরও একটি বিস্ময় হচ্ছে 'ফী আদনাল আরদ্' বলে আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠের যে স্থানটিকে 'সবর্জনিম্ন অঞ্চল' বলেছেন তা হচ্ছে বর্তমান সিরিয়া ফিলিস্তিন ও জর্দানের পতিত 'ডেড সী' এলাকা। মাত্র কিছুদিন পূর্বের ভূ-জরিপ অনুযায়ী এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই এলাকা 'সী লেভেল' থেকে প্রায় ১১২৮ ফুট নীচু, যা ভূ-পৃষ্ঠের সর্বনিম্ন অঞ্চল। ১৪০০ বছর আগে দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষে এ তথ্য দেয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে যিনি ভূ-তত্ত্বসহ দুনিয়ার কোন তত্ত্বেরই ছাত্র ছিলেন না। "এটা সন্দেহমুক্ত নির্ভুল ঐশীগ্রন্থ" (সূরা আল বাকারা ঃ ২) "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটা এক মহা সাফল্য" (সূরা ইউনুস ঃ ৬৪)

যে সমস্ত পাঠক এখনও হিসেব মিলাতে পারছেন না, তারা কুরআনের 'সু-দূর অতীত ও সু-দূর ভবিষ্যত' সম্পর্কিত একটি আয়াত লক্ষ্য করুন। বাদশা ফেরাউনের দৈহকে সংরক্ষণের অঙ্গীকার করে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন "আজ তোমার (ফেরাউনের) দেহকে আমি চর-ভূমিতে সংরক্ষণ করব, যেন তা পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে"। (সূরা ইউনুস ঃ ৯২)। "পূর্বকালে তোমাদের আগেও ছিল অনেক বিধান, তাই ভ্রমণ কর পৃথিবী এবং দেখ মিথ্যুকদের কি পরিনতি"(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৭)।

এখন আমরা ফিরে আসি ইতিহাসের দিকে, লক্ষ্য করুন–কুরআন নাযিলের প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে হযরত মূসা আ.-এর পশ্চাদ্ধাবন করে ফেরআউন (ফারাঁও মরনেপতাহ্) নীল-নদে ডুবে মারা যায়। এ সময় দুনিয়ার কোনো মানুষ তার মর-দেহের কোনো সন্ধান জানত না। আবার ঘটনার ঠিক দু'হাজার বছর পর যে সময় কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন তা অহেতুক মনে হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

কুরআন নাযিলের এক হাজার দুইশত আটষট্টি বছর পর ফেরআউন বংশেরই লোরেট নামক একজন লোক মাটি খুঁড়তে গিয়ে থিবিসের চর-ভূমি থেকে তার দেহটি উদ্ধার করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মিশরের জাদুঘরে তা দর্শনীয় হিসেবে রক্ষিত থেকে দুনিয়ার মানুষের কাছে কুরআনের বাণীর

www.pathagar.com

সত্যতা ঘোষণা করে যাচ্ছে। "তবু কি তারা বিশ্বাস করবে না ?"(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩০)।

কুরআন, ইতিহাস আর মিসরের যাদুঘর একত্রে মিলিয়ে দেখুন, দেখুন, আরও একবার দেখুন, আপনি যত বড়ই নাস্তিক বা অমুসলিম হোন না কেন! এ চাক্ষুষ ঘটনা আপনাকে একবার ভাবিয়ে তুলবেই, যদি আপনি ইতিহাস আর যুক্তিতে বিশ্বাসী হোন। 'আল্লাহ আছেন, কুরআন আল্লাহর বাণী, কুরআন সত্য' এ কথাগুলো প্রমাণ করার জন্য এবং জ্ঞানীদের বিশ্বাসকে ধরে রাখতে এ একটিমাত্র আয়াতই যথেষ্ট হবে। এর পরেও যারা নাস্তিকতায় বিশ্বাস রাখতে চায় তারা জঘন্যতম মিথ্যুক। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও জ্বীন, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় শাস্ত্র, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি মন্থন করে এরূপ একটি মাত্র বাণী উপস্থাপন করতে কোনক্রমেই সক্ষম হবে না। ঐতিহাসিক এ আয়াতটিই প্রমাণ করে, "এটা সন্দেহমুক্ত নির্ভুল কিতাব" (সূরা আল বাকারা ঃ ২)। "এতে মিথ্যার কোনো অনুপ্রবেশ ঘটবে না সম্মুখ দিয়ে বা পিছন দিয়ে। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ"(সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৪২)। শুধু সত্যের খাতিরে এখানে স্বীকার করে নিতে হলো 'কুরআন সত্য'। অন্যথায় ইতিহাস শাস্ত্র তার গ্রহণযোগ্যতা একেবারেই হারিয়ে ফেলে।

এখানে প্রমাণ হয় 'বাইবেল নকল করে কুরআন লিখা হয়েছে' কুরআন সম্পর্কিত খ্রিস্টজগতের এ দাবিটি মিথ্যার গর্ভে জন্ম নেয়া এক কাল্পনিক উচ্চাভিলাষ ছাড়া আর কিছুই নয়। উল্লিখিত ঘটনাটি বাইবেলের প্রাথমিক যুগের হলেও বাইবেলে এর কোনো উল্লেখ নেই। অথচ ঘটনার দু'হাজার বছর পর কুরআন নিখুঁত সত্যতার সাথে ঘটনাটির যথাযথ বর্ণনা দিয়ে সঠিক ঐশীবাণীর দাবিদার হয়ে মানুষকে অবাক করে দিয়েছে।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়, আল কুরআনে আরও বেশকিছু ঐতিহাসিক আয়াত আছে যেমন–সূরা আল ক্বামার ঃ১৩-১৫ নং আয়াতে উপমা হিসেবে জুদী পাহারের চড়ায় হযরত নূহ্ আ.-এর কিস্তি এবং সূরা হুদ ঃ ৮২ নং আয়াতে হযরত লুত আ.-এর সম্প্রদায়ের সমকামিতার অপরাধে তাদের জনবসতি ফেরেস্তা কতৃক উল্টিয়ে দিয়ে সেখানে ঐতিহাসিক লূত সাগর সৃষ্টি করা হয়েছিল। সুদূর অতীতের এসমস্ত চাক্ষুষ বর্ণনাগুলো দর্শনীয় হিসেবে আজও আল্লাহর বাণীর সত্যতা ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক এ ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে, কুরআন মানব রচিত নয় বরং 'আল্লাহর বাণী'। সুতরাং সত্যকে সামনে রেখে আবারও আপনার বিশ্বাসের বস্তুটির প্রতি লক্ষ্য করুন।

www.pathagar.com

ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের যুক্তিহীনতা

জাগতিকভাবে মানুষ বৈজ্ঞানিক চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে অভ্যস্ত। কাজেই জগতবাসীর ইহলৌকিক-পরলৌকিক অনুসরণিকা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দলীল হিসেবে আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহের বাণীগুলোর সত্যতা প্রমাণে সমন্বয় হওয়াটাই বিধেয়। এ ক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যতিক্রম দেখা দেয় তাহলে বিশ্বাসে ফাটল ধরতে বাধ্য এবং এরূপ ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করা যাবে না। অপর দিকে আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টি মহাসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা স্রষ্টার মহিমা প্রকাশের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে।

বস্তুত যুক্তির ওপর ভর করেই বিশ্বাস বা ঈমানের ভিত গড়ে উঠে। বিজ্ঞান ও ধর্মে যুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বাইবেলের উপদেশ হচ্ছে- 'প্রভু বললেন, এখন আস এবং এসো আমরা যুক্তিকে একত্র করি।' আবার কুরআনে বলা হচ্ছে-"তোমার রবের পথে ডাকো যুক্তি ও সদুপদেশের মাধ্যমে....."(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১২৫)। "বলো, আল্লাহর যুক্তি চূড়ান্ত ও অবিনশ্বর"(সূরা আল আনআম ঃ ১৪৯)।

ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন দার্শনিক এবং সে তার অবাধ ও নিরপেক্ষ মত প্রকাশের এখতিয়ার সম্পন্ন। অন্যের সাথে তার মতের মিল হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। সে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে আশেপাশের চারদিক সবকিছু সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। আর তখন যদি তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো দ্বিধা-সংশয় বা সন্দেহের উদ্ভব হয় তবে এ থেকেই তার মনে অবিশ্বাস দানা বাঁধতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে সে আরও অধিক আগ্রহে তার পর্যবেক্ষণ কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এমনি অবস্থায় তার গবেষণার বস্তুটির তত্ত্বজ্ঞানের লিপি বা গাইড যদি বস্তুটির সাথে সমন্বয় ঘটাতে প্রাসঙ্গিকতার খেই হারিয়ে ফেলে, তখনই অবিশ্বাস্যতা রূপ নেয় স্থায়ীভাবে। ফলে জন্ম নেয় এর প্রতি ক্ষোভ, ঘৃণা ও নিন্দাবাদের।

যত বড়ই নাস্তিক হোক না কেন, তার মনের অজান্তেই অতিশয় গোপনে 'এ জগত-সংসারের প্রতিটি জিনিসের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের কলকাঠি একজনের হাতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে' এ বিশ্বাসটি তার অন্তরে নাড়া দেয়। কিন্তু সে এর হিসেব মিলাতে পারে না বলেই বস্তুবাদ-তত্ত্বের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

www.pathagar.com

আমরা সাধারণভাবে সহজেই অনুমান করতে পারি সারাবিশ্বে আস্তিকের চেয়ে নাস্তিকের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, খোদ আস্তিক-সমাজে সত্য স্বঘোষিত নাস্তিকের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও অঘোষিত নাস্তিক জন্ম নিয়েছে অসংখ্য। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক যুক্তিহীনতা। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মহীনতার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে বা ধর্মকে দায়ী করা চলে না। এর জন্য দায়ী মানবহস্ত যা ধর্মকে বিকৃত করে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো তখনই ধর্মীয় বিষয় হতে পারে যখন ব্যক্তি বিশেষ এগুলোকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রকাশ্য নিদর্শন মনে করে ঈমানকে মজবুত করে। ধর্ম প্রতিষ্ঠিত সত্য। আর বিজ্ঞান সেই সত্য আবিষ্কারে নিয়োজিত একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি মাত্র। সুতরাং বিজ্ঞানের 'বৈজ্ঞানিক সত্য' আবিষ্কার ধর্মের সত্যতা প্রমাণে কার্যকর।

চরম বিজ্ঞানের যুগে এসে জ্ঞানী সমাজের বিজ্ঞ মানুষ পূর্বপুরুষদের ধর্মবিকৃতির দায় বহন করতে চান না। আবার অন্য ধর্ম সঠিক হলে তা মেনে নিতেও পারেন না। তবে বিজ্ঞ মানুষরা খুব ভাল করবেন এবং চরম বিজ্ঞতার পরিচয় দিবেন, যদি তাঁরা যাচাই-বাছাই করে সঠিক ধর্মকে মেনে নেন এবং তা প্রচার করেন। সঠিক ধর্ম নিরূপণ করতে হলে যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে যাচাই করাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক উপায়। কারণ সঠিক ধর্ম নিরুপণের জন্য যুক্তি ও বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর কার্যকরী। বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে এ কথা আমরা সহজেই বলতে পারি 'যে ধর্ম আধুনিক বিজ্ঞানকে মেনে নেয় সে ধর্মই সঠিক ও যুগোপযোগী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে'।

'আসমানী কিতাবসমূহ মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের সঠিক দিকদর্শন হিসেবে মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে যাচ্ছে'। এ মহাসত্যের বিপরীতে স্ববিরোধী মতাদর্শ ও মিথ্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে আজ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ। এ ছাড়া কতিপয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে আল্লাহ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে হযরত মূসা, দাউদ ও ঈসা আ. বরাবরে নাযিলকৃত যথাক্রমে তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল কিতাবসহ বিভিন্ন ঐশীবাণীসমূহকে নিজেদের প্রয়োজনে সমাজ শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ফেলেছেন। বর্তমান বাইবেল এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাইবেলের সংস্করণ প্রক্রিয়া ও এর বিবর্তন ধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে মহাসত্যের সন্ধান মিলে তাহলো 'আল্লাহ প্রদত্ত উল্লিখিত তিনটি আসমানী কিতাবসহ ইসলামপূর্ব যত ধর্ম দুনিয়ায় এসেছে সবগুলোই সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

নবীগণের বা তৎভক্তগণের মুখে মুখে মুখস্থের আকারে ধারণ করা হতো। কালক্রমে ওই সকল মুখস্থকৃত ঐশী বাণীসমূহ ভক্ত পরম্পরায় তথা মানুষ হতে মানুষের মধ্যে মুখস্থের আকারে আবর্তিত হতে হতে ওইগুলোর মৌলিকত্ব সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়। ফলে যুক্তিযুক্ত কারণেই বাইবেলসহ পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থ তার মৌলিকত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। এখানে আমরা সৃষ্টি বিষয়ক বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় এ বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হব।

সৃষ্টি সম্পর্কে বেদ-এর বর্ণনা

সৃষ্টি সম্পর্কে হিন্দুধর্মের বর্ণনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে– "প্রথমে সমুদয়ই তমাসাচ্ছন্ন ছিল। পরে বিরাট মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হলে তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মা রূপে অবস্থান করেন। পরে উক্ত অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক ভাগে আকাশ ও অপর ভাগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।"

এছাড়া সৃষ্টি তত্ত্বের ওপর বহু পৌরাণিক কাহিনী যেমন, প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীদের কাহিনী, প্রাচীন মিসরীয়দের কাহিনী, পলিনেশীয়দের পৌরাণিক কাহিনী, প্রাচীন তাওবাদী চীনাদের কাহিনীসহ দুনিয়ার পৌরাণিক সকল কাহিনীই বৈজ্ঞানিকভাবে অযৌক্তিক ও হাস্যকর।

সৃষ্টি বিষয়ে হিন্দুধর্মের উপরোক্ত বক্তব্যটিসহ দুনিয়ার সকল পৌরাণিক কাহিনী কোনভাবেই বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা-বিবেচনার যোগ্যতা রাখে না।

সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলের বিবরণ

'দি ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এ জগত সৃষ্টির বিবরণ হচ্ছে ঃ-

(১) আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

(২) পৃথিবী ঘোর অন্ধকার ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপর ছিল।

(৩) আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থান করছিলেন। পরে ঈশ্বর বললেন 'দীপ্তি হোক'। তাতে দীপ্তি হল।

www.pathagar.com

(৪) তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হতে দীপ্তি পৃথক করলেন।

(৫) আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হলে প্রথম দিবস হল।

(৬) পরে ঈশ্বর বললেন জলের মধ্যে বিতান হোক ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক।

(৭) ঈশ্বর এরূপে বিতান করে বিতানের উর্ধ্বস্থিত জল হতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করলেন। তাতে সেরূপ হল।

(৮) পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখলেন আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হলে দ্বিতীয় দিবস হল।

(৯) পরে ঈশ্বর বললেন, আকাশমণ্ডলের নিচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হোক তাতে সেরূপ হল।

(১০) তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখলেন, আর ঈশ্বর দেখলেন যে তা উত্তম।

(১১) পরে ঈশ্বর বললেন ভূমি-তৃণ, বীজ উৎপাদক ওষধি ও সজীব স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাতে সেরূপ হল।

(১২) ফলত ভূমি স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করল।

(১৩) আর ঈশ্বর দেখলেন যে, সে সকল উত্তম; আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হলে তৃতীয় দিবস হল।

(১৪) পরে ঈশ্বর বললেন, রাত্রি হতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতিগণ হোক, সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হোক এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলে আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক।

(১৫) তাতে সেরূপ হল।

(১৬) ফলত ঈশ্বর দিনের উপর কর্তৃত্ব করতে এক মহা জ্যোতি ও রাত্রির উপর কর্তৃত্ব করতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতি এই দুই বৃহৎ জ্যোতি এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করলেন।

(১৭) আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করণার্থে এবং দীপ্তি হতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিসমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করলেন।

www.pathagar.com

(১৮) আর ঈশ্বর দেখলেন যে, সে সকল উত্তম।

(১৯) আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হলে চতুর্থ দিবস হল।

(২০) পরে ঈশ্বর বললেন, জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে প্রাণীময় হোক এবং ভূমির উর্ধ্বে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষীগুলো উড়ুক।

(২১) তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগুলোর ও যে নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে জল প্রাণীময় আছে, সে সকলের এবং নানা জাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করলেন। পরে ঈশ্বর দেখলেন যে সে সকল উত্তম।

(২২) আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্বাদ করে বললেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর এবং পৃথিবীতে পক্ষীগুলোর বহুল্য হোক।

(২৩) আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হলে পঞ্চম দিবস হল।

(২৪) পরে ঈশ্বর বললেন ভূমি নানা জাতীয় প্রাণীবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু সরীসৃপ ও বন্যপশু উৎপন্ন করুক, তাতে সেরূপ হল।

(২৫) ফলত ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ তৈরি করলেন আর ঈশ্বর দেখলেন যে সে সকল উত্তম।

(২৬) পরে ঈশ্বর বললেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্য মানুষ নির্মাণ করি। আর তারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে, পশুদের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক।

(২৭) পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মানুষ্যকে সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদেরকে সৃষ্টি করলেন।

(২৮) পরে ঈশ্বর তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন। ঈশ্বর বললেন তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর। আর সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে আকাশের পক্ষীগুলোর উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপর কর্তৃত্ব কর।

(২৯) ঈশ্বর আরও বললেন, দেখ আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত বীজ উৎপাদক ঔষধি ও যাবতীয় সবজীজাত বৃক্ষ তোমাদেরকে দিলাম।

(৩০) তা তোমাদের খাদ্য হবে আর ভূচর যাবতীয় কীট এবং সকল প্রাণীর আহারার্থে হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাতে সেরূপ হল।

www.pathagar.com

(৩১) পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করবেন আর দেখ সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হলে ষষ্ঠদিবস হল।

(৩২) এরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হল।

(৩৩) পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হতে নিবৃত হলেন, সে সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হতে বিশ্রাম করলেন।

সৃষ্টি সম্পর্কিত বাইবেলের উপরোক্ত বিবরণগুলো বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে দেখা যায়, তা বৈজ্ঞানিক সত্যের কাছাকাছি গিয়ে উলট-পালট হয়েছে। এতে মনে হয় ওইগুলো সঠিক ঐশীবাণীরই বিকৃতরূপ, যেখানে লিপিকার তার মনের মাধুরী মিশিয়ে সে যুগের সৃষ্টি বিষয়ক বিশ্বাস ও অনুমানের ওপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা নির্ণয় করতে গিয়েই এমনটি ঘটিয়েছেন। ফলে বৈজ্ঞানিক সত্যের মুকাবিলায় বাইবেলের বিবরণ টিকে থাকতে পারছে না।

জগত সৃষ্টির এ বিবরণে বিজ্ঞানের সাথে কিছু কিছু শব্দের মিল থাকলেও এর কোনো একটি পূর্ণবাক্য বিজ্ঞানকে স্পর্শ করতে পারেনি। এখানে ১ থেকে ৫ নং বিবরণে দেখা যাচ্ছে প্রথমে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়, তখন পৃথিবী ঘোর অন্ধকার ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলের উপর ছিল আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থিত ছিল। পরে ঈশ্বরের হুকুমে দীপ্তি হলে দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখা হয়, আর সকাল ও সন্ধা হলে প্রথম দিন অতিবাহিত হয়।' অথচ তখনও সূর্য সৃষ্টি হয়নি, আবার দিবা-রাত্রির ধরনটাও পৃথিবীর সকাল-সন্ধা অর্থাৎ ২৪ ঘন্টার দিবা-রাত্রিই বুঝা যায়। এত অল্প সময়ে আসমান জমিন সৃষ্টির কথা বিজ্ঞান কল্পনাও করতে পারে না। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে 'পৃথিবী ঘোর অন্ধকার ছিল এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থিত ছিল'। এখানে দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির আগে পৃথিবী এবং জল ছিল। এমন গাঁজাখুরী গল্প ঐশীবাণী হতে পারে না এবং বিজ্ঞান তা মেনেও নেয় না।

১৬নং বিবরণে এসে দেখা যাচ্ছে তিন দিন পর চন্দ্র সূর্য ও জ্যোতিষ্কসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে। চন্দ্র সূর্য ও জ্যোতিষ্কসমূহ সৃষ্টি হওয়ার তিন দিন পূর্বে কিভাবে সকাল সন্ধার দিবস ও রাত্রি হয় তা বিজ্ঞানের বোধগম্য নয়। আবার নক্ষত্রের পূর্বে 'গ্রহ সৃষ্টি' বিজ্ঞান মেনে নিতেও পারে না। ষষ্ঠ দিবসে হযরত আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে বলা হয়েছে, কিন্তু কুরআন ও বিজ্ঞান এত অল্প সময়ে সৃষ্টি করার কথা মোটেও অনুমোদন করে না। বিজ্ঞানের মতে পৃথিবী সৃষ্টির পর মানুষ বসবাসের উপযোগী হতে কোটি কোটি বছর সময়

www.pathagar.com

লেগেছিল। কুরআন বলে- "যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর (কোটি কোটি বছর ধরে) উপযোগী করেছেন" (সূরা আল আ'লা ঃ ২)। অথচ বাইবেলে এমনিভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের পাশ কেটে ৬ দিন অর্থাৎ ১৪৪ ঘন্টায় সৃষ্টি-কার্য সমাপ্ত করে সপ্তম দিনে ঈশ্বর বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির কাল-পর্যায় বিভাজনের বিবেচনায় বিজ্ঞান বাইবেলকে পরিত্যাগ করেছে। আর সে কারণেই পাশ্চাত্যের মানুষেরা অপ্রতিরোধ্যভাবে নিরীশ্বরবাদী হচ্ছে। দুনিয়ার কোনো মানুষই নিজের বিশ্বাসের বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন হিসেবে দেখতে চায় না। আবার অন্যের বিশ্বাসের বিষয়টি বৈজ্ঞানিক-যুক্তিপূর্ণ হলেও সহজে তা মেনে নিতেও পারে না। ফলে প্রসারিত হচ্ছে নিরীশ্বরবাদের অপছায়া।

সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা

সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনে সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী 'ছয় দিনে' সৃষ্টি করেন" (সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৪)। "নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ- যিনি 'ছয় দিনে' নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করবার পর মহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে কার্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁর আদেশের পরে কোনো সুপারিশকারী নেই তাঁর অনুমতি ব্যতীত, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতএব তাঁরই উপাসনা কর, তবু কি তোমরা স্মরণ করবে না?" (সূরা ইউনুছ ঃ ৩)। এছাড়া সূরা হুদ ঃ৭, সূরা ফুরকান ঃ৫৯, সূরা আস সাজদাহ ঃ৪, সূরা আল ক্বাফ ঃ ৩৮ এবং সূরা আল হাদীস ঃ৪ নং আয়াতেও 'ছয় দিনে' সৃষ্টির উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় এ দিনগুলোর রূপরেখা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে- "..... যে দিনের (য়্যাওম) দৈর্ঘ্য হবে তোমাদের হিসেবে সহস্র বৎসরের সমান" (সূরা আস সাজদাহ ঃ ৫)। ".....রবের এক দিবস তোমাদের গণনায় হাজার বৎসরের সমান"(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪৭)। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে- "..... এমন এক দিন যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান" (সূরা আল মায়ারিজ ঃ ৪)।

এখান থেকে সহজেই অনুমান করা যায় সৃষ্টির 'ছয় দিনকে' বিভিন্ন ঘটনায় ছয়টি বিভিন্ন দীর্ঘ মেয়াদ বা পর্যায়কাল বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতে আরবী 'য়্যাওম' শব্দটির তৎপর্য 'দিন' বলে ব্যাখ্যা করা সঠিক নয়, কারণ পৃথিবী ও সূর্য সৃষ্টির পূর্বে দিন-রাত্রির প্রবর্তন হয়নি। কাজেই এখানে

www.pathagar.com

'য়্যাওম' এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে ক্ষুদ্র থেকে সুদীর্ঘ সময়-কাল। আল্লাহ বলেছেন-"যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর উপযোগী করেছেন" (সূরা আল হাজ্জ ঃ২)। এ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টই বুঝিয়েছেন, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীকে প্রাণী এবং মানুষ বসবাসের উপযোগী করেছেন। কুরআনের আর একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে সৃষ্টি বিষয়ক বিষদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

"বল তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু' দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক" (সূরা হা মীম আস সাজদা ঃ৯)। "তিনি ভূপৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর অনুসন্ধান করে" (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ১০)। "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ! অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।' তারা বলল, 'আমরা তো আনুগত্যের সাথে প্রস্তুত আছি" (সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ ঃ১১)। "অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন এবং তিনি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত" (সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ ঃ১২)।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে প্রথমেই সমালোচকরা সৃষ্টির 'ছয়' মেয়াদের সাথে একটা বিরোধ দেখতে পান। তাঁরা বলেন পৃথিবী সৃষ্টির দু'মেয়াদ, প্রতিপালন ব্যবস্থার চার মেয়াদ এবং আকাশমণ্ডল সৃষ্টি ও সংগঠনের দু'মেয়াদ, এ মোট আট মেয়াদ হয়ে যায়। পূর্বে যে ছয় মেয়াদের কথা বলা হয়েছে এটা তার স্পষ্ট বিরোধ।

এখানে দেখা যায় চারটি আয়াত আসলে দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দুটি আয়াতে পৃথিবী সৃষ্টির দু'মেয়াদ এবং প্রতিপালন ব্যবস্থার চার মেয়াদ, এ মোট ছয় মেয়াদের কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দুটি আয়াত প্রথম আয়াতটিরই ব্যাখ্যা। কারণ যে দু'মেয়াদে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে সেই দু'মেয়াদেই আকাশমণ্ডল সৃষ্টি ও সংগঠিত করা হয়েছে। এ যুক্তির পেছনে কুরআনের উক্তি হচ্ছে, "কাফেররা কি দেখে না যে, আসমান ও জমিন ছিল জড়ানো, পরে আমি তাদিগের উভয়কে পৃথক করেছি....."(সূরা আল আম্বিয়া ঃ

www.pathagar.com

৩০)। "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যাহা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ! ...."(সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ ঃ ১১)।

উপরোক্ত উক্তিগুলো থেকে জানা যায় আসমান ও জমিন ধুম্রপুঞ্জের মত একত্রিত, জড়ানো বা মিশ্রিত ছিল। এমতাবস্থায় যদি আসমান থেকে ধুম্রপুঞ্জকে সংকুচিত করে জমিনে পরিণত করা হয় তাহলে ওই একই সময়ে পরিষ্কার আসমান থেকে জমিন পৃথক হয়ে যায়। অর্থাৎ দুটি বস্তুর মিশ্রণ থেকে একটি বস্তুকে পৃথক করলে অপরটিও ওই একই সময়ে পৃথক হয়ে যায়। কাজেই পৃথিবী সৃষ্টির দু'মেয়াদ এবং আসমান সৃষ্টি ও সংগঠনের দু'মেয়াদ একই 'দু'মেয়াদ'। সুতরাং কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে ছয় মেয়াদে বিশ্ব সৃষ্টির যে বিবরণ আছে তার সাথে এখানে উদ্ধৃত বিবরণের আদৌ কোনো বিরোধ নেই। "রহমানের সৃষ্টিতে কোনো ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না; দেখ ভালভাবে দেখ, কোথাও কোনো খুঁত দেখতে পাও কি? আবার দেখ, কোথাও কোনো ত্রুটি না পেয়ে ফিরে আসবে তোমার চোখ ব্যর্থ ও ক্লান্তভাবে" (সূরা আল মুলক ঃ ৩-৪)। কাজেই আপনার বিশ্বাসকে একবার মিলিয়ে নিন কুরআনও বিজ্ঞানের সাথে।

কুরআনই জ্ঞান-বিজ্ঞান

কুরআন ছাড়া অন্যান্য কোনো ঐশীগ্রন্থে বিজ্ঞানভিত্তিক তেমন কোনো বাণী নেই। আর যেটুকু আছে তাও আবার বিজ্ঞানের সঙ্গে পুরোপুরি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু কুরআনে প্রকৃতি বিষয়ক প্রায় সাড়ে সাত'শ আয়াত রয়েছে যেগুলো প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসাহ দান করে। কুরআনে বিজ্ঞানভিত্তিক আয়াত না আসলেও কুরআন বা আল্লাহর কোনই ক্ষতি হতো না। তবুও যখন কুরআনে বিজ্ঞানভিত্তিক আয়াত এসেছে তখন বিজ্ঞানের যুগের মানুষের কাছে কুরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য অবশ্যই তা সঠিক হতে হবে। এ সকল আয়াত নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানেরই বিষয়বস্তু যা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার সম্ভবনা রাখে। সুতরাং এখানে ঐশীগ্রন্থের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় কুরআনই প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার গভীরে যাওয়ার পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সম্পর্কে ইসলাম যে ধারণা দেয় তা জানা প্রয়োজন।

ইসলামের দাবি অনুযায়ী সারাবিশ্বে কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যেখানে মানুষকে জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহিত ও আহ্বান করা হয়েছে সর্বাধিক। সুতরাং কুরআনই প্রকৃত জ্ঞানীদের জন্য সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। কুরআনে সর্বপ্রথম ঐশীবাণীর শুরু হয় 'ইকরা' (পড়) শব্দটি দিয়ে, যা প্রত্যক্ষভাবে

www.pathagar.com

জ্ঞানার্জনের সাথে সম্পর্কিত। বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবেই এখানে নিশ্চিত হওয়া যায় 'ইকরা' (পড়) শব্দ দিয়ে যে বিধানের শুরু স্বাভাবিকভাবেই তা জ্ঞানীদের জন্য সর্বোচ্চ জ্ঞানের বিধান হওয়ার সম্ভবনা রাখে। প্রথম আয়াতগুলো হচ্ছে-"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন গ্রথিত বস্তু বা রক্তপিণ্ড থেকে। পড় এবং তোমার প্রভু বড়ই মেহেরবান। যিনি শিখিয়েছেন কলম দ্বারা। শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।"–সূরা আল আলাক ঃ ১-৫।

এখানে সবগুলো আয়াতই জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত।

আবার কুরআন শব্দের অর্থ 'এক্ষণেই পঠিতব্য'। কুরআন প্রচলিত কোন বিজ্ঞানগ্রন্থ নয় তবুও কুরআনের অনেকগুলো নামের মধ্যে এক নাম 'হিকমাহ্' অর্থ- বিজ্ঞান, এক নাম 'হুদা' অর্থ- শিক্ষা, এক নাম 'বোরহান' অর্থ- যুক্তি এবং আর এক নাম 'বয়ান' অর্থ- ব্যাখ্যা। 'এক্ষণেই পঠিতব্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, যুক্তি ও ব্যাখ্যা' কুরআনের এ নামগুলোই জানিয়ে দেয় 'এটা প্রকৃত জ্ঞানীদের জন্যই জ্ঞানময় পথ-প্রদর্শক গ্রন্থ'। তাই ফ্রান্সের দার্শনিক আলকাস লোযায়েজোন বলেন–"কুারআন একটি জ্ঞানপূর্ণ ও জ্যোতির্ময় গ্রন্থ। আমরা (ইউরোপীয়গণ) বিজ্ঞানের যে সমস্ত বিষয় আমাদের খ্রিস্টধর্মের সাথে সময় সাধনের চেষ্টা করছি, সেগুলোর সমাধান ইসলাম ধর্মে এবং কুরআনে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল।"

জ্ঞান সম্পর্কে জি এম রাডউইর তাঁর 'দি কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন– "আল কুরআন জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার উৎস। একথা মানতেই হবে যে, আল্লাহর একত্ব, শক্তি, জ্ঞান এবং সততার যে বর্ণনা আমরা কুরআনে পাই, এ ছাড়া বেহেশত-দোযখ, আকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কে অনবদ্য ও সুস্পষ্ট আলোচনার জন্য আমরা কুরআনের যে প্রশংসা করি তা খুব সামান্য এবং অসম্পূর্ণ। আল কুরআন উন্নত ও উৎকৃষ্ট চরিত্র শিক্ষার অফুরন্ত ভাণ্ডার। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলো বিধৃত রয়েছে, তাতে একথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায় যে, এগুলোর উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী রাষ্ট্র, এমনকি একটি বিশাল সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।"

এ সম্পর্কে এডমন্ড বার্ক বলেছেন-"মুহাম্মাদী আইনের বিধান 'মুকুটধারী সম্রাট থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম প্রজা পর্যন্ত সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য'। এ কুরআন এমন এক বিধান যার মধ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞাপূর্ণ, সর্বাপেক্ষা জ্ঞানময় এবং সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত ব্যবহার-শাস্ত্রের সমন্বয় সাধিত হয়েছে"।

www.pathagar.com

ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে। কুরআনের প্রায় পাতায় পাতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। যেমন– "..... তোমরা আল্লাহর জন্য এক-একজন ও দু'দুজন করে দাঁড়াও এবং গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করতে প্রস্তুত হও" (সূরা আস সাবা ঃ ৪৬)। এখানে একক ও যৌথভাবে মুক্ত মনে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য উন্মুক্ত আহ্বান জানানো হয়েছে; এটিই গবেষণার মূল উপাদান। মানুষকে চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ এমনিভাবে পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেই আদেশ ও উৎসাহ দান করেছেন, যেমন- ".... যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং বিশ্রামগাহে (শুয়ে) আল্লাহর জিকির করে এবং চিন্তা ও গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরোয়ারদিগার ! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)। "যাদের এলেম দান করা হয়েছে তারা অধিকতর সম্মানের অধিকারী (সূরা আল মুজাদালাহ ঃ ১১)। "বল, যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের জ্ঞান নেই তারা কি সমপর্যায়ের? মূলত জ্ঞানবান লোকেরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে।"(সূরা আয যুমার ঃ ৯)।

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ দোয়া করতে শিখিয়েছেন-"হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও" (সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৪)। "তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন, যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে; এবং যারা জ্ঞানী তারাই উপদেশ গ্রহণ করে" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৯)।

আবার জ্ঞানচর্চা না করার কারণে আল্লাহ কুরআনে মানুষকে তিরস্কার করেছেন, যেমন-"আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা (বিবেকসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও) জ্ঞান খাটায় না, যারা (সবাক হওয়া সত্ত্বেও) মূক এবং (শ্রবণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও) বধির" (সূরা আল আনফাল ঃ ২২)।

এ সকল আয়াত দ্বারা আল্লাহ শুধু জ্ঞানকেই উৎসাহিত করেননি বরং এর দ্বারা কুরআনের সমালোচকদের অর্থাৎ যারা বলে 'ধর্ম জ্ঞান অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে' তাদেরকে যথাযথ শিক্ষা দিয়েছেন। সত্য থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়েও যারা বলে 'ধর্মে কোনো সত্য নেই, আছে প্রচুর মিথ্যা আর আদিম মানুষের ব্যাপক আত্মবিশ্বাস' আল্লাহ তাদেরকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে জ্ঞানহীন জীব আখ্যায়িত করে বলেছেন-

"নিশ্চয়ই জানোয়ারের চেয়েও অধম আল্লাহর নিকট তারাই, যারা সত্যকে অস্বীকারকারী" (সূরা আল আনফাল ঃ ৫৫)।

"যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে তারা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে, তারা বধির ও বোবা" (সূরা আল আনআম ঃ ৩৯)।

www.pathagar.com

জ্ঞান সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন-"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর নারীর জন্য ফরজ"(মেশকাত)।

"যে ব্যক্তি এলেম অর্জন করার জন্য পথ চলে, আল্লাহ তার জন্য বেহেস্তের পথ সুগম করে দেন"(বুখারী)।

" আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে আল্লাহ দীনের জ্ঞান দান করেন" (বুখারী)।

"নেতৃত্ব লাভের আগেই জ্ঞান হাসিল করে নাও" (বুখারী)।

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য বাহির হয়েছে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় রয়েছে, যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করে" (মেশকাত ৩৪)।

"যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করেছে ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে তোমাদের মধ্যে সেই উৎকৃষ্ট" (বুখারী)।

"যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে জাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে এলেম হাসিল করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তার ও পয়গম্বরের মধ্যে জান্নাতে মাত্র একটি দরজার ব্যবধান থাকবে" (মেশকাত ৩৬)।

"রাত্রির এক মুহূর্ত জ্ঞান চর্চা করা পূর্ণ রাত্রি জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম" (মেশকাত ৩৬)।

"হেকমত মুমিনের অমূল্য সম্পদ, তাই যেখানে বা যার নিকট পাবে তা অর্জন করবে" (মেশকাত ৩৪)।

জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে মুসলিম মনীষীরাও বহু মূল্যবান উক্তি করেছেন। যেমন–

"আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও উত্তম"।

"জ্ঞান-অর্জন করার জন্য সুদূর চীন দেশে হলেও যাও"।

"শৈশব হতে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর"।

"যে জ্ঞান অন্বেষণ করে সে আল্লাহকে অন্বেষণ করে"।

"যে দিন আমি কোনো জ্ঞান অর্জন করি না সে দিনটা আমার জীবনের অংশ নয়"।

"এলেম হল আমলের ইমাম স্বরূপ, আর আমল হচ্ছে এলেমের অনুসরণকারী"।

"মানুষের পরিচয় তার জ্ঞানের পরিমাণ হিসেবে, যার জ্ঞান নেই তার ধর্ম নেই"

"নির্বোধের সাথে বসে হালুয়া-রুটি খাওয়ার চাইতে বুদ্ধিমানের সাথে লড়াই করা অনেক বেশি কাম্য"

www.pathagar.com

মানুষ তিনটি উপায়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে–

১। পঞ্চ ইন্দ্রিয়–বিভিন্ন জিনিস দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে বলে দেয়া যায় এটা কি জিনিস।

২। বুদ্ধি– পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভরের মাধ্যমে কোন একটি ঔষধের গুণগত মান বিচার করা সম্ভব নয়। ঔষধটির গুণগত মান বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য।

৩। ওহী–অনুভব ও বুদ্ধির সীমা যেখানে শেষ, ওহীর জ্ঞানের কার্য্যকারীতা সেখান থেকে শুরু। কাজেই এক্ষেত্রে বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা যথার্থ নয়।

সত্য চিরন্তন, চিরপ্রতিষ্ঠিত, আর বিজ্ঞানের কাজ আবিষ্কারের মাধ্যমে সে সত্যকে স্বীকৃতি দেয়া বা প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন সেই সত্যেরই প্রতিভূ। এখানে মিথ্যার কোনো সংযোজন নেই। নেই কোনো গোঁজামিল। তাই এটা বিজ্ঞান যা প্রজ্ঞাময় প্রসংশিত আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ। কাজেই সেই বিজ্ঞান যিনি অবতীর্ণ করেন তিনি অবশ্যই বিজ্ঞানময়।

বিজ্ঞানের চরম বিকাশই কুরআনের যথার্থ প্রকাশ। আল্লাহর সৃষ্টিরাজি এক অপূর্ব বিস্ময়। সৃষ্টির রহস্য খুঁজেই স্রষ্টার মর্যাদা অন্তরে বদ্ধমূল হয়। তাই আবারও বলতে হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো তখনই ধর্মীয় বিষয় হতে পারে যখন ব্যক্তিবিশেষ এগুলোকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রকাশ্য নিদর্শন মনে করে ঈমানকে মজবুত করে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার আল কুরআনের বিজ্ঞানভিত্তিক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা মাত্র। কাজেই বিজ্ঞান ও ধর্মের ঐক্যে ফাটল ধরার কোনো উপায় নেই।

কুরআন অলৌকিক গ্রন্থ, আর অলৌকিকতা সবকিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত নয়। আবার বিজ্ঞান, লৌকিক গ্রন্থ হওয়ায় কুরআনের সবকিছু ব্যাখ্যাও করতে পারে না। আল কুরআনে আল্লাহর অপার কুদরতকে বুঝতে বলা হয়েছে, "…..যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং বিশ্রামগাহে (শুয়ে) আল্লাহর যিকির করে এবং চিন্তা ও গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরোয়ারদিগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)। প্রকৃতি বিজ্ঞানী ইরভিং উইলিয়াম নবল্‌চ বলেন–"বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাস সমর্থিত ও সুদৃঢ় হয়ে থাকে। একটি বিশেষ অর্থে এখানে বলা চলে যে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধর্ম ও বিজ্ঞান একই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'একটি নির্দিষ্ট সময়ে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং একদিন এ মহাবিশ্ব ধ্বংস হবেই' এ ব্যাপারে বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পূর্ণ একমত।" অথচ বিভিন্ন ধর্মের বৈজ্ঞানিক যুক্তিহীনতা স্রষ্টায় বিশ্বাসীদের

www.pathagar.com

বিশ্বাসকে ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাস হারিয়ে ঝুঁকে পড়ছে নাস্তিকতায়।

আল্লাহ চান, মানুষ সর্বদা তাঁর সৃষ্টির রহস্যকে জানার চেষ্টা করুক এবং জ্ঞানের চরম শিখরে আরোহণ করুক। এ কারণেই তিনি একজন আলেমকে আবেদের ওপর স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. বলেছেন–"আলেম আবেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেরূপ আমি আমার উম্মতের যে কারও তুলনায় শ্রেষ্ঠ।" তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি এলেম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ তাকে এমন বস্তুর এলেম (জ্ঞান) দান করেন যা সে পূর্বে জানতো না।" এ কথার অর্থ হচ্ছে, মানুষকে সুনিয়ন্ত্রিত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে। তাহলেই সে অজানাকে জানার সৌভাগ্য অর্জন করবে। তিনি এটাও বলেছেন–"জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েও যে তাকে কাজে লাগায় না সে আদতেই দুর্ভাগা।"

ইসলাম ছাড়া বিশ্বের অন্য কোনো ধর্মে এলেম বা জ্ঞানার্জনকে ফরজ করা হয়নি। যুগে যুগে বিদ্যার্জনকে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। কেউ পৃথিবীর বস্তুগত জ্ঞানটাকেই প্রধান মনে করেন, কেউ নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেন, আবার কেউ যুক্তিকেই জ্ঞানের মাপকাঠি মনে করেন। এ ক্ষেত্রে বলা যায় ইসলাম ধর্ম শুধু একটি ধর্মীয় সংস্কারই ছিল না বরং এর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা একমাত্র জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব। ইসলাম মনে করে, জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যে কোনো বিষয়ের ধারণা বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারে। ইসলামের মতে জ্ঞানের শক্তি দ্বারা মানুষ তার আপন সত্তা উপলব্ধি করতে পারে এবং জীবনের যে কোনো সমস্যার মোকাবেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তাই কুরআনের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কুরআন বিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয় নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে যেসব নীতি রয়েছে, কুরআনে এর সব কিছুরই উল্লেখ রয়েছে। আজ পর্যন্ত যত জড়বাদী থিওরীর কথা কল্পনা করা হয়েছে এবং যত থিওরী উদ্ভাবন করা হয়েছে তার কোনটির কাছেই চিরউজ্জল কুরআন এতটুকু দীপ্তি হারায় না

ইসলাম বলে, আল্লাহর অভিপ্রায়ের মধ্যেই ছিল মানুষের সামনে অবারিত করে দেয়া হবে এক বিশাল শক্তির ভাণ্ডার। তাই আগেই আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় মহানবী সা.-এর ওপর নাযিলকৃত সর্বকালীন মানব সম্প্রদায়ের জন্য চূড়ান্ত সংবিধান আল কুরআনের মাধ্যমে জ্ঞান ও গবেষণাকে উৎসাহিত করেছেন। সেই সাথে নৈতিক দায়িত্ব বোধের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে,

www.pathagar.com

যেন কোন উদ্ভাবনই মানব কল্যাণ ব্যতীত ক্ষতি সাধনে ব্যবহৃত না হয়। মহানবী সা. সর্বদা আল্লাহর কাছে অনাবশ্যক জ্ঞানচর্চা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অথচ বিজ্ঞানের জগতে আজ আবশ্যক-অনাবশ্যকের ধারণাই বিলুপ্ত হয়েছে।

কোটি কোটি মানব সন্তানকে অভুক্ত রেখে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অপচয় ঘটিয়ে হাজার হাজার পারমানবিক বোমার মজুদ গড়ে তোলা হচ্ছে, যার মাত্র কয়েকটি বোমাই সমগ্র পৃথিবীটা ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। কুরআনে বলা হয়েছে, "জালেমদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কঠোর শাস্তি" (সূরা মুরসালাত ঃ ৩১)। তাই বলে ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে কখনও নিরুৎসাহিত করে না, বরং জ্ঞানচর্চা ইসলামের একটি জরুরী দাবি। সে কারণেই বলা হয়, জ্ঞানী ব্যক্তির ঘুম মূর্খের নিদ্রাহীন এবাদতের চেয়েও মূল্যবান'। 'জ্ঞান সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও মূল্যবান'।

ইসলাম শুধু অনাবশ্যক জ্ঞানচর্চাকেই নিষিদ্ধ করেছে। তাই বলা যায় এ ধরনের নৃশংস জ্ঞানচর্চা যা বিশুদ্ধ মূর্খতারই নামান্তর। রাসূল সা. বলেছেন, "সংযম ব্যতীত জ্ঞান ঝঞ্ঝা তাড়িত ভস্মের মত"। তিনি আরও বলেছেন, "যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করে, সে যেন শুকরের গলায় পদ্মরাগমনি বা মুক্তোর মালা পড়িয়ে দিল"। কেয়ামতের দিন মানুষ সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসিত হবে- 'যে বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল তা কীভাবে কাজে লাগিয়েছে ?'

বিজ্ঞান সত্যকে আবিষ্কার করে

বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান সত্যকে আবিষ্কার বা প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ চির-সত্য, চির অপরিবর্তনীয়, তাই তাঁর বাণীও চির-সত্য, চির অপরিবর্তনীয়, মহাবিজ্ঞানময়। যুগ-কালের ব্যবধানে এ সত্যের কোনো পরিবর্তন নেই, লয়, ক্ষয়, মৃত্যু নেই। আল্লাহ রাসূল সা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "এবং আপনাকে কুরআন প্রদত্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় সত্তার কাছ থেকে (সূরা আন নামল ঃ ৬)"। এ প্রজ্ঞা বা জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান। প্রজ্ঞাময়-জ্ঞানময় সত্তার কাছ থেকে যে গ্রন্থ অবতীর্ণ তা বিজ্ঞানময় হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাই আল্লাহ কুরআনকে মহা বিজ্ঞানময় গ্রন্থ বলে ঘোষণা করেছেন, যেমন- "মহা বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম" (সূরা আল জুমু'আ ঃ ২)। আল্লাহ যে প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানময় অর্থাৎ বিজ্ঞানময়, এখানে সে কথারই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান মানুষের জন্য সত্য প্রতিষ্ঠাকারী ও পথ প্রদর্শনকারী। কুরআনও সে কাজটিই করে। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে–"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন ও শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত, ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"(সূরা আল জুমু'আ ঃ ২)

ইসলামের দাবি অনুযায়ী কোরআন মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহাসত্য গ্রন্থ। আর বিজ্ঞান সেই সত্যকেই অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করে। বিজ্ঞান মানুষের জন্য সত্য প্রতিষ্ঠাকারী ও পথ প্রদর্শনকারী। কুরআনও সে কাজটিই করে। সত্যের কোনো পরিবর্তন হয় না, সত্য চিরকালই সত্য, তাই তা চিরধ্রুব। চিরসত্য ও চিরধ্রুব আবিষ্কারই হচ্ছে বিজ্ঞানের ধর্ম। ইসলাম থিওরীতে বিশ্বাসী নয় সত্যে বিশ্বাসী, আর এ শর্ত পূরণ করতে পারে একমাত্র কুরআন। আল্লাহ তাঁর বাণীকে অকাট্য সত্য ও সুষম বলে দৃঢ়কণ্ঠে নিজেই ঘোষণা করেছেন 'আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম, তাঁর বাক্যের কোনো পরিবর্তনকারী নেই' (সূরা আল আনআম ঃ ১১৫)। তাই আল্লাহর বাণীই হচ্ছে বিজ্ঞান। আল্লাহ আরও বলেছেন, "এতে মিথ্যার কোনো অনুপ্রবেশ ঘটবে না সম্মুখ দিয়ে বা পিছন দিয়ে। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ"(সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৪২)।

ইতিহাস থেকে জানা যায় ধর্মীয় নীতি-আদর্শ বিবর্জিত ইউরোপীয় ইহুদী-খ্রিস্টানরা যখন আত্মিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল ঠিক তখনই মুসলমানদের সোনালী যুগের সূচনা হয়। মুসলমানদের জাগরণ ও ইসলামের সত্য-ন্যায়ের আলোকজ্যুতি বিস্তার লাভ করেছিল গোটা ইউরোপ ও আমেরিকায়। এতে ইউরোপীয় খ্রিস্টানবলয় কুরআনের ঐশী জ্ঞানের আলোক রশ্মিতে আত্মিক দিক দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল। আর বাহ্যিক দিক দিয়ে কুরআনের বদৌলতে তারা লাভ করেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানের উৎকর্ষতা। তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের কুরআন ভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার থেকে মুসলমানদের চেয়ে খ্রিস্টান সমাজ উপকৃত হয়েছিল বেশি। আর মুসলমানরা এর বিশ্বাসী হয়েও নিজেদের অবচেতনায় কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। ক্রুসেড যুদ্ধের পর পরাজিত মুসলমানরা যখন তাদের ভুলের মাশুল দিতে ইউরোপ থেকে পাততাড়ি গুটাচ্ছিল, তখন মুসলমানদের চলে যাওয়ায় ইসলামের প্রজ্জলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোর মশাল নিভে যাবে আশংকায় জনৈক খ্রিস্টান ইতিহাসবিদ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "ক্রুসেডে খ্রিস্টানবলয় বিজয়ী হলেও তারা

www.pathagar.com

কুরআন তথা মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অর্জিত উৎকর্ষতার সুবিধা পাওয়ার দিক থেকে পিছিয়ে গেল দু'শ বছর"।

ভারতের মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস. কে রামকৃষ্ণ রাও তাঁর 'দ্যা প্রফেট অফ ইসলাম' নামক গ্রন্থে লিখেন-"বিজ্ঞানের উদয় মুহাম্মদ সা.-এর হাতে। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে প্রকৃতি ও তার রীতি-নীতি অধ্যয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। যেন তারা সৃষ্টি সম্পর্কে বুঝতে এবং মহানুভব আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করতে পারে। আল কুরআন বলে- আসমান ও যমীন এবং এদের মধ্যে অবস্থিত জিনিসগুলোকে আমি (আল্লাহ) কেবল খেয়ালচ্ছলেই বানাইনি। এগুলোকে আমি সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)। এ পার্থিব জগত কোনো মরীচিকা নয়, অথবা কোনো উদ্দেশ্য বিহীন কারণে সৃষ্টি হয়নি। বরং এটি সত্যতার সাথে সৃষ্টি হয়েছে। কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ প্রকৃতি সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেয়ার জন্য এবং অসংখ্য বার নামাজ, রোজা ও হজ সম্পর্কে আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলমানেরা এর প্রভাবে প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন, ফলে এমন বৈজ্ঞানিক মানস সৃষ্টি হয়, যা গ্রীকদের অজানা ছিল।"

বিজ্ঞান ইসলামের সহায়ক শক্তি

বিজ্ঞান যেহেতু 'সত্য' আবিষ্কারে নিয়োজিত, সে জন্য এটা ইসলামের সহায়ক শক্তি। তবে বিজ্ঞান মানবীয় জ্ঞান, কাজেই এতে ভুলত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু ঐশীবাণী স্রষ্টার জ্ঞান যা ইস্পাত-কঠিন সত্য। বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধু বিশ্বপ্রকৃতি ও এর খুঁটিনাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে ধর্মীয় জ্ঞান সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে, অসীম স্রষ্টা পর্যন্ত এর পরিধি, কাজেই এর জ্ঞান অসীম ও অখণ্ডনীয়। এ পর্যন্ত সকল বিজ্ঞানী দ্বারা স্বীকৃত যেসব 'প্রাকৃতিক আইন' বা 'বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠিত সত্য' আবিষ্কার হয়েছে তার একটিও কুরআন বিরোধী নয়। বিশেষ করে বিশ্বপ্রকৃতি সংক্রান্ত কুরআনের বাণী-বক্তব্য ও তথ্যাবলী যেমন, আকাশমণ্ডলীর সংগঠন ও সম্প্রসারণ, জড়ের অতীত ও ভবিষ্যত অজড় শক্তি, মানব প্রজন্ম ও ভ্রূণতথ্য প্রভৃতি কুরআনে দেড় হাজার বছর পূর্বে যে তথ্যগুলো ব্যক্ত হয়েছে, যা কোন মানুষের পক্ষে সে সময় ধারণা করা বা ব্যক্ত করা সম্ভব ছিল না, একান্ত হালে এসে অত্যাধুনিক বিজ্ঞান সেগুলো আবিষ্কার করেছে মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের এ আবিষ্কার ধর্ম

www.pathagar.com

নিরপেক্ষবাদী, বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী বিজ্ঞানীদের মুখে কালিমা লেপন করে দিয়ে প্রমাণ করেছে যে কুরআন নিঃসন্দেহে নির্ভুল ঐশীগ্রন্থ, আল্লাহর ওহী, আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, ইস্পাত কঠিন মহাসত্য।

বিজ্ঞানের সকল থিওরী সাধারণ নিয়ম মাফিক পরিবর্তনশীল। থিওরী বদলায় কিন্তু সত্য বদলায় না। কাজেই শুধুমাত্র থিওরীর জ্ঞান সম্বল করে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কেউ যদি বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে গবেষণার জন্য হাত দেয়, তবে সে বিজ্ঞানের অসংখ্য তত্ত্বজালে আবদ্ধ হবে এবং দিশেহারা হয়ে পড়বে বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও। সাধারণ মানুষ এতে না জেনেশুনে বিশ্বাস করলে প্রতারিত হবে। আজ যে থিওরীকে সঠিক বলা হচ্ছে কাল তা ভিত্তিহীন থিওরী রূপে প্রমাণিত হতে পারে।

বিজ্ঞানকে সত্যের মাপকাঠিতে যাচাই বাচাই করতে হয়। জগতের অধিকাংশ লোক সত্য বিশ্বাসের ব্যাপারে সংশয়ী অথবা অবিশ্বাসী, বিজ্ঞানীরাও এর থেকে মুক্ত নন। কাজেই ইসলামের দাবি অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা যেসব বৈজ্ঞানিক ধারণা অথবা থিওরী দিচ্ছে সেগুলো কুরআনের সাথে মিলতে হবে, তা না হলে বুঝতে হবে বিজ্ঞানের গবেষণায় ভুল রয়েছে, যেহেতু বিজ্ঞান খণ্ডিত জ্ঞান সেহেতু এর খণ্ডন বা পরিবর্তন হতে পারে। আর আল্লাহর জ্ঞান অখণ্ডিত, সুতরাং আল্লাহর নাজিলকৃত ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন থেকেই তা অর্জন সম্ভব। অর্থাৎ থিওরী বদলায় কিন্তু সত্য বদলায় না। ইসলাম আহ্বান জানায় 'আপনার সামনে অবারিত কুরআন, মিলিয়ে দেখুন'- ১৪০০ বছর পূর্বের গ্রন্থ আল কুরআনের একটি আয়াত আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের 'প্রমাণিত সত্য' দ্বারা খণ্ডন করতে পারেন নাই। বরং বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক 'প্রমাণিত সত্য' আবিষ্কারের দ্বারা বার বার কুরআনের সত্যতাই প্রমাণ করে চলেছেন।

সচেতন মানুষ জানে ধর্ম ও বিজ্ঞানের অনৈক্য বা বিরোধ মানব-জাতির জন্য অমঙ্গলের কারণ হয়েছে। এ দুটির বিরোধ দূর হলে মানব জাতির কেবল মঙ্গলই সাধিত হবে। সাধারণত বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা গবেষণাধীন সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, অথচ বিরোধ হওয়া উচিত ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে, যেমন স্রষ্টার অস্তিত্ব, বস্তু জগতের সৃষ্টি ও বিকাশ, জ্ঞানের স্বরূপ, আত্মা ইত্যাদি। এসব দার্শনিক বিষয় ছাড়াও প্রকৃতির অন্যান্য ঘটনার আলোচনায় ধর্ম অংশ নেয়। তবে সেসব আলোচনায় ধর্ম কেবল মূলনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং খুঁটিনাটি আবিষ্কারের দায়িত্বটি দেবে মানুষকে। এভাবেই ধর্ম মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। প্রকৃতি বিষয়ক ধর্মের দেয়া খুঁটিনাটি

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে কিনা তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাদাতার ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের ওপর।

গবেষণাধীন বিজ্ঞানে পরম সত্য বলে কিছুই নেই। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রকে অবশ্যই পরম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা অবশ্যই সেই পরম সত্যের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং তা বিশ্বজনীন মানব কল্যাণের শর্ত পূরণ করবে। আর ইসলামই এ শর্ত পূরণে সক্ষম বলে ইসলাম দাবি করে। মূলত ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা মানব কল্যাণের শর্তাবলী পূরণ করে এবং সে সাথে প্রাকৃতিক বিষয়ের মূলনীতি ও খুঁটিনাটি ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবার সম্ভবনা রাখে। ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার যে কোনো ধর্মগ্রন্থই মানব কল্যাণের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়। তাই এখানে বিজ্ঞানের এ আলোচনায় ইসলামই প্রাধান্য পাচ্ছে।

ইসলামে জ্ঞান অর্জনের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা পৃথক একখণ্ড গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। রাসূল সা. মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী হওয়ার জন্য যেভাবে উৎসাহিত করে গেছেন, দুনিয়াতে এমন নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। ইসলাম জ্ঞানকে 'আলোক বর্তিকা' হিসেবে উল্লেখ করেছে, যে আলো দ্বারা সত্যকে জানা সম্ভব। তাই সত্য-ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনকে অনুধাবন করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার জন্য খোদ কুরআনেই বার বার জ্ঞান অর্জনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় কুরআন শুধু জ্ঞানীদের জন্যই পথ প্রদর্শক।

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক লোরা ভেসিয়া ভাগলিয়ারী বলেছেন—

"কুরআন আমাদের নিকট এক জ্ঞান সংগ্রহ তথ্য-জ্ঞানের আধার"।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ, বিশিষ্ট দার্শনিক, দক্ষ রাজনীতিবিদ এ, পি, স্কট বলেছেন, "আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে আরব প্রতিভার (ইসলামের) নিকট ঋণী"।

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক সেডিলট বলেছেন, "পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আরবরা সর্ব বিষয়ে আমাদের শিক্ষক"।

চেম্বাবার্স ইনসাইক্লোপিডিয়ায় ইসলামের জ্ঞানানুসন্ধান সম্পর্কে বলা হয়েছে, "হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সময় থেকে যে সভ্যতা ও জ্ঞানালোক জগতকে অলংকৃত করে আসছে, এর বিরাট সৌধের ভিত্তি-প্রস্তর হযরত মুহাম্মদ সা.-ই করেছেন। কুরআন মুসলমানদেরকে এরূপ প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছে, 'হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' (সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৪)। হযরত মুহাম্মদ সা.ও মুসলমানদেরকে বলেছেন-'জ্ঞান অর্জন

www.pathagar.com

বিশ্বাসীদের জন্মগত অধিকার, যথাতথা হতে তা অর্জন কর'। এ উপদেশ-বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বহু মহীরুহ উৎপন্ন করে, যার শাখা-প্রশাখা বাগদাদ, মিশর, সিসিলী ও স্পেন দেশে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং এ সকল বৃক্ষের ফল বর্তমান ইউরোপ অদ্যপি ভোগ করে আসছে"।

'ইনসাইক্লোপিডিয়া অব আমেরিকা'-এর খ্রিস্টান পাদ্রীগণের জ্ঞান সম্বলিত সম্মিলিত বাণী হচ্ছে- "ভাষা, বিজ্ঞান, ধর্মীয় বিধান, ইতিহাস, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে কোনো শাখারই হোক না কেন কুরআন প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-দুয়ারের চাবিকাঠিতে পরিণত হয়েছে"।

ইসলাম যখন জ্ঞানের জগতে অবাধ বিচরণের অনুমতি দেয় তখন বাইবেল খুলে দেখুন, সেখানে বলা হচ্ছে- "জ্ঞান মানুষকে অহংকারী করে" (কারিন্থীয়ঃ ৮ঃ১-২)। "আমি জ্ঞানীদের জ্ঞান নষ্ট করব, বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি বিফল করব" (কারিন্থীয়ঃ ১ঃ১৯)। "সেই দুর্বল লোক, সেই ভাই, যার জন্য খ্রিস্ট মরেছিলেন, তোমার জ্ঞানের দ্বারাই তার মহাক্ষতি হয়" (কারিন্থীয়ঃ ৮ঃ১১-১২)। এখানে জ্ঞানকে তিরস্কার করে ক্রুশযজ্ঞকে যিশুর মহা ক্ষতির কারণ বলা হচ্ছে। সেই মহাক্ষতিকর ক্রুশের চিহ্নকে ভক্তিভরে গলায় ঝুলিয়ে রেখে খ্রিস্টজ াতি মোটেও জ্ঞানীর পরিচয় বহন করে না।

বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইসলামের প্রবর্তক মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাবে যে নতুন যুগের সূচনা হয় তাকেই বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনে মহাপ্রভু বার বার নিজেকে মহাজ্ঞানী-মহাবিজ্ঞানময় বলে উল্লেখ করেছেন। আর ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনকেও বলা হয়েছে মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ। কুরআন ও হাদিসের বিজ্ঞানভিত্তিক বাণীগুলোতে মানুষকে নানাভাবে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের মধ্যে বিধিবদ্ধ ভাবে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছিল ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বে।

বস্তুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান চর্চার ক্রমবিকাশের ধারায় সংযোজন ধরা যেতে পারে। তবে ইউরোপীয় ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের মাঝে একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। সেটি হলো এই যে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে মূলনীতির প্রশ্নে কুরআনের স্মরণাপন্ন হতে পারতেন। কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ইউরোপীয় চার্চের নিকট যে ধর্মগ্রন্থ ছিল তা বিজ্ঞানীদের জন্য সহায়ক হয়নি তো বটেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চার্চের জ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার সংঘর্ষের জন্ম দিয়েছে। আর এ সংঘর্ষ চলেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। ফলে বিজ্ঞানের জগতে ধর্মবৈরিতা এমনকি ধর্মহীনতার উদ্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

রোমান ক্যাথলিক চার্জ কর্তৃক বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর ৬৯ বৎসর বয়সে যাবতজীবন গৃহ বন্দীত্বের সাজা ভোগ করতে হয়। খ্রিস্টসমাজ আজও এ অপমানের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে।

ঐতিহাসিক কারণে মুসলমানদের বিজ্ঞান জগতে পদচারণা কমে যাওয়ায় সারাবিশ্বে ইউরোপীয় বিজ্ঞান জগতে সৃষ্ট ধর্মবৈরীতা ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিম সমাজও ব্যতিক্রম হয়নি। একশ্রেণীর মুসলমানরাও ভাবেন, তাদের ধর্মনেতারা যে আল্লাহর কথা বলেন, 'সে আল্লাহ কি উচ্চতর বিজ্ঞানের গাণিতিক জটিলতা সহ্য করেন'? কিন্তু মুসলমানদের কুরআন যে বিশ্বজগতের ধারণা দেয় তার সৃষ্টি সৌন্দর্য ও বিন্যাস সর্বাধুনিক সর্বোচ্চ বিজ্ঞানের সাথে সাম স্যপূর্ণ'তো বটেই, এমনকি বিজ্ঞানের সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ যে রূপটি আজও বিজ্ঞানীদের কাছে অনাবিকৃত রয়ে গেছে, তা কুরআনেই আছে বলে ইসলাম দাবি করে।

ইসলাম বলে, মুসলমানদের দায়িত্ব হবে প্রাকৃতিক সকল রহস্য উন্মোচনে কুরআনের সহায়তা নেয়া। বিজ্ঞান তথা প্রকৃতির ভাষার শব্দ ভাণ্ডার ও ব্যাকরণ জানা এখনও শেষ হয়নি। তেমনি কুরআন যে ভাষায় প্রকৃতির কথা বলে সে ভাষার ব্যাকরণ এখনও পুরো আবিষ্কৃত হয়নি। তবে কুরআন আহ্বান জানায় সে ভাষার চর্চায়। আর মুসলিমের দায়িত্ব হলো কুরআন গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা সমভাবে করা এবং প্রাকৃতির ভাষা জানা ও প্রকৃতির রহস্য বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচন করা। ইসলামের পক্ষ থেকে এই যে আহ্বান এটা প্রাকৃতিক দর্শন ও ঐশী দর্শনের মাঝে ঐক্যের সম্ভবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানের আশ্চর্য সব নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলেই প্রাকৃতিক দর্শন ও ইসলামের মাঝে ঐক্যের সম্ভবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই বিজ্ঞানই আপনার বিশ্বাসকে সঠিক ও মজবুত করতে পারে বলে ইসলাম মনে করে।

ইসলামে বিজ্ঞানের ব্যবহার

বিজ্ঞানের আবিষ্কারই প্রমাণ করে দিল বস্তুবাদের অসারতা। বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে ইসলাম বলে, বিজ্ঞানীরা আজ প্রায় সর্বশক্তিমান দেবতার আসনে উপবিষ্ট। মনে হচ্ছে বিজ্ঞানের মত একটি বিরাট দানবীয় শক্তি আজ এমন কিছুসংখ্যক দুষ্ট ও মাথাগরম বালকের হস্তগত হয়েছে যাদের মধ্যে সর্বমানবিক প্রেম ও দায়িত্ববোধ তো দূরের কথা, অতি সাধারণ কল্যাণ-অকল্যাণের জ্ঞানও তাদের নেই। অতএব এ ধরনের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য

www.pathagar.com

বালকদের যা করণীয় তাই করছে। ফলত নিরপরাধ বিজ্ঞান আজ অশ্লীল ফূর্তি, মাস্তানী, জিঘাংসা, ত্রাস সৃষ্টির মত অপকর্মেই সার্বক্ষণিকভাবে লিপ্ত ও নিবেদিত।

বিজ্ঞানের এ একবিংশ শতাব্দীর বহু ভালবাসা নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা এ পৃথিবী নামক গ্রহটার অকাল মৃত্যু বোধ হয় অত্যাসন্ন। অনেকের হয়তো মনে পড়বে, এ দুঃখেই বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন জীবনের শেষ দিকে বিশেষ করে আনবিক বোমার নির্বিবেক বর্ষণের পরে আর বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেননি এবং আগ্রহও অনুভব করেননি। বলাই বাহুল্য, বয়সের ভারে নয়, এক গভীর আত্মগ্লানী ও মনের দুঃখে তাঁর শুধু বার বার মনে হয়েছে বিজ্ঞান সাধনার চেয়ে পথে পথে বেহালা বাজিয়ে বেড়ানোও শতগুণ উত্তম। যে বিজ্ঞানকে এক সময় মনে হয়েছিল সর্বদুঃখজয়ী-আর্শিবাদ, সেই বিজ্ঞানই আজ পরিণত হয়েছে এক অতি দুঃখময় অভাবিত অভিশাপে।

আমরা জানি বিজ্ঞানেরই আবিষ্কার যক্ষা, জলাতঙ্ক বা বহু ঘাতক ব্যধির সফল প্রতিষেধক। আবার বিজ্ঞানই উপহার দিয়েছে কোকেন, হিরোইন বা ম্যানড্রেক্স জাতীয় মাদক দ্রব্য আবিষ্কারের সূত্র কৌশল। আসলে বিজ্ঞান যত এগুচ্ছে, যত বিকশিত হচ্ছে, তত বেশি বলবান ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে অপশক্তি, তত দীর্ঘ হচ্ছে দৈত্যের অপছায়া, তত গাঢ়তম রূপ নিচ্ছে কুরুটিকা, অন্ধকার ও দুঃস্বপ্ন।

বিজ্ঞান একটি শক্তি এবং একটি সম্পদও বটে, যার পুরোটাই ব্যবহৃত হওয়া উচিত মানব কল্যাণে। অথচ এ শক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবিক যোগ্যতার প্রশ্নটি একেবারেই উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত। ফলে এখন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান নিয়ন্তাদের কাছে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের প্রশ্নটি কোনো প্রশ্নই নয়। বড় হল শক্তি প্রদর্শন ও বাহবা লিপ্সা। এ কারণেই বিজ্ঞান এখন এক ভারসাম্যহীন অন্তঃসারশূন্য প্রচণ্ড অপশক্তি। তাই আজ পৃথিবীটা বিজ্ঞানের কাছে বড় অসহায়। নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীটা আজ বিজ্ঞানের কাছে করুণ আবেদন জানায়। অথচ ইসলাম কল্যাণকর বিজ্ঞান ছাড়া ক্ষতিকর বিজ্ঞান চর্চা তো দূরের কথা অপ্রয়োজনীয় বিজ্ঞান চর্চাও অনুমোদন করে না। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- সর্বকালিন কল্যাণ-অকল্যাণের জ্ঞান অর্জন এবং মানব কল্যাণে তার বাস্তবায়ন।

বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় যাবার আগে পৃথক পৃথকভাবে বেশ কিছু লোকের সাথে বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এদের মধ্যে ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষায় নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও ছিলেন,

www.pathagar.com

এদের কেউই বিজ্ঞানের আবিষ্কার ভালো করে বিশ্বাস করতে চায় না। এ সকল ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপের সামান্য একটু উদাহরণ পেশ করছি- 'শুক্রবার দিন আসরের নামাজের পর একজন ইংরেজী প্রভাষকের সাথে দেখা হতেই উনি খুশিতে গদগদ হয়ে আমাকে বললেন, 'ভাই আজ এক মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে গিয়ে ইমাম (মুফ্‌তি) সাহেবের অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শুনে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে'। আমি তাঁর কাছে ব্যক্তব্যের বিষয়টি জানতে চাইলে উনি বললেন, ইমাম সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে–'বিজ্ঞানীরা আজ বিজ্ঞানের নামে সারা দুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বিজ্ঞানীরা বলে থাকে পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ আছে, এ মাধ্যাকর্ষণের ফলেই নাকি কোনো বস্তুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে আবার তা মাটিতে ফিরে আসে, গাছ থেকে ফল ছিড়ে মাটিতে পড়ে যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থাকে তবে মাটির অতি নিকট দিয়ে একটি ফড়িং উড়ে গেলে মাটি তাকে আকর্ষণ করে টেনে নিতে পারে না কেন ?' আমি প্রভাষক সাহেবকে বললাম, এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন ? তিনি বললেন–'ইমাম সাহেব ঠিকই বলেছেন। এত দিন আমি মনে করতাম বিজ্ঞানীদের কথাই ঠিক কিন্তু ইমাম সাহেব আমার সে ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন।' তখন আমি তাঁকে শুধু বললাম, মাধ্যাকর্ষণই সৃষ্টি জগতের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে এবং ফড়িং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে উড়ে যায়।

এ ঘটনার বেশ কিছু দিন পূর্বে আমি এক মসজিদে ইমাম (মোহাদ্দেস) সাহেবের মুখে গ্যালাক্সির বিশালতা সম্পর্কে বক্তব্য শুনে মনে করেছিলাম 'আকাশ বিজ্ঞান' সম্পর্কে তাঁর ভালো জ্ঞান আছে। কিছু দিন পর সময় সুযোগ মত সাক্ষাত করে তাঁর সাথে আমি বিজ্ঞান নিয়ে আলাপ করলাম। আমাদের আলাপ শুরু হলো সৌরজগতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের অবস্থান, গতি-বিধি, আকার-আকৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। আলাপের সারসংক্ষেপ হচ্ছে তাঁর ধারণায় 'পৃথিবীটা পুরোপুরি একটা সমতল ভূমি এবং উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে এর শেষ কোথায় মানুষ তা আবিষ্কার করতে পারেনি, আর কোনো দিন তা পারবেও না'।

জমিনের গভীরতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা, 'জমিনের নিচে সাতটি স্তর আছে যার বিস্তৃতি সাত স্তবক আসমানের মতই। অর্থাৎ প্রথম আসমানটি যেমন পৃথিবী থেকে যে শেষ তারকাটি দেখা যায় সে পর্যন্ত বিস্তৃত, জমিনের এক একটি স্তরের বিস্তৃতিও তেমনি'। তাঁর কাছ থেকে এ ধারণা পাবার পর আমি তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম 'পৃথিবীটা মাত্র ৮,০০০ মাইল ব্যাসের বল, কমলা লেবু বা গ্লোবের মত গোলাকার বস্তু। আমরা তার বহির্গাত্রে বাস

www.pathagar.com

করি এবং নদ-নদী, গাছ-পালা পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-জলরাশি সবকিছুই তার বহির্গাত্রে অবস্থিত এবং এ গ্লোবাকৃতির পৃথিবীটা মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায়

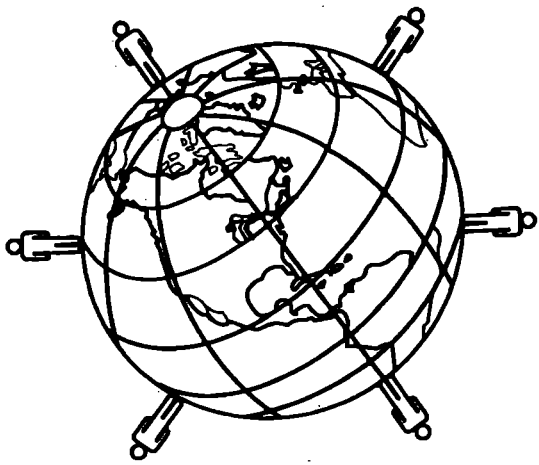

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর গায়ে মানুষ বসবাস করে।

সূর্যের চারিদিকে সন্তরণশীল'। একথা শুনে তিনি কিছুটা আশ্চর্য ও অবিশ্বাসের সুরে বললেন, আপনার তথা বিজ্ঞানের এ কথাটা ঠিক নয়। যদি তাই হয় তা হলে বিভিন্ন বস্তু কীভাবে পৃথিবী-গাত্রে আটকে থাকে? আমি বললাম, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে এগুলো আটকে থাকে। উনি বললেন, সেটা না হয় পৃথিবীর উপরের অংশে আমরা যেখানে বাস করি সেখানে মাধ্যাকর্ষণে আটকে থাকে, কিন্তু এ গ্লোবাকার পৃথিবীর পার্শ্বদেশ বা নিচের অংশের সমুদ্রের পানি, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত কীভাবে আটকে থাকে? ওইগুলো'ত নিচে পড়ে যাবার কথা। আমি বললাম, মহাশূন্যে উপর-নিচ বলে কিছু নেই, সেখানে কোনো দিক নেই। তবে গ্লোবাকৃতির পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে তার যে কোনো স্থান থেকে বাহিরের দিকে উপর দিক এবং তার কেন্দ্রের দিকে নিচ দিক অনুভব হয় এবং পৃথিবীর বিশালতার কারণে তার বক্র-পিঠ আমাদের কাছে সমতল ভূমি মনে হয়। ফলে আমাদের কাছে মনে হয় আমরা পৃথিবীর উপরের সমতল পৃষ্ঠে বাস করি।' সে দিন আমার কথাগুলো তাঁর বিশ্বাসে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি। কারণ বিজ্ঞানের এ কথাগুলো নাকি কিছুতেই তাঁর বুঝে আসে না।

এসব বাস্তব উপমা দেয়ার পর সম্মানিত পাঠকদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, তাঁদেরকে বোকা ভেবে কেউ বিদ্রুপের হাসি হাসবেন না। বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদের মত যাঁরা বিজ্ঞানের

www.pathagar.com

সাথে জড়িত নয়, এমন অনেকেরই আকাশ বিজ্ঞানের ব্যাপারে এ রকম অজ্ঞতা থাকা বিচিত্র নয়। কারণ মানুষ তার বুদ্ধির সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ মাত্র ব্যবহার করতে সক্ষম। তাই মানুষ একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্তই জ্ঞানী বলে বিবেচিত হতে পারে। সেই মাত্রার বাইরে মানুষ একটি নিরেট অজ্ঞ মাত্র। অর্থাৎ মানুষ দু'একটা বিষয়ে জগতবিখ্যাত বিশেষজ্ঞ হলেও বহু বিষয়ে অজ্ঞই থেকে যায়। কাজেই কোনো একটা বিষয়ের অজ্ঞতা কোনভাবেই তার জ্ঞানহীনতা প্রমাণ করে না। তবে এমতাবস্থায় সকল শ্রেণীর পাঠকদের সুবিধার্থে বিজ্ঞান বিষয়টির 'উপস্থাপন কৌশল' অত্যন্ত সহজ-সরল হওয়া বাঞ্চনীয়, যদিও তা বিজ্ঞানের বিধি বহির্ভূত এবং অনেক জ্ঞানী-গুণী পাঠকদের কাছে বিরক্তিকরও মনে হতে পারে। তবুও আমরা সৃষ্টি তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞানের জটিলতার বিপরীতে বোধগম্য সংক্ষিপ্ত সরলতাটুকু নিয়ে এগিয়ে যাব।

সর্বকালের সর্বদেশের এবং সর্বজাতির প্রতিটা জিজ্ঞাসু মন জানতে চায় এ বিশ্বজগত কবে, কখন, কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? নাকি বস্তুই আদি? তা না হলে এসব এলো কোথা থেকে? কখন, কীভাবে এসব সৃষ্টির সূচনা হলো? এ মানব প্রজন্মই বা পৃথিবীতে এলো কোথা থেকে? স্রষ্টা বলে কেউ আছেন কি? যদি থাকেন তবে তিনি কে এবং কীভাবে তিনি সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক রক্ষা করছেন? সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক রক্ষা করার যুক্তিই'বা কতটুকু? এসব প্রশ্ন নতুন কিছু নয় বরং অতি প্রাচীন কাল থেকে সদ্য নবীন শিশু মনেরও শাশ্বত জিজ্ঞাসা এগুলো।

এসব প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে গিয়েই যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান বহু শাখা বিস্তার করেছে। উৎসুক মানুষের এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যুগে যুগে ধর্মনেতা, দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান এগিয়ে এসেছে। বর্তমান কালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থ ও বিজ্ঞানপন্থি, দুই বিপরীত মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু যা সত্য-সঠিক তা বিজ্ঞান বা ধর্ম যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন, তা একই দেখাবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হলে বুঝতে হবে কোথাও যেন গড়মিল হয়েছে।

স্রষ্টা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে হবে। জানতে হবে তাঁর সৃষ্টির কৌশল, বুঝতে হবে তাঁর সৃষ্টির ভাষা। মানুষ যত বেশি সৃষ্টিকৌশল জানতে পারবে তত সহজ হবে স্রষ্টাকে জানা, তত স্পষ্ট হবে স্রষ্টার অস্তিত্ব। নাস্তিক বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারই আজ বস্তুবাদের টুটি চেপে ধরেছে। নড়বড়ে করে দিয়েছে বস্তুবাদের ভিত। কাজেই চরম একাগ্রতার সাথে সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্য আবশ্যক।

www.pathagar.com

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে মহাবিশ্বের সৃষ্টি

বিজ্ঞান অনুমোদিত বিগ ব্যাংগ বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় ১৫ মহাপদ্ম (১৫শ কোটি) বছর পূর্বে যখন বস্তু, শক্তি ও সময় কিছুই ছিল না, এমন এক শূন্যতায় একটি পরমাণুর $১০^{-২৪}$ ভাগ অর্থাৎ এক হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগের এক মহাসূক্ষ্ম অনুপম বিন্দুতে এক সেকেন্ডের $১০^{-৪৩}$ ভাগ অর্থাৎ দশ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক মহাসূক্ষ্ম ভাগ সময়ে সহসা কোনো এক মহাবিস্তার শক্তি হতে মহাবিশ্বের সমস্ত ভর ও শক্তিপুঞ্জের মহাতীব্র ঘনায়নে $১০^{-৩২}$ কেলভিন অর্থাৎ দশ হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি কেলভিন তাপমাত্রায় মহাবিস্ফোরণের ফলে বেলুন ফোলানোর মত গ্লোবাকারে সম্প্রসারণশীল এ মহাবিশ্বের সূত্রপাত হয়।

শক্তিকে পদার্থে এবং পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার বিষয়টি আজ আর কোনো কল্পকাহিনী নয় বরং বিজ্ঞান অনুমোদিত প্রমাণিত সত্য, যা বিগ ব্যাংগ তত্ত্বকে অনুমোদন করে। অপর দিকে বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যে দুটি মহাসত্য প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে 'বস্তু মূলত শূন্য হতে শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং এর কারণস্থলের পিছনে অতিন্দ্রিয় কোনো মহাশক্তিশালীর মহাবিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে'। আবার এখানে এটাও প্রমাণ হয় 'অলৌকিক শক্তি-সত্তার মধ্য থেকেই লৌকিক সত্তা বা প্রকৃতিজগতের সৃষ্টি'। কাজেই এখানে 'অলৌকিক শক্তি-সত্তা' সন্দেহাতীতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত সত্যের মর্যাদা পায়।

বিগ ব্যাংগ প্রবর্তক বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের সৃষ্টিকে চারটি পর্যায়কালে ভাগ করেন। প্রথম পর্যায়কালের নাম 'হাড্রনিক ইরা বা প্লাঙ্ক টাইম' যার বিস্তৃতি ছিল অনুপম বিন্দুর ০ সময় থেকে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ডের এই মহাসূক্ষ্ম সময় পর্যন্ত। এ সময় বিচিত্র অবস্থার আদি অগ্নিগোলকটির পদার্থ এবং শক্তিসমূহ এমনভাবে একীভূত ছিল যে তাদেরকে পৃথকভাবে চেনার কোনো উপায় ছিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়কালের নাম 'লেপটনিক ইরা' যার বিস্তৃতি প্লাঙ্ক টাইমের পর থেকে ১০ম সেকেন্ড পর্যন্ত। ক্ষুদ্র এই ইরায় অভিকর্ষ বল, দুর্বল মিথস্ক্রিয়া, বিদ্যুৎ-চৌম্বক মিথস্ক্রিয়া এবং সবল মিথস্ক্রিয়া, এ মৌলিক বলগুলো নিজস্ব সত্তা নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ে এবং বস্তুর ক্ষুদ্র কণা কোয়ার্কের আবির্ভাব ঘটে।

তৃতীয় পর্যায়কালটি হচ্ছে 'রেডিয়েটিভ ইরা' যার সময়কাল ছিল ১১তম সেকেন্ড থেকে ১০ লক্ষ বছর পর্যন্ত। মহাবিস্ফোরণের পর থেকে গ্লোবাকারে মহাসম্প্রসারণের সাথে সাথে এ মহাবিশ্ব ক্রমেই বস্তুঘনত্ব, তাপমাত্রা এবং

www.pathagar.com

ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে চলেছে বা পাতলা হচ্ছে। রেডিয়েটিভ ইরায় যখন আলোর ঘনত্ব পদার্থের ঘনত্বের চাইতেও বেশি তখন বিকিরণশক্তি থেকে পদার্থ এবং পদার্থ থেকে বিকিরণশক্তি এভাবে যুগপৎ তৈরী হতো। এ সময় বস্তু এবং বিকিরণশক্তি ছিল সমান সমান এবং তাপমাত্রা ছিল ১০,০০০ কেলভিন। এ ইরায় সর্ব প্রথম প্রোটন ও ইলেকট্রন মিলে হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি করে এবং বেশিরভাগ শক্তি পদার্থে আটকা পড়ে যায়, আর অবশিষ্ট কমভাগ শক্তি বিকিরণ হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে মহাবিশ্বের সর্বত্র।

চতুর্থ পর্যায়কাল 'স্টৈলর ইরা' শুরু হয় রেডিয়েটিভ ইরার পর যখন মহাবিশ্বের বয়স দশ লক্ষ বছর পেরিয়ে যায় তখন থেকে, আর আজ পর্যন্ত ১৫শ কোটি বছর ধরে তা চলছে। স্টৈলর ইরায় মহাবিশ্বের মহাবিস্তৃত গ্যাসীয় হাইড্রোজেন পরমাণুসমৃদ্ধ ধুমায়িত বস্তুসম্ভারের মাঝে অসংখ্য সূক্ষ্ম ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং দলগতভাবে গুচ্ছায়িত হয়ে গ্যালাক্সিগুচ্ছ থেকে শুরু করে গ্যালাক্সি, উপ-গ্যালাক্সি, নিহারিকা ও নক্ষত্রসমূহ অসম এবং অতিশয় বৃহৎ বৃহৎ আকার নিয়ে বিক্ষিপ্ত আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘমালার অবকাঠামো সৃষ্টি করে। ঘনশীতল আন্তঃনাক্ষত্রিক কুরুটিকার তাপমাত্রা যখন ৫-১০ কেলভিনে উপনীত হয় তখন হাইড্রোজেন অণুর গঠন নিয়ে বিরাজ করে। কোনো এক সময় উক্ত মেঘপিণ্ডে অভিকর্ষ বলের প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং অভিকর্ষের মহাটানে মেঘমালার বাইরের অংশ কেন্দ্রমুখী পতন-পাত শুরু করে।

এ অভিকর্ষ পতন-পাতের জন্য একটি গ্যালাক্সিগুচ্ছে কয়েকটি হতে কয়েক সহস্র গ্যালাক্সি-ভর এবং একটি ব্যক্তি-গ্যালাক্সিতে কয়েক হাজার থেকে কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্র-ভর থাকতে হবে এবং একটি নক্ষত্রে কমপক্ষে একটি সৌরভের গ্যাসমেঘকে ৮.১ আলোকবর্ষের কম ব্যাস গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, গ্যালাক্সির বিশাল গণ্ডির বাইরে এককভাবে কোনো অবস্থাতেই একটি ব্যক্তি-নক্ষত্র সৃষ্টি হয় না বরং একটি বিশাল গুচ্ছের মধ্যেই তা তৈরি হয়।

অন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসমেঘপিণ্ডের অভিকর্ষ বলের প্রভাবে কেন্দ্রমুখী পতন-পাতের ফলে মহাসংকোচন জনিত কারণে প্রচণ্ড তাপমাত্রায় যখন পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে হাইড্রোজেন জ্বলতে শুরু করে তখন সেটা এক নব-নক্ষত্র বা প্রোটোস্টার-এ পরিণত হয়। নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থিত হাইড্রোজেন বহুকাল ধরে জ্বলে জ্বলে হিলিয়ামে পরিণত হয় এবং বাইরের দিকে সম্প্রসারিত হয়ে কেন্দ্রে শূন্যতার সৃষ্টি করে। ফলে নক্ষত্রের বাহিরের অংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পুনর্বার কেন্দ্রমুখী ধ্বংস-পতনের শুরু হয় এবং অকল্পনীয় তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়। এ তাপমাত্রায় হিলিয়াম বিগলিত হয়ে কার্বন সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

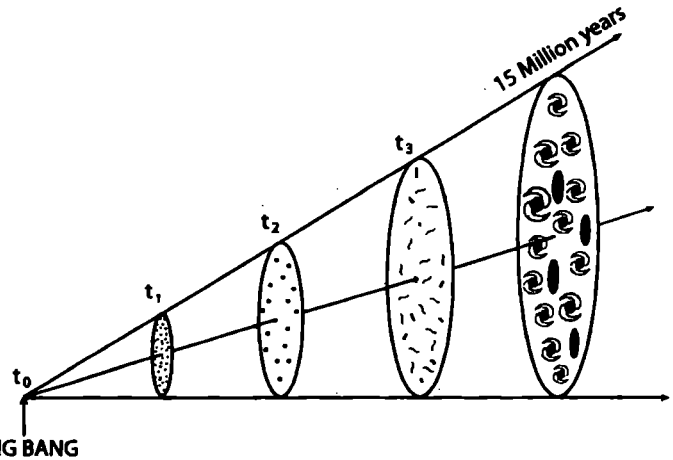

চিত্রঃ মহা বিস্ফোরণের পর সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব।

সৌরভরের দশগুণ বা তার চাইতে বড় বড় নক্ষত্রগুলোতে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে কার্বন বিগলিত হয়ে ম্যাগনেসিয়াম সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে বার বার উল্লিখিত ধংস-পতন প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ম্যাগনেসিয়াম থেকে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আরও বহুবিধ নতুন নতুন মৌলের সৃষ্টি হয়। এভাবে পারমাণবিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সর্বশেষ পর্যায়ে নক্ষত্র শিথিতে সৃষ্টি হয় লৌহ মৌলের। লৌহ মৌলের পারমাণবিক বিগলনে উত্তাপ বিকরিত হওয়ার পরিবর্তে তা শোষণ করে নেয়। ফলে আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণের পরিবর্তে নক্ষত্রের বাইরের অংশ বস্তুভর জনিত অভিকর্ষবলের তারনায় প্রচণ্ড চাপে লৌহ শিথিতে আছড়ে পড়ায় নক্ষত্র শিথি শেষ বারের মত প্রজ্জ্বলিত হয়ে অত্যন্ত তীব্রদানবিক সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটায়। অকল্পনীয় এ বিস্ফোরণের তীব্রতায় নক্ষত্রের মৌল-যৌগ বস্তুসম্ভার উৎক্ষিপ্ত হয়ে প্রচণ্ড গতিতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে পড়ে মহাশূন্যে। এ নিক্ষিপ্ত ছুটন্ত বস্তুপিণ্ডগুলো অন্য কোনো সৌর পর্যায়ের নক্ষত্রের প্রভাবমণ্ডলে প্রবেশ করলে নক্ষত্রের অভিকর্ষ বল যদি তাদেরকে নিজের আয়ত্তে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হয় তবে তারা সেই নক্ষত্রের পরিবারভুক্ত গ্রহ-উপগ্রহ হিসেবে জীবন চক্রে কালপাত শুরু করে। প্রাণবন্ত এ পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের সকল গ্রহ-উপগ্রহ এমনি কোন সুপারনোভা বিস্ফোরণেরই ফসল বলে ধারণা করেন বিজ্ঞানীরা।

এখানে আমরা বলতে পারি বিজ্ঞান যখন সৃষ্টিকাল ভাগ করতে শিখেছে বিংশ শতাব্দির শেষ দিকে, তখন কুরআন তার প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে

www.pathagar.com

ঘোর অজ্ঞতার যুগে সৃষ্টির পর্যায়কাল সুন্দরভাবে ভাগ করে রেখেছে নিখুঁত সত্যতার সাথে। যে কাল পর্যায়ের বিভাজন চরিত্রের ভিত্তিতে বিজ্ঞান বাইবেলকে প্রত্যাখ্যান করে, সেই কাল পর্যায়গুলোর বিবেচনায় বিজ্ঞান আজ কুরআনকে শিরে ধারণ করার অপেক্ষায়। সে দিন হয়তো বেশি দূরে নয়।

"অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর এবং আমিও প্রতীক্ষা করছি" (সূরা ইউনুস ঃ ২০)।

এখানে বলা যায়, ইসলাম আজ আর শুধুমাত্র মিছেমিছি ভীতি প্রদর্শনের বা আবেগ সৃষ্টিকারী অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম নয়। শুধুমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের ধারণা কাটিয়ে ইসলাম আজ যৌক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যে' রূপ নিয়েছে। এছাড়া দোদুল্য মনের লোকেরা মনে করেন আধুনিক বিজ্ঞান-সূত্রের বিষয় কুরআনে উল্লেখ থাকলে কুরআন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না, ফলতঃ তারাও দোদুল্যমানতা কাটিয়ে দৃঢ়-বিশ্বাসী হতে পারেন।

সৃষ্টিজগতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে মহাবিশ্বের সর্বত্রই এক সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবস্থা বিদ্যমান। যেমন-গ্রহ-উপগ্রহ, সৌরজগত, নিহারিকা, উপ-গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সি ইত্যাদি। আমরা যখন মহাকাশের দিকে লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র। কতকগুলো গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে গঠিত হয় একটি সৌরজগত, হাজার হাজার সৌরজগত নিয়ে গঠিত হয় একটি নিহারিকাজগত, এরূপ বহু নিহারিকাজগত নিয়ে গঠিত হয় গ্যালাক্সি জগত, কতকগুলো গ্যালাক্সিজগত নিয়ে গঠিত হয় গ্যালাক্সিগুচ্ছ, এরূপ কোটি কোটি গ্যালাক্সিগুচ্ছ নিয়ে এ সৃষ্টিজগত গঠিত।

আবার যদি আমরা পদার্থ বা বস্তুর দিকে লক্ষ্য করি সেখানেও আমরা দেখতে পাই এ সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক কাঠামোর বিচিত্র খেলা। আমরা যে কোনো বস্তুকে ভাঙ্গালে পাব 'অণু' অণুকে ভাঙ্গালে পাব 'পরমাণু' পরমাণুকে ভাঙ্গালে পাব 'নিউট্রন-প্রোটন'। নিউট্রন প্রোটনকে ভাঙ্গালে পাব 'রশ্মি' (আলফা, বিটা, গামা-রে), এ রশ্মিকে ভাঙ্গালে পাব 'শক্তি'। এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক বন্ধনে গড়ে উঠা সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের মূলে দৃশ্যত যে শক্তিটি কাজ করে তা হচ্ছে অভিকর্ষ বল। এ অভিকর্ষ বলের প্রভাবেই বস্তুজগতে সাংগঠনিক বন্ধন বিদ্যমান।

অসীম আকাশে সম্প্রসারণের নেশায় ছুটে চলা কোটি কোটি গ্রহের মধ্যে পৃথিবী নামক প্রাণবন্ত একটি গ্রহের বাসিন্দা হয়ে আমরা ছুটে চলেছি অসীম অজানায়। কত গতিতে কোন দিকে আমরা ছুটে চলেছি কিছুই জানি না। শুধু জানি পৃথিবী প্রতি ২৪ ঘন্টায় আপন কেন্দ্রে এক বার ঘুরপাক খেতে খেতে

www.pathagar.com

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে প্রতি সেকেণ্ডে ২৯.৮ কিলোমিটার গতিতে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে ঊর্ধ্ব গতিতে চলতে চলতে আমাদের এ মাতৃ গ্যালাক্সি ছুটে চলেছে প্রতি সেকেন্ডে ২৪০০০ মাইল গতিতে।

ইডুইন হাবেলের বিংশ শতাব্দির (১৯২৪) যুগান্তকারী আবিষ্কারের ধারায় বিজ্ঞান আমাদেরকে জানিয়ে দিল যে, মহাবিশ্বে গ্যালাক্সির নূন্যতম সংখ্যা ১০০ কোটি। সমস্ত মহাবিশ্বের এই গ্যালাক্সিসমূহ আবার দলগতভাবে গুচ্ছায়িত। প্রতিটি গুচ্ছ কয়েকটি হতে কয়েক হাজার উপ-গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সি নিয়ে একটি গ্যালাক্সি দল তৈরি করে। আমাদের গ্যালাক্সিগুচ্ছের গ্যালাক্সি সংখ্যা মাত্র ২০টি। গ্যালাক্সিগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্যালাক্সির গড় দূরত্ব প্রায় সাড়েছয় লক্ষ আলোকবর্ষ। প্রতিটি গ্যালাক্সিগুচ্ছ পরস্পর থেকে প্রায় ৩৩ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থান করে। উল্লেখ্য, আলোকবর্ষ কোনো সময়ের পরিমাপ নয়, বরং দূরত্বের পরিমাপ। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। আলোর গতিতে ১ বৎসরে যে দূরত্ব অতিক্রম করা যায় তাকে ১ আলোকবর্ষ বলে। সুতরাং

১ আলোকবর্ষ = ১,৮৬,০০০ × ৬০সেঃ × ৬০মিঃ × ২৪ঘন্টা ৩৬৫.২৫দিন = ৫৮৬৯৭১৩৬০০০০০ মাইল।

বস্তুত আমরা যা কিছু দেখতে পাই তা সকলই শুধু একটি মাত্র গ্যালাক্সি, যা আমাদের ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের এই গ্যালাক্সির ব্যাস ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। সূর্য আমাদের গ্যালাক্সির মধ্যে একটি অনুল্লেখযোগ্য নক্ষত্র। যা গ্যালাক্সিকেন্দ্র হতে প্রায় ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূর সীমানায় অবস্থিত। এ পর্যন্ত দৃশ্য গ্যালাক্সির জানা সংখ্যা এক'শ কোটি। আর প্রতিটি গ্যালাক্সিতে গড় নক্ষত্র সংখ্যা ১০ হাজার কোটি এবং এ সংখ্যা বিজ্ঞানীদের ধারণায় সমস্ত মহাবিশ্বের ১০০ ভাগের ১০ ভাগ মাত্র।

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী-গ্যালাক্সি 'এ্যান্ড্রোমিডা' প্রায় ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। যা আমাদের গ্যালাক্সির প্রায় দেড়গুণ বড়। এর ব্যাস প্রায় দেড়লক্ষ আলোকবর্ষ। এ গ্যালাক্সির নক্ষত্র সংখ্যা ত্রিশ হাজার কোটি, যা আমাদের গ্যালাক্সির তিনগুণ। "আসমানসমূহ এবং যমীনের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই" (সূরা আন নাহল ঃ ৭৭)।

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, মূলত সৃষ্টির সূচনায় স্থান-কালের একটি 'অনুপম বিন্দুতে' মহাবিশ্বের সকল ভর ও শক্তি জড়ো হয়ে সীমাহীন বস্তু ঘনত্বের ফলে মহাবিস্ফোরণ থেকে এ মহাসম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সৃষ্টি। যেহেতু অনুপম বিন্দুতে সৃষ্টির সূচনা, সেহেতু অনুপম বিন্দু-পূর্ববর্তী ঘটনা

www.pathagar.com

অবশ্যই প্রকৃতি বা সৃষ্টির উর্ধ্বে থাকে, ফলে প্রচলিত ভাষায় সেই ঘটনার কার্যকরী নাম হতে পারে সৃষ্টিকর্তা। আর সৃষ্টিকর্তা যদি 'অনুপম বিন্দু'-পূর্ববর্তী ঘটনা হয় তাহলে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে তার স্বাধীনতা সুপ্রচুর বা অসীম। এ ক্ষেত্রে স্রষ্টা হিসেবে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা ইসলাম ধর্মে বর্ণিত আল্লাহর ক্ষমতার মতই হয়।

সৃষ্টির রহস্য খুঁজেই স্রষ্টার অস্তিত্ব অন্তরে বদ্ধমূল হয়। এখানে বিজ্ঞান স্বীকার করতে বাধ্য হয়, আল্লাহ আছেন। মিথ্যা আত্মবিশ্বাসের স্থান কুরআনে নেই' এ কথা আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যতই বাড়বে কুরআনের কাছে বিজ্ঞানের নতজানু-ভিক্ষার হাত ততই প্রসারিত হবে।

সৌরজগত ও মাধ্যাকর্ষণ

আমরা বিভিন্ন বই-পুস্তকে সৌরজগতের চিত্র দেখেছি। কিন্তু বাস্তব সৌরজগতের একটা আনুপাতিক চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা কোনভাবেই বই-পুস্তকে আঁকা সম্ভব নয়। কারণ বাস্তব সৌরজগতের একটা আনুপাতিক চিত্রে যদি আমরা সূর্যের ব্যাস ধরি ৩ ফুট তাহলে সূর্য থেকে ১০২ ফুট দূরে বুধের ব্যাস হবে ৩ মিলিমিটার (মসুর ডালের সমান), আর ২০২ ফুট দূরে শুক্রের ব্যাস হবে ৭.৫৮ মিলিমিটার (টিকটিকির ডিমের সমান), ৩০০ ফুট দূরে পৃথিবীর ব্যাস ৭.৮ মিলিমিটার, আর ৪৭০ ফুট দূরে মঙ্গলের ব্যাস ৪.২ মিলিমিটার, ১৬০০ ফুট দূরে বৃহস্পতির ব্যাস ৩.৫ ইঞ্চি, ১০০০ গজ দূরে শনির ব্যাস হবে ২.৮৯ ইঞ্চি (টেনিস বলের সমান), ১.১৩ মাইল দূরে ইউরেনাসের ব্যাস ১.২৬ ইঞ্চি (পিংপং বলের সমান), ১.৭৭ মাইল দূরে নেপচুনের ব্যাস ১.২২ ইঞ্চি এবং ২.২৭ মাইল দূরে প্লুটোর ব্যাস হবে ১.৪ মিলিমিটার (সরিষার দানার সমান)। কার্যত এ গ্রহগুলো প্রত্যেকেই সূর্যকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তাকারে বিভিন্ন দিকে আবর্তন করে।

সৃষ্টি জগতের নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ সবকিছুই গ্লোবাকৃতি। এমন কি এদের সংগঠন অর্থাৎ সৌরজগত, নিহারিকা, গ্যালাক্সি সবকিছুই গ্লোবাকৃতির। মহাশূন্যে এদের দিক বা উপর-নিচ বলে কিছু নেই। অভিকর্ষের ফলে ব্যক্তি গ্রহ-নক্ষত্রে উপর-নিচ অনুভূত হয়। যেমন-আমাদের পৃথিবী থেকে চাঁদকে উপর দিকে আবার চাঁদ থেকে পৃথিবীকে উপর দিকে দেখা যাবে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদের মানুষকে পৃথিবীর দিকে ঝুলে থাকতে দেখা যাবে

www.pathagar.com

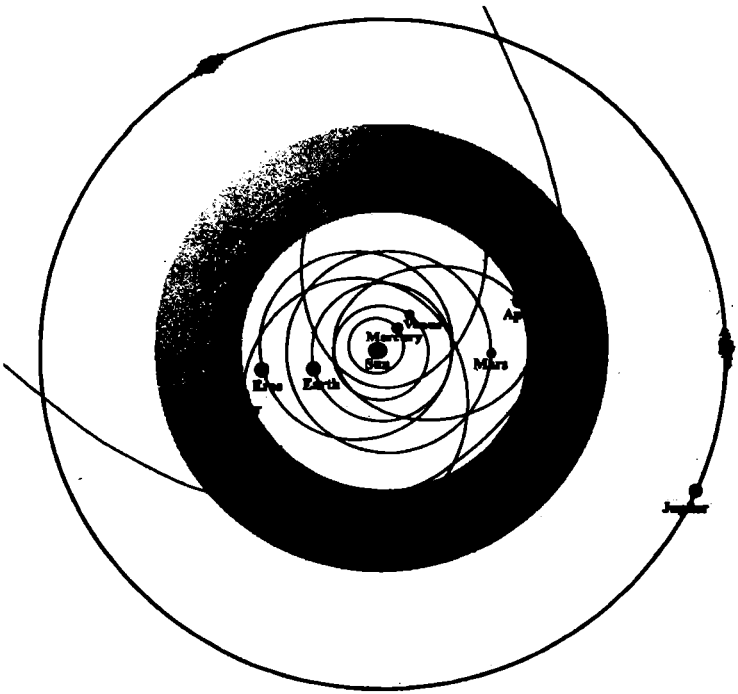

সৌরজগতে গ্রহগুলি উপবৃত্তাকারে বিভিন্ন দিকে ঘোরে।

(যদি দেখা সম্ভব হয়) এবং চাঁদ থেকে পৃথিবীর মানুষকে চাঁদের দিকে ঝুলে থাকতে দেখা যাবে (যদি দেখা সম্ভব হয়)। চাঁদের মধ্যাকর্ষণের ফলে চাঁদের মানুষ চাঁদের কেন্দ্রের দিকে নিচের দিক এবং পৃথিবীর দিকে উপর দিক অনুভব করে। অনুরূপ পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে নিচের দিক এবং চাঁদের দিকে উপর দিক অনুভব করে।

যেহেতু পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিককে নিচ দিক এবং তার বাইরের দিককে উপর দিক অনুভব হয় সেহেতু পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তার বর্হিগাত্রে লেগে থাকে। যদি কোন বস্তুকে পৃথিবীর বাইর দিকে ছুঁড়ে দেয়া হয় তবে সেটা মধ্যাকর্ষণের ফলে আবার পৃথিবীগাত্রেই ফিরে আসে।

সহজ করে বলতে গেলে বলা যায়, গ্লোবাকার পৃথিবীর এশিয়া মহাদেশের ঠিক বিপরীত দিকে আমেরিকা মহাদেশ। এশিয়ার মানুষ তাদের অবস্থান থেকে ভাবছে আমরা পৃথিবীর উপরের দিকে দাঁড়িয়ে আছি আর আমেরিকার মানুষগুলো পৃথিবীর নিচের দিকে ঝুলে আছে, হয়তো বা তারা তাদের সব

www.pathagar.com

কিছু নিয়ে নিচের দিকে পড়ে যেতে পারে। অপর দিকে আমেরিকার মানুষ তাদের অবস্থান থেকে ভাবছে একই কথা। কিন্তু না কেউই পড়বে না, এর কারণ খুঁজতে গিয়েই বিজ্ঞানী নিউটন 'মধ্যাকর্ষণ' শক্তির সূত্র-কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন।

আরোও সহজ করে বলা যায়, যদি কোনো মানুষ পৃথিবী থেকে মধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে চাঁদের দিকে যাত্রা শুরু করে তাহলে যতক্ষণ সে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে থাকবে ততক্ষণ সে পৃথিবীর দিকে নিচ দিক ও চাঁদের দিকে উপর দিক মনে করবে। যখন সে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি পার হয়ে যাবে তখন আর সে উপর নিচ কিছুই অনুভব করতে পারবে না। আবার যখন সে চাঁদের মধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে পৌঁছে যাবে তখন সে চাঁদের দিকে নিচ দিক এবং পৃথিবীর দিকে উপর দিক অনুভব করবে।

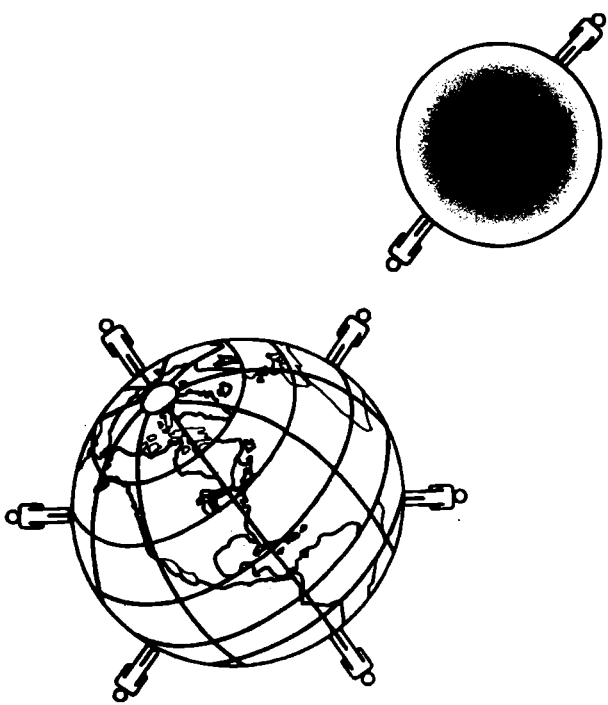

পৃথিবী থেকে চাঁদের মানুষ এবং চাঁদ থেকে পৃথিবীর মানুষ ঠিক এরূপ দেখা যাবে।

www.pathagar.com

প্রাণের জন্য পৃথিবীর সমন্বয় ব্যবস্থা

অনেক মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ন করতে জানে না। আমাদের এই সবুজ শ্যামল প্রাণময় পৃথিবীটা সৌর পরিবারেরই একটা সদস্য-গ্রহ। এরূপ প্রাণসমৃদ্ধ আর কোনো গ্রহ সৃষ্টিজগতের আর কোথাও আছে কিনা তা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে মাঝে-মধ্যে আলোচনার ঝড় বয়ে যায়। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেছেন, সৃষ্টিজগতে আমাদের পৃথিবীর মত জীবনসমৃদ্ধ আরও হাজার হাজার গ্রহ আছে। তবে কোথায় আছে বা আদৌ আছে কিনা আজও তা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে আল কুরআনের ইঙ্গিত হচ্ছে, "আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং অনুরূপ সংখ্যায় জমিন; তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় তাঁর বিধান, যেন তারা জ্ঞাত হতে পারে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, আর সব কিছুই আল্লাহর জ্ঞানে বেষ্টিত" (সূরা আত তালাক ঃ ১২)। "যারা আসমানসমূহে ও যমীনে আছে তাদেরকে তোমার রব ভালো করেই জানেন (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৫)। উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষ বা আরও বুদ্ধিমান জীবসহ পৃথিবীর মত প্রাণবন্ত আরও গ্রহ থাকার আভাস মেলে।

অসীমশক্তি কর্তৃক সৃষ্ট এ মহাবিশ্বে আমাদের পৃথিবীর মত প্রাণবন্ত আরও গ্রহ থাকার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। আল কুরআন এ সম্ভাবনাকে অস্বীকারও করেনি। তবে এরকম একটি প্রাণবন্ত পৃথিবী সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়ে সে ক্ষেত্রে একজন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানময় মহাপরিকল্পক সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকে না। এখানে আমরা সবুজ-শ্যামল সুন্দর এ পৃথিবীর প্রাণময়তার সমন্বয়গুলো দেখব।

পৃথিবীর আয়তন, ভর, মধ্যাকর্ষণ, ট্রপোস্ফেয়ার, ম্যাগনেটোস্ফেয়ার, অবস্থান, বায়ুরস্তর, জলীয়বাষ্প, অক্ষগতি, কক্ষগতি, জল ও স্থল ভাগের আয়তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সমন্বয় দেখা যায় তার সামান্য ব্যতিক্রম সুন্দর এ পৃথিবীর প্রাণময়তাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে।

পৃথিবী যদি বর্তমান আয়তনের অর্ধেক হত তবে এর মধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেকাংশে হ্রাস পেত। ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় পানিকে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ত। পৃথিবী পৃষ্ঠের সমুদয় পানির মজুদ অতিদ্রুত নিঃশেষ হয়ে পড়ত। বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্পমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী তার তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলত। দিনের বেলায় ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে গিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং রাতের বেলায় উত্তপ্ত ভূ-পৃষ্ঠ অতিদ্রুত ঠাণ্ডা

www.pathagar.com

হয়ে হিমাঙ্কে পৌছে যেত। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে পৃথিবীর জীবন সংরক্ষণ ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যেত।

আবার পৃথিবী বর্তমান আয়তনের দ্বিগুণ হলে মাধ্যাকর্ষণ বল দ্বিগুণ হত। ফলে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা অধিক মাত্রায় হ্রাস পেয়ে প্রতিদিন পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে প্রচন্ড গতিতে ছুটে আসা প্রায় ২০ লক্ষ উল্কাপিণ্ডকে সুযোগ করে দিত ভূপৃষ্ঠে প্রচণ্ড বেগে আঘাত হেনে জীবজগৎকে স্তব্ধ করার। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প হ্রাস পেয়ে প্রয়োজনের অধিক জীবনঘাতী অতিবেগুনী রশ্মিকে স্বাগত জানাত জীবনকে উপহাস করতে। ভূ-পৃষ্ঠের শীতপ্রধান অঞ্চলের বৃদ্ধিতে আবাসযোগ্য অঞ্চল হয়ে পড়ত সংকোচিত। আবার পৃথিবীর আকার ঠিক থেকে শুধু ভর অধিক হারে বৃদ্ধি হলেও মাধ্যাকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়ে একই অবস্থা দেখা দিত।

পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থলের পরিবর্তে সাড়ে তিন ভাগ জল ও আধা ভাগ স্থল হলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে সূর্যের ইনফ্রারেড রশ্মির জীবন রক্ষাকারী মাত্রাকে কমিয়ে দিত। পরিণতিতে জীবজগত নিঃশেষ হয়ে যেত। তদোপরি অতি বৃষ্টির ফলে সর্বদা বন্যা বিপর্যয় লেগে থাকত। অপর পক্ষে জল এবং স্থল ভাগ সমান সমান হলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে সূর্যের ইনফ্রারেড রশ্মির জীবন রক্ষাকারী মাত্রা বৃদ্ধি হত, ফলে তা হয়ে পড়ত জীবনঘাতী। তার উপর অনাবৃষ্টির ফলে দীর্ঘ খরা বিপর্যয় দেখা দিত।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ২০.৬ ভাগ অক্সিজেন, ৭৭.১৬ ভাগ নাইট্রোজেন, ১.৪০ ভাগ জলীয় বাষ্প, ০.০৪ ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং ০.০৮ ভাগ নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে। বায়ুমণ্ডলের এ মিশ্র উপাদানগুলোর ভাগ উল্লেখযোগ্য হারে কম-বেশি হলেই প্রাণের চিহ্ন মুছে যেতে পারত সুন্দর এ পৃথিবী থেকে। এ ছাড়া পৃথিবীতে প্রাপ্ত ১০৯টি মৌলিক পদার্থের অনুপাত উল্লেখযোগ্য হারে পরিবর্তন হলেও পৃথিবীটা নিঃপ্রাণ হওয়ার অসংখ্য কারণ সৃষ্টি হত।

আমরা জানি পৃথিবীর কেন্দ্রভাগের তাপমাত্রা ৫০০০°সেঃ এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র আড়াই মাইল গভীরতায় তাপমাত্রা প্রায় ২১০০ ফাঃ। ভূ-কেন্দ্রের উপাদান ঠিক রেখে আট হাজার মাইল ব্যাসের এ গ্লোবাকৃতির পৃথিবীটা মাত্র পাঁচ মাইল ছোট হলে পানির স্ফুটনাংক মাত্রায় দাঁড়িয়ে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে দেখার জন্য আর কেউ অবশিষ্ট রইত না। এমনি বহুবিধ সময়ের আশীর্বাদের মাঝে টিকে থাকা এ সবুজ শ্যামল প্রাণময় পৃথিবীই বলে দেয় সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে এক মহাকুশলীর হাত কার্যকর। বৈজ্ঞানিক ফ্রেডকিন বলেন–"এ মহাবিশ্ব একটি বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ-অসীম জ্ঞানের ফসল"।

www.pathagar.com

স্বঘোষিত নাস্তিক বুদ্ধিজীবিদের তৃপ্তিদায়ক চিন্তা-চেতনা হচ্ছে, সৃষ্টিজগতের কোনো স্রষ্টা নেই। এটা একটা দুর্ঘটনামাত্র এবং সবকিছুই করণের ফল। বুদ্ধিজীবিরা নিজেরদেরকে অতিজ্ঞানী-সর্বজান্তা মনে করায় স্রষ্টার কাছে মাথা নত করতে চায় না। অথচ তারা এ সামান্য কথাটা বুঝে না যে 'মানুষ অতি সামান্য ব্যতীত অনেক কিছুই জানে না'। বিন্দুবত জ্ঞানের অধিকারী বুদ্ধি জীবিরা জানে না যে তাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে মহাজ্ঞান-সমুদ্রের সবটাই তাদের কাছে অন্ধকার। বুদ্ধিজীবিদের জ্ঞানকে বিন্দুবত বললাম এ কারণে যে, এক মাইক্রোগ্রাম লবণের তথ্য ধারণ ক্ষমতা প্রায় এক হাজার পূর্ণ ব্যবহার মস্তিষ্কের চাইতেও অনেক বেশি।

পৃথিবীটা কোনভাবেই দুর্ঘটনার ফসল হতে পারে না। দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে যা হয় তা কখনও মানুষের গ্রহণযোগ্য হয় না। আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা সবই পূর্ব পরিকল্পিত। যেমন–হাজার হাজার বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে শুধু ধ্বংসই হয়, তা থেকে জামায় লাগানোর মত একটা বোতাম কিংবা জুতায় মারার মত একটা কাঁটাও সৃষ্টি হয় না। কাজেই একটি মাছির ডানা সৃষ্টির জন্য একজন মহা-পরিকল্পনাকারীর উপস্থিতিকে স্বীকার করতেই হয়। ছাপাখানায় রকেট হামলা চালানোর ফলে মনোরম প্রচ্ছদে সুন্দর একটা নাস্তিক্যবাদী উপন্যাস বেরিয়ে আসা যতটা সহজ, দুর্ঘটনার ফলে লক্ষ-কোটি সমন্বয় ঘেরা এরূপ সুন্দর একটা প্রাণবন্ত পৃথিবী সৃষ্টি হওয়া তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি কঠিন। "রহমানের সৃষ্টিতে কোনো ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না" (সূরা আল মুল্‌ক ঃ ৩)। "আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি যথাযথ পরিমাণে" (সূরা আল ক্বামার ঃ ৪৯)। "আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই, এটা এক মহা সাফল্য" (সূরা ইউনুস ঃ ৬৪)। কুরআনের ভাবগম্ভীর্যতা, উচ্চাঙ্গতা, তথ্যের বিশুদ্ধতা ও প্রমাণিত উপাত্তের আলোকে বলা যায় কুরআনই বিজ্ঞান।

দিবারাত্রির পরিবর্তনে আল্লাহর নিদর্শন

আল কুরআনে দিবা রাত্রির পরিবর্তনের ন্যায় একটা অতি সাধারণ বিষয়ের প্রতি আল্লাহ গুরুত্বসহ চিন্তাশীল মানব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, "..... আল্লাহ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত স্ববিস্তারে বর্ণনা করেন। দিন-রাত্রির পরিবর্তনে এবং আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টিতে নিদর্শন রয়েছে আল্লাহভীরু (চিন্তাশীল) সম্প্রদায়ের জন্য"

www.pathagar.com

(সূরা ইউনুস ঃ ৫-৬)। এখানে ভেবে দেখা প্রয়োজন কি এমন গুরুরহস্য থাকতে পারে দিন-রাত্রির পরিবর্তনের মত এমন একটি অতি সাধারণ বিষয়ে, যেখানে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে ?

আমরা জানি পৃথিবীর দুটি গতি একটি আহ্নিক গতি এবং অপরটি বার্ষিক গতি। পৃথিবী প্রতি ২৩ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরপাক খেয়ে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন ঘটায়। পৃথিবীর এ গতিকে অক্ষগতি বা আহ্নিক গতি বলে। আবার ৩৬৫.৩ দিনে পৃথিবী একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর এ গতিকে বলা হয় বার্ষিক গতি বা কক্ষ গতি।

এখানে দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আহ্নিক গতি। কারণ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের কাছে ২৩.৯৪ ঘন্টার এ আহ্নিক গতির গুরুত্ব অপরিসীম। চিন্তাশীল সম্প্রদায় শিহরিত হয় নিকটবর্তী গ্রহগুলোর কথা ভেবে, শিহরিত হয় সুন্দর চাঁদটির কথা ভেবে। পৃথিবীর অক্ষগতি বা দিবা রাত্রির পরিবর্তনের সাথে এ সকল গ্রহ-উপগ্রহের অক্ষ গতির বিড়ম্বনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীর পার্শ্ববর্তী শুক্রগ্রহে ৫৮৩২.৪৮ ঘন্টায় এক বার দিবা-রাত্রি হয়। ফলে সেখানে দিনের তাপমাত্রা ৪৮০° সে. এবং রাতের তাপমাত্রা হয়–৩৩° সে.। এখানে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য দাঁড়ায় ৫১৩° সেঃ, যেখানে পৃথিবীর দিন-রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য হয় প্রায় ১০° সে. থেকে ২০°সে. মাত্র ।

আবার সূর্যের অতি নিকটবর্তী বুধ গ্রহে দিবা-রাত্রি হয় ১৪০৭.৬ ঘন্টায় ফলে এর দিনের তাপমাত্রা ৩৫০° সেঃ এবং রাতের তাপমাত্রা হয়-১৭০°সেঃ। এখানে দিবা-রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য দাঁড়ায় ৫২০°সেঃ। এ ধরনের প্রাণঘাতী তাপমাত্রায় জীবনের উন্মেষ ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই শূন্য।

এদিকে পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ পৃথিবীর গতির সাথে সন্তরণশীল থেকেও তার অক্ষগতি না থাকায় আজন্ম এক পৃষ্ঠে দিন ও অপর পৃষ্ঠে রাত বিরাজ করে। ফলে চাঁদের সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১১৭°সেঃ এবং আঁধার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা –১৬৩°সেঃ, কাজেই এখানে জীবের জন্ম একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীর এ সকল প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহ অক্ষগতির কারণে দিবা ও রাত্রির উভয় প্রকার তাপমাত্রা জীবনের কল্পনাকে উপহাসের সাথে ম্লান করে দেয়। আর এ কারণেই আল কুরআনে আল্লাহ দিন রাত্রির পরিবর্তনে ও আসমান জমিনের সমস্ত সৃষ্টিতে চিন্তাশীল আল্লাহভীরুদের জন্য নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন।

এবার যদি সূর্য থেকে পৃথিবীর চেয়ে একটু দূরবর্তী মঙ্গল গ্রহের কথা বলি, সেখানে দিবা-রাত্রি পৃথিবীর প্রায় সমান হওয়া সত্ত্বেও তার দিনের

www.pathagar.com

৩১°সেঃ তাপমাত্রা জীবনের স্পন্দনকে অনুমোদন করলেও মাত্র ১২ ঘন্টার মাথায় রাতের–৮৬° সেঃ তাপমাত্রা তাকে আবার নাকোচ করে দেয় হিমাঙ্কের প্রচণ্ডতায়।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি মঙ্গল বা অন্য কোনো গ্রহের কক্ষ থেকে পৃথিবীর ২৪ ঘন্টার অক্ষগতি হলেও চলবে না, আবার পৃথিবীর কক্ষে থেকে অন্য গ্রহের মত অক্ষগতি হলেও চলবে না। শুধু আর শুধু সুনির্দিষ্টভাবে পৃথিবীর জন্য নির্ধারিত কক্ষই সেই অক্ষগতি হতে হবে। এভাবে বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ এবং চাঁদ আমাদেরকে জানিয়ে দেয়–"তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি পৃথিবীকে করেছেন প্রতিরোধী-নিরাপদ-ভারসাম্যপূর্ণ-আবাসযোগ্য-সমতল -বিশ্রামস্থল" (সূরা আল মু'মিনঃ ৬৪)।

আশা করি সুধী পাঠকদের এখন আর বুঝতে বাকি রইল না কেন আল্লাহ পৃথিবীর আহ্নিক গতি বা দিবারাত্রির পরিবর্তন-পদ্ধতির প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বহু পূর্বে ঘোর অজ্ঞতার যুগে আল কুরআন পৃথিবীর এই দিবা-রাত্রির পরিবর্তনের গুরুত্ব উল্লেখ করেছে। আর হালে এসে বিজ্ঞানের আবিষ্কার তা প্রমাণ করে স্বীকৃতি দিল, যুক্তির দৃঢ়তায় "এটা সন্দেহ মুক্ত নির্ভুল গ্রন্থ" (সূরা আল বাকারা ঃ ২)। "রহমানের সৃষ্টিতে কোনো ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না; ভালোভাবে দেখ, কোনো খুঁত দেখতে পাও কি? আবার দেখ কোথাও কোনো ত্রুটি না পেয়ে ফিরে আসবে তোমার চোখ ব্যর্থ ও ক্লান্তভাবে" (সূরা আল মুলক ঃ ৩-৪)।

আল কুরআনে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন সংক্রান্ত আরও একটি অতি সাধারণ বা গুরুত্বহীন বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। বেশ কিছু আয়াতে দিনে জীবিকা অন্বেষণের পরিশ্রমের পর রাতে বিশ্রাম ও ঘুমানোর উল্লেখ রয়েছে। এমন সাধারণ বিষয়ের গুরুত্ব কতটুকু তা লক্ষ্য করা যায় অন্য দুটি আয়াতে। যেখানে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে, "বল তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, আল্লাহ যদি তোমাদের জন্য রাত্রিকে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য কে আছে যে, সে দিবালোক আনয়ন করতে পারে? তবু (কি তোমরা) শুনবে না?" (সূরা আল কাসাস ঃ ৭১)। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, "বল তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো উপাস্য আছে কি? যে, তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাতে সক্ষম; তবু কি তোমরা দেখবে না?" (সূরা আল কাসাস ঃ ৭২)।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে সূরা আল কাসাস ঃ ৭১ নং আয়াতে চিরকাল রাত্রি এবং সূরা আল কাসাস ঃ ৭২ নং আয়াতে চিরকাল দিবসকে স্থায়ী

www.pathagar.com

করার কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াত দুটোর পরিণাম তুষার ও তাপদগ্ধ মৃত্যুর ভয়াবহতার কথা বাদ রেখেও এখানে আমরা প্রস্তাব দুটোর চিরস্থায়ী দিবারাত্রির বাস্তবায়ন সম্ভবতার কথা বিবেচনায় আনতে পারি। এ আয়াত প্রস্তাবের বাস্তবতা সাধারণভাবে অসম্ভব মনে হলেও এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের অবস্থান বিবেচনা করলে। আমরা জানি চাঁদের অক্ষগতি নেই। চাঁদের মত পৃথিবীরও অক্ষগতি না থাকলে এর এক পৃষ্ঠে চিরকাল রাত্রি এবং অপর পৃষ্ঠে চিরকাল দিবস স্থায়ী থেকে যেত। ফলে এর দিবা পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ১১৭° সেঃ এবং রাত্রি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত প্রায় -১৬৩°সেঃ। উক্ত আয়াত প্রস্তাবের বাস্তবতা প্রমাণে এ একটি উপমাই যথেষ্ট।

আবার যদি পৃথিবীর উভয় পৃষ্ঠে একই সাথে দিবস অথবা রাত্রি স্থায়ী হওয়ার কথা বলা হয়, তা হলেও মহান স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যেই তার উপমা মেলে। বিজ্ঞানীরা আজ দেখতে পেয়েছেন, মহাবিশ্বে এমন কিছু গ্রহ আছে যার উভয় পার্শ্বে একাধিক নক্ষত্র (সূর্য) রয়েছে। সেখানে সর্বদা দিন স্থায়ী থাকে, কখনও রাত্রি ঘটে না। আবার অনেক গ্রহের কথা নাকচ করে দেয়া যায় না, যেখানে কোন নক্ষত্রের আলো পড়ে না, বা পড়লেও আলোর তীব্রতা এতই কম যে, তা রাতের চাঁদের আলোর চেয়েও কম। ফলে সেখানে সর্বদা রাত্রি স্থায়ী থাকে। আয়াত প্রস্তাবের সত্যতা প্রমাণের মধ্য দিয়ে এখানে প্রমাণ হয় কুরআনের ঐ দিবা-রাত্রি স্থায়ী করার চ্যালেঞ্জ বৈজ্ঞানিকভাবেই পৃথিবীবাসীর উপরও বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল। তদুপরি "আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করার অধিকারী"। এখানে তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা বলে থাকেন 'কুরআনে ভুল আছে বা কিছু কিছু ভুল থাকতে পারে'।

মহাবিশ্বের সমুদয় সৃষ্টি মানুষের কল্যাণে

এ পৃথিবীটা যেমনটি হওয়া দরকার ছিল ঠিক তেমনটিই হয়েছে, বিন্দুমাত্রও কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এতে নেই কোনো প্রয়োজনের ঘাটতি বা অপ্রয়োজনের সংযোজন। আমাদের চারদিকে আমরা যত অনিষ্টকর বা অপ্রয়োজনীয় বস্তু দেখি, প্রকৃত বা বৃহৎ অর্থে তা কিন্তু আমাদের উপকারেই আসে। অর্থাৎ ফুল-ফল, তরুলতা, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, আগুন-পানি, আলো-বাতাস, সাপ-বিচ্ছু, মধু-বিষ, কীট-পতঙ্গ, খাদ্য-অখাদ্য, হালাল-হারাম, দৃশ্য-অদৃশ, ভাল-মন্দ সবকিছুই সদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বিচারে প্রত্যক্ষ-

www.pathagar.com

ভাবে বা পরোক্ষভাবে মানুষেরই সেবা করে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, "তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তদ্বসমুদয়কে" (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৫)। যেমন-বিষধর সাপের প্রাণঘাতী বিষ আমাদের জন্য অনিষ্টকর হলেও তা দিয়ে প্রাণঘাতী ক্যান্সার ব্যাধির ঔষুধ আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা মাবারও উপরোক্ত আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে জানিয়ে দিয়েছেন "এটা সন্দেহ মুক্ত নির্ভুল গ্রন্থ" (সূরা আল বাকারা ঃ ২)।

ঠিক এমনিভাবেই আমাদের অনিষ্টকর বা অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলো কোনো না কোনোভাবে আমাদের উপকারেই নিয়োজিত। তবে এ ধরনের বস্তুগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা প্রয়োজনের প্রকৃতি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের ধারণায় তা অনিষ্টকর বা অপ্রয়োজনীয়ই রয়ে যায়। কিন্তু বস্তুগুলোর প্রয়োজনের প্রকৃতি আবিষ্কার হলেই আমরা বুঝতে পারি কিভাবে গোখরো সাপের তুখোর বিষ প্রাণঘাতী ক্যান্সার উপশমে কাজ করে। কি করে মৃতসঞ্জীবনী হয় মরণ ব্যধি হার্ডের বাইপাস করা রুগীদের জটিলতা নিরসনে কাঁকড়া বিছার হুলের বিষ।

"তুমি কি লক্ষ্য করো না, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তদ্বসমুদয়কে" (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৫)।

উল্লিখিত আয়াতে 'যা কিছু' (কুল) শব্দ দ্বারা আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছুকে বুঝিয়েছেন। একটা অণু-পরমাণু বা ইলেকট্রন-প্রোটনও তা থেকে বাদ পড়ে না।

কবির কথায়-

'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল;
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল'।

এখানে যেমন মহাদেশ ও অতল সাগর সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র একটি বালুকণা বা একবিন্দু জলের গুরুত্ব অপরিসীম। ঠিক তেমনি পৃথিবীর এ আকার, আকৃতি ও সার্বিক অবস্থা ঠিক রাখতে একটি অণু-পরমাণু বা ইলেকট্রন-প্রোটনের গুরুত্বও অপরিসীম। এখানেই প্রমাণ হয় 'আল্লাহ কোনো কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই'

স্রষ্টার কৃতিত্ব দেখা, তাঁকে বিশ্বেষণ করা তাঁর প্রশংসা করা কিংবা তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস, অবিশ্বাস অথবা বিদ্রোহ করার জন্য শুধু মাত্র একটি প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে যার নাম মানুষ। এবং তারই সেবার জন্য সৃষ্টি হয়ে রয়েছে আরও লক্ষ-কোটি বিভিন্ন প্রজাতির জীব ও বস্তুসম্ভার। পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের

www.pathagar.com

বস্তুবিশালতা যুক্তিবাদীদের তর্কের খোরাক যোগাতে পারে। তর্কের যোগান দিতে পারে পৃথিবীর উদ্ভিদ, প্রাণী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্রজলের পরিকল্পনাহীন প্রাচুর্যতা। তর্ক হতে পারে মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে। সাধারণ দৃষ্টিতে এগুলো অপ্রয়োজনীয় ও পরিকল্পনাহীন মনে হলেও কুরআনে বলা হচ্ছে- "..... হে রব তুমি কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি মহান পবিত্র" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)। এখানে আমরা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংক্ষেপে দেখতে চাই সৃষ্টিজগতে অনর্থক কোন সৃষ্টি আছে কি না ?

বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন আবিষ্কার একের পর এক প্রমাণ করে চলেছে সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি নয়। এ জীবনময় পৃথিবী সৃষ্টির শর্ত হিসেবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ক্রম বিকাশ ছিল অপরিহার্য, তাই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ছাড়া এ প্রাণময় পৃথিবীর সৃষ্টির কথা কল্পনাই করা যায় না। এখানে উদ্ভিদ প্রাচুর্যের কথা আসলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টের কথা। নানাবিধ প্রয়োজনের কথা বাদ দিলেও বন-জঙ্গলের বৃক্ষ হচ্ছে প্রাণীকুল বেঁচে থাকার অক্সিজেন ভাণ্ডার। আবার মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন তার এক বিশাল অংশ আসে সমুদ্র-উদ্ভিদ থেকে। সামুদ্রিক জীব খাদ্যের ব্যাপারে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল, সামুদ্রিক জীব (মাছ) আবার মানুষেরই ভোজ্য। এখানে পরিকল্পনাহীন প্রাচুর্যের কথা আসলে বলতে হয় বিশাল সমুদ্রে বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক বস্তু (মৎস্য) না থাকলে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পরিমাণ আহরণ সম্ভব হতো না, বরং প্রতিদিনের চাহিদা অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। ".....হে রব তুমি কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি মহান পবিত্র" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)। "আমারই নিকট রয়েছে প্রতিটি বস্তুর অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং আমিই তাদের প্রয়োজন মত তা সরবরাহ করি" (সূরা আল হিজর ঃ ২১) "এবং তিনি পৃথিবীতে তোমাদের জন্য বহু রং বেরঙের জিনিস সৃষ্টি করেছেন" (সূরা আন নাহল ঃ ১৩)।

আবার বিজ্ঞান আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে বস্তুজগতের আলোক প্রাচুর্যের শতকরা এক ভাগেরও কম আলো আমাদের দৃষ্টিতে সাড়া জাগাতে সক্ষম, বাকি ৯৯ ভাগেরও বেশি আলোকই অদৃশ্য থেকে যায়। যেমন- এক্স-রে, লেসার-রে, গামা-রে, আলফা-রে, বিটা-রে ইত্যাদি। সাধারণভাবে দৃশ্যমান আলো ছাড়া অদৃশ্যমান আলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব না হলেও বিজ্ঞানীরা এক্স-রে, গামা-রে, লেজার-রে ইত্যাদির বহুবিধ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা

www.pathagar.com

আবিষ্কার করে অদৃশ্যমান আলোর নিদারুণ প্রয়োজনের স্বীকৃতি দিয়েছে। আর সেই সাথে এ অদৃশ্যমান আলো মানুষের কাছে অদৃশ্যজগতের ধারণা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

মহাবিশ্বের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আলোক-প্রাচুর্যের মতই বস্তু-প্রাচুর্যের বিষয়টিও আশ্চর্যজনকভাবে বিবেচনায় আসে। অধিক শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে দৃশ্যমান আলোয়-ধরা জ্যোতিষ্কসমূহের ভর-সমষ্টি অদৃশ্য পদার্থ-ভরের তুলনায় মাত্র দশ ভাগ এবং বাকি নব্বই ভাগ পদার্থ আজও মানুষের দৃষ্টিশক্তির বাইরে রয়েগেছে। যেমন আমাদের এ পর্যন্ত জানা বস্তুদের মধ্যে সবচাইতে দূরবর্তী কোয়াসার OQ-172 আমাদের গ্যালাক্সি থেকে প্রায় এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এ কোয়াসারটি কমপক্ষে ১০০টি সুবিশাল গ্যালাক্সির সমশক্তিসম্পন্ন এবং এর উজ্জ্বলতা সূর্যের চেয়ে দশলক্ষ-কোটি গুণ বেশি। এমন সুবিশাল বস্তুগুলো চিরদিন মানুষের দৃষ্টির বাইরে থেকে কুরআনের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়—"অদৃশ্যের জ্ঞান তাঁরই, তাঁর জ্ঞান নিরুপণ করার সাধ্য কারও নেই" (সূরা জ্বিন ঃ ২৬)।

পৃথিবীর নিজস্ব উৎসের পাশাপাশি মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রসহ মহাজাগতিক প্রতিটি বস্তু থেকে প্রতি মুহূর্তে আগত মাইক্রো-ওয়েভ, রেডিও-ওয়েভ ও অন্যান্য শক্তি তরঙ্গের সাথে আমরা বেশ পরিচিত। আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে মহাজাগতিক বস্তুগুলো তাদের পাঠানো শক্তিতরঙ্গের মাধ্যমে বিশ্বজোড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ করে দিয়ে পক্ষান্তরে মানুষেরই সেবা করে চলেছে।

মহাজাগতিক নিয়ম শৃঙ্খলা আমাদের চিন্তার খোরাক যোগায়। আমাদেরকে উৎসুক করে তোলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানতে। এ জানার আগ্রহ থেকে বিজ্ঞান হয়তোবা ভবিষ্যতে মহাজাগতিক বস্তুর কাছ থেকে আরও সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে। "যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে (তারা বলে), হে রব! তুমি এসব কিছুই অনর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি মহান পবিত্র" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)।

"তিনি আসমান-জমিনের সবকিছু নিজ অনুগ্রহে করেছেন তোমাদের অধীন; এতে রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন" (সূরা আল জাসিয়া ঃ ১৩)। এখানে আসমান ও যমীনের সবকিছুকে মানুষের অধীন করার কথা বলা হয়েছে। কুরআন নাজিলের সেই অজ্ঞতার যুগে 'যমীনের সবকিছু' মানুষের অধীন হওয়ার কথা বুঝে আসলেও 'আসমানের সবকিছু' মানুষের

www.pathagar.com

অধীন হওয়ার কথা মোটেও বুঝে আসে না। কুরআন নাযিলের প্রায় ১৪০০ বৎসর পর বিজ্ঞানের মহাকাশ অভিযান এবং মহাকাশের যাবতীয় আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এ আয়াত প্রস্তাবের বাস্তবতা প্রমাণিত হয়ে চলেছে, 'যেখানে শুধু চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যই রয়েছে নিদর্শন'। এখানে প্রমাণ হয় আল্লাহ আছে এবং কুরআন সত্য। শুধু সত্যের খাতিরে কুরআনকে আজ বিশ্বাস করতেই হয়।

মহাশূন্যে সবকিছু আপন কক্ষে সন্তরণশীল

আজ থেকে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে মানুষ পৃথিবী কেন্দ্রিক সৃষ্টিজগত নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। অর্থাৎ আমাদের এ সম্মানিত পৃথিবী সৃষ্টিজগতের স্থির কেন্দ্রবিন্দু এবং চন্দ্র-সূর্যসহ আকাশের দৃশ্যমান বক্রতল সমস্ত তারকারাজি নিয়ে প্রতি ২৪ ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যায়। সে যুগে গ্রহ-নক্ষত্রের পার্থক্য বা তাদের কক্ষপথ সম্পর্কে মানুষের কোনই ধারণা ছিল না। পৃথিবীবাসী যখন এমনই অন্ধ ধারণায় বিশ্বাসী ঠিক সেই সময় কুরআন কোনো প্রকার গবেষণা ছাড়াই আলৌকিকতার দাবি নিয়ে সরাসরি দৃঢ়-দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল, "এবং তিনিই রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই আপন কক্ষপথে ভেসে বেড়ায়" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৩)। "চন্দ্র ধরতে পারে না সূর্যকে এবং রাতও অতিক্রম করতে পারে না দিবসকে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণশীল" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে চন্দ্র-সূর্যসহ সকল গ্রহ-নক্ষত্র সন্তরণশীল বলে ঘোষণা দিয়ে আল কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে। আয়াতগুলোতে ব্যবহৃত কুল (كُلٌّ) শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক, সমস্ত বা সবকিছু। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের ইলেকট্রন-প্রোটন থেকে শুরু করে গ্যালাক্সি পর্যন্ত কোনো কিছুর অস্তিত্বই 'কুল' শব্দটির বাইরে নয়। "আকাশ-পৃথিবীতে কণা পরিমাণও তোমার রবের অগোচরে নহে, আর তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ সমস্তই গ্রন্থে লিখিত রয়েছে" (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন জ্যোর্তিময়, আর সূর্যকে করেছেন প্রদীপ্ত উজ্জ্বল" (সূরা নূহ ঃ ১৬)। "এবং তার মধ্যে স্থাপন করেছেন প্রদীপ সাদৃশ্য সূর্য এবং জ্যোর্তিময় চন্দ্র" (সূরা ফুরকান ঃ ৬১)। এ আয়াতগুলোতে সূর্যকে প্রজ্জ্বলিত এবং চন্দ্রকে আলোকিত বলে নক্ষত্র এবং গ্রহ-উপগ্রহের পার্থক্যের ধারণা দিয়েছেন। সূর্য

www.pathagar.com

(নক্ষত্র) প্রদীপ সাদৃশ্য যা উজ্জ্বলতার সাথে বিকিরণ ঘটায়, আর চন্দ্র (গ্রহ-উপগ্রহ) জ্যোর্তিময় যা আলোকময়তার সাথে প্রতিফলন ঘটায়। মানুষ এ সত্য জানতে পেরেছে মাত্র ৩০০ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ কুরআন নাযিলের ১১০০ বৎসর পর। এখানে কুরআনের সত্যতার সাথে আপন বিশ্বাসের বিষয়টিকে আরও একবার মিলিয়ে দেখে নেয়া যেতে পারে। কুরআন বিজ্ঞানের কাছে কখনও গ্রহণযোগ্যতা হারায় না, বরং কুরআন সর্বদা বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে চলে। এখানে দেখা যায় বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের ঐক্য কতটা নিবির।

বস্তুত নক্ষত্র ছাড়া মহাবিশ্বে যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু গ্রহদেরই পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ নক্ষত্র হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত এবং আর যা কিছু দৃশ্যমান তা সকলই প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্রের আলোকে আলোকিত। এ মহাবিশ্বে প্রজ্জ্বলিত সূর্যের ন্যায় অগণিত নক্ষত্র আছে, যা অন্যান্য অসংখ্য দৃশ্যমান বস্তুকে চন্দ্রের ন্যায় আলোকিত করে। আকাশে ধূলিকণা উড়লেও তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সূর্যের আলোকে আলোকিত হওয়ায়। কাজেই আল কুরআন চন্দ্র সূর্যের উপমায় 'কুল' শব্দটি দ্বারা সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি বস্তুকে বুঝিয়েছে, যেখানে একটি পরমাণুও এর আওতার বাইরে নয়। অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল গ্যালাক্সি পর্যন্ত প্রত্যেকেই এ 'কুল' শব্দটির অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞানীরা আজ আবিষ্কার করেছেন 'জড়পদার্থ বলতে আমরা যা বুঝি তার কোনো কিছুই প্রকৃতপক্ষে জড় নয় বরং সকল পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রন-প্রোটনগুলো সার্বক্ষণিক সচল' এবং যাকে আমরা মিনি সৌরজগত বলে অভিহিত করতে পারি। এখানে আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, আল কুরআনে যেখানেই কক্ষপথ বুঝানো হয়েছে সেখানে 'ফালাক' (فلق) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ 'বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার'।

আমরা জানি পরমাণুর ইলেকট্রনের কক্ষপথ সত্যিই গোলাকার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপবৃত্তাকারও বটে। আবার গ্রহদের কক্ষপথ বৃত্তাকার নয় বরং উপবৃত্তাকার। বৃত্তাকার ও উপবৃত্তাকার এই উভয় প্রকার কক্ষপথেই আটকা পড়ে আছে পরমাণুর ইলেকট্রন-প্রোটন থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু। অর্থাৎ কুল (قل) শব্দ দ্বারা ইলেকট্রনের বৃত্তাকার ও উপবৃত্তাকার এবং গ্রহ-নক্ষত্রের শুধু উপবৃত্তাকার, এই দুই প্রকার কক্ষপথের কথাই বুঝানো হয়েছে এবং এর দ্বারা ইলেকট্রন-প্রোটন থেকে শুরু করে গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাবিশ্বের সকল বস্তুর কথা বলা হয়েছে। এখানেও বিজ্ঞান কুরআনকে অতিক্রম করতে ব্যর্থ। নাস্তিক বিজ্ঞানীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের এ কক্ষপথ আবিষ্কার "প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণশীল" এ আয়াত প্রস্তাবের সত্যতার

www.pathagar.com

স্বীকৃতি দিয়ে আবারও একবার প্রমাণ করে দিল তথ্যের নির্ভুলতায়"এটা সন্দেহ মুক্ত নির্ভুল কিতাব" (সূরা আল বাকারা ঃ ২) "এতে মিথ্যার কোনো অনুপ্রবেশ ঘটবে না সম্মুখ দিয়ে বা পিছন দিয়ে। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ" (সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৪২)। যারা বলে 'বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত সঠিক প্রমাণের ওপর, আর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত শুধু অন্ধ বিশ্বাসের ওপর' তাদেরকেও আজ এখানে শুধু সত্যের কারণে কুরআনকে বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

পানির অস্বাভাবিক গুণ

মৌলের ভর, ধর্ম ও গুণাগুণ অনুসারে বৈজ্ঞানিক মেন্ডেলিফ সমস্ত আবিষ্কৃত মৌলসমূহকে বৈশিষ্টগত ধারাবাহিক গুণাগুণের মানে একটি ছকের উপর সাজিয়ে নিলেন। পর্যায়ক্রম ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে ছক তৈরির সময় মেন্ডেলিফ তার সারণিতে কিছু কিছু ঘর শূন্য রেখে যান এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ছকের শূন্য ঘরগুলো উপর-নিচে এবং আগে-পরের মৌলসমূহের গুণাগুণ দেখে তিনি ওইসব শূন্য ঘরে ভবিষ্যতে আবিষ্কার হবে এমনই সব মৌলের ভর, গুণাগুণ ও ধর্ম ইত্যাদি বলে দিলেন। কয়েক অব্দ যেতেই এক এক করে শূন্য ঘরগুলো শুধু পূর্ণই হল না, মেন্ডেলিফের ভবিষ্যদ্বাণীর সংগে হুবহু মিলে গেল। বিজ্ঞানীগণ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন সৃষ্টির মাঝে একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা রয়েছে, আর সেই ধারাবাহিকতা সৃষ্টিকে একটি অদৃশ্য আইনের সু-কঠিন বাঁধনে শৃঙ্খলায়িত করে রেখেছে।

থমাস ডেবিস পাকার্স, রিচার্স কেমি: ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়, মেন্ডেলিফের সারণির সংশোধিত পর্যায় তালিকা বা পর্যাবৃত্ত সারণিকে মূল্যায়ন করে বলেছেন-"আজকের দিনে রসায়নবিদগণ অজ্ঞাত নতুন যৌগিক পদার্থের বিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে এবং এ সারের উপাদান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য তাদের কাজের সহায়ক হিসেবে এ পর্যায়বৃত্ত সারণির সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। এ গবেষণা ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাদের সাফল্য, অজৈব বিশ্বে যে সুন্দর ক্রম ও ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, এটা তারই অভ্রান্ত প্রমাণ।"

আজ সমস্ত বিজ্ঞানী, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সকল ছাত্রই বিনাবাক্যে স্বীকার করে নেন যে, দৃশ্য জগতের পদার্থের সৃষ্টি, পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ ও ধ্বংস এক সু-কঠিন দুর্লঙ্ঘ্য আইন ও শৃংখলায় বাধা। এ আইনকে অমান্য করার অর্থ একটি অস্বাভাবিকতার নির্দেশ বা উদাহরণ। অথচ অতি সহজলভ্য

www.pathagar.com

মূল্যহীন পানি এক সাংঘাতিক অস্বাভাবিকতার ফসল। জীবন নামে পরিচিত এ পানি বস্তুজগতের চিরাচরিত আইন বা ধারাবাহিকতাকে লঙ্ঘন করে জীবজগতকে টিকিয়ে রেখেছে, যার স্বাভাবিকতাই ছিল জীবজগতের জন্য সবচাইতে বড় দুঃসংবাদ। শুধু বস্তুজগতের চিরাচরিত আইন মানার খাতিরে যদি পানি প্রকৃতির আইন লঙ্ঘন না করত, তাহলে কখনোই জীবনের সঞ্চার হত না এ পৃথিবীতে। দৃশ্যত এ স্বাভাবিক বস্তুটির অস্বাভাবিকতাই বিজ্ঞানকে তাক লাগিয়ে দেয়। দু-দণ্ড ভাবিয়ে তোলে মানুষকে।

পানি দেখে আমরা কখনও আশ্চর্য হই না। অথচ এ পানির মধ্যেই রয়েছে কয়েকটি আশ্চর্য ধর্ম, যা নিয়ে আমরা কোনো দিনও ভাবি না। ভাবি না এই জীবন সৃষ্টি ও রক্ষাকারী বস্তুটিকে নিয়ে। সহজলভ্য এ বস্তুটি যেন আমাদের কাছে একেবারেই গুরুত্বহীন ফেলনা, অথচ মহান স্রষ্টা ঠিকই গুরুত্ব দিয়েছেন, "বল তোমরা কি ভেবেছ, ভূগর্ভে পানি তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে গেলে তোমাদের জন্য কে আনবে প্রবাহমান পানি?" (সূরা আল মুল্‌ক ঃ ৩০)। "এবং আমিই আসমান হতে পরিমাণ মত পানি বর্ষাই, অতঃপর তাকে যমীনে স্থির রাখি এবং আমিই তা অপসারণ করতেও সক্ষম" (সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১৮)।

আল কুরআন এখানে জ্ঞানগর্ভ ভঙ্গিতে গুরুগম্ভীর ভাষায় চ্যালেঞ্জিং প্রস্তাবনায় যে নির্দেশনা দিয়েছে আমরা এর প্রমাণ পাই আমাদের নিকট প্রতিবেশী মরু-গ্রহ মঙ্গলে। বিজ্ঞানীরা নভোযান মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ার লেসার মাল্টিমিটারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে নতুন তথ্য দিয়েছেন। সেখানে তারা ভয়াবহ বন্যার পানি প্রবাহের পথ আবিষ্কার করেছেন। অথচ বর্তমানে জীবন ধারণের জন্য সেখানে কোনো কিছুর বিনিময়ে এক ফোটা পানিও পাওয়া সম্ভব নয়। আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে মঙ্গল গ্রহের ভূগর্ভে পাথরের নীচে বিপুল পরিমাণ পানি জমাট বেধে আছে। এখান থেকেই প্রমাণ হয় ভূ-গর্ভে পানি নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং আসমান থেকে পরিমাণ মত পানি বর্ষায়ে তাকে যমীনে স্থির রাখা এ সবকিছুই মহান আল্লাহরই এখতিয়ার। মঙ্গল গ্রহের পানি নাগালের বাইরে পৌঁছে দিয়ে আল্লাহ পৃথিবীবাসীকে কুরআনের উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা সতর্ক করেছেন।

উপরোক্ত আয়াত-প্রস্তাবে আমরা আরও একটি তথ্য দেখতে পাই, তা হচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রবাহের কথা। ভূ-গর্ভস্থ পানির যে স্রোত বা প্রবাহ আছে তা মানুষ জানতে পেরেছে কুরআন নাযিলের বহু বছর পরে। এখানেও বিজ্ঞান কুরআনের কাছে নতজানু। এখানে আরও একবার প্রমাণ হয়, তথ্যের নির্ভুলতায় "এটা সন্দেহ মুক্ত নির্ভুল কিতাব" (সূরা আল বাকারা ঃ ২)।

www.pathagar.com

"যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির" (সূরা আল আনআম ঃ ৩৯)। "অতএব এর পরও যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করবে, বস্তুত এই শ্রেণীর লোকেরাই জালেম" (সূরা আলে ইমরান ঃ৯৪)।

উনবিংশ শতাব্দিতে পানির যোজনী আবিষ্কার হওয়ার পর বিজ্ঞান জানতে পেরেছে, স্বাভাবিক তাপ ও চাপে পানির বাষ্প হওয়ার কথা, কিন্তু প্রাকৃতিক আইন ভঙ্গ করে পানির তরল অবস্থায় টিকে থাকা এক আশ্চর্য ব্যাপার।

আমরা জানি পানির সূত্রগত ভর ১৮, যা বিজ্ঞানীদেরকে সহজেই বুঝিয়ে দেয় যে, পানি সামান্য তাপ ও চাপে বায়বীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হবে। এ্যামোনিয়ার সূত্রগত ভর ১৭ হওয়া সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক তাপ ও চাপে গ্যাসীয়বস্থায় পরিণত হয়। পর্যাবৃত্ত সারণির অবস্থানের দিক থেকে পানির সাথে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত চারপাশের অন্যান্য যৌগগুলোর তুলনামূলক চিত্রটি লক্ষ্যণীয় ঃ-

যৌগের নাম	সূত্রগত ভর	বাষ্পীভূত হওয়ার তাপমাত্রা
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	৩৬.৫	+১৯.৫০ সেঃ
হাইড্রোজেন ব্রোমাইড	৮০.৯০	-৬৬.৪০ সেঃ
হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড	২০	-৮৫০ সেঃ
হাইড্রোজেন সায়ানাইড	২৭	+২৬০ সেঃ
হাইড্রোজেন সালফাইড	৩৩	-৫৯° সেঃ

সূত্রগত ভরের ক্রম অন্যান্য যৌগের মত পানির উপর সমভাবে কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও পানি কেন স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বাষ্পায়িত না হয়ে ১০০০সেঃ-এ বাষ্পায়িত হয়? এর বিশুদ্ধ জবাবের পার্শে স্রষ্টাকে দাঁড় করাতে হয়। থমাস ডেবিস পার্কাস তার লেখচিত্রে বিষয়টি তুলে ধরেছেন- "এমনি সাধারণ তাপমাত্রায় যে পানি তরল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে তা এমনি একটি ব্যাপার যা নাকি মানুষকে থমকে দিয়ে নির্নিমেষে ভাবিত করে তোলে।" আর এভাবে আমরা এখানে উল্লিখিত আয়াতসমূহের বাস্তবায়ন সম্ভবতা খুঁজে পাই, "আমি তাকে অপসারণ করতেও সক্ষম।"

পানি যদি উবে যাবার মত হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত হাইড্রোজেন-চেইনের বিশেষ ব্যবস্থা যদি অবলুপ্ত থাকে অথবা অচল হয়ে পড়ে, আমাদের তখন আর কোনো সাধ্য থাকবে না যে জীবনের জন্য

www.pathagar.com

পানিকে আমরা আমাদের হাজারো প্রযুক্তি খাটিয়ে উপযোগিতার নাগালে রাখতে পারি। তখন পানির তরল রূপ হবে এক স্বপ্নের বিষয়।

অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেনের বিশেষ আকর্ষণের কারণে বিভিন্ন H_2O একত্রিত হয়ে বিরাট অণু গঠন করে। ফলে পানিকে বাষ্পীভূত করতে অধিক তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। এটি একটি অনন্যধর্মী ব্যবস্থা, যা শুধু পানির যৌগ সৃষ্টিতেই প্রয়োগ হয়েছে। এটা পানির একটা অস্বাভাবিক গুণ। পানির এ অস্বাভাবিক গুণই প্রাণ সৃষ্টি করে, আর উদ্ভিদ ও জীবদেহের খাদ্য ও অপদ্রব্য বহন করে বাঁচিয়ে রাখে।

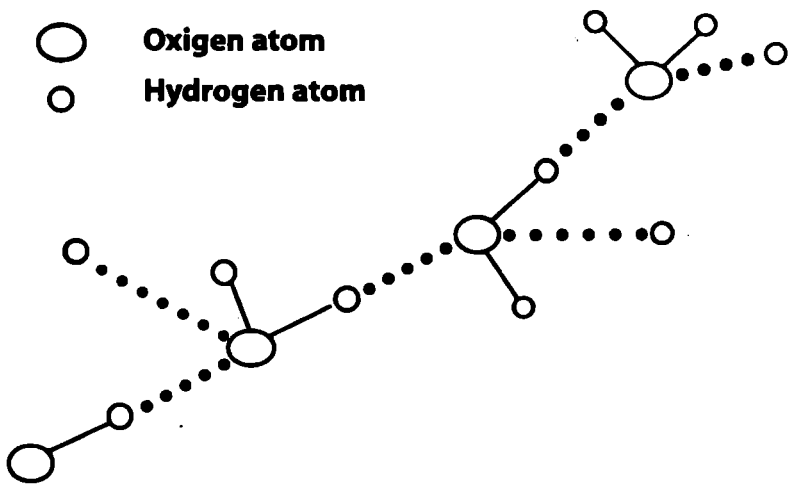

চিত্র ঃ হাইড্রোজেন চেইন।

পানির আরও একটি অস্বাভাবিক গুণ হচ্ছে, তার কিছু অংশ স্ফুটনাংকের পূর্বে সূর্য তাপে বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়ে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয় এবং ঠাণ্ডা বাতাসে মেঘ ও বৃষ্টির ফোঁটা সৃষ্টি করে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে, এভাবে জলচক্রের মাধ্যমে অস্বাভাবিক গুণসম্পন্ন পানি পৃথিবীকে প্রাণবন্ত করে তোলে। যে পানি ১০০° সেঃ তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়, কি করে সেই পানির কিছু অংশ সামান্য তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুর আদ্রতা রক্ষায় কাজ করে?

আমরা জানি প্রতিটি বস্তু ঠাণ্ডায় সংকোচিত হয় এবং উত্তাপে সম্প্রসারিত হয়। এখানে পানির আর একটি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সমুদ্রের নিম্নতলে ঠাণ্ডায় বরফ জমতে শুরু করলে তা আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে উপরে ভেসে

www.pathagar.com

উঠে। তাপের ধর্ম উপরের দিকে প্রবাহিত হওয়া। অথচ ভেসে উঠা বরফ পিণ্ড সমস্ত নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে তার দেহ হতে বিপুল পরিমাণ (৮০ ক্যাল/ সিসি) সুপ্ততাপ নিচের দিকে বিকিরণ করে উদ্ভিদ ও জীবজগতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমুদ্রের নিচের পানিকে তরল রাখতে সাহায্য করে। ঠাণ্ডায় সংকুচিত হওয়ার স্বাভাবিকতা নিয়ে বরফ সমুদ্রের পানিতে ডুবে থাকলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলীন হয়ে যেত। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ টাইটানিক জাহাজের নির্মাতারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন 'এ জাহাজ কোনো দিন ধ্বংস হবে না'। অথচ প্রথম উদ্বোধনী যাত্রা শুরুর মাত্র কয়েক ঘন্টা পর এক ডুবন্ত বরফের সাথে ধাক্কা খেয়ে শলিল সমাধির প্রাক্কালে আল কুরআনের যে বাণীগুলোর সত্যতা ঘোষণা করেছিল–"তোমরা কি লক্ষ্য করা না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজগুলো সমুদ্রে চলাচল করে....."। (সূরা লুকমান ঃ ৩১) "তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম একটি হলো, জাহাজসমূহ সমুদ্রে চলাচল করে" (সূরা আশ শূরা ঃ ৩২)। "ইচ্ছা করলে তা পারি নিমজ্জিত করতে, তখন তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না, পরিত্রাণও পাবে না" (সূরা ইয়াসিন ঃ ৪৩)। "তাঁরই অনুগ্রহের প্রতীক স্বরূপ প্রদর্শিত রয়েছে সমুদ্রের ভাসমান জাহাজগুলো" (সূরা আর রহমান ঃ ২৪)।

যেহেতু সমুদ্রের তলদেশে বরফ জমতে শুরু করলে সমস্ত জলভাগ বরফরাজ্য হয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক, সেখানে জাহাজ চলাচল ছিল দুঃস্বপ্নের ব্যাপার মাত্র। পানির এ অস্বাভাবিক আচরণের কথা স্মরণ করে বিজ্ঞান অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে প্রায় দেড় হাজার বৎসরের পুরোনো বাণীগুলোর দিকে। আবারও বিজ্ঞান স্বীকৃতি দেয়- তথ্যের নির্ভুলতায়

"এটা সন্দেহমুক্ত নির্ভুল কিতাব" (সূরা আল বাকারা ঃ ২)।

মহাকাশে মাপনযন্ত্র

"তিনি আকাশকে করেছেন সুউচ্চ এবং স্থাপন করেছেন পরিমাপ" (সূরা আর রহমান ঃ ৭)। এই আয়াতে আরবী (رفع) রাফাউন অর্থ- সুউচ্চ, বিস্তৃত, সুসম্প্রসারিত ইত্যাদি বুঝায়। এখানে আকাশকে সুউচ্চ করার দ্বারা প্রকৃত অর্থে সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের কথাই বলা হয়েছে। কারণ গ্লোবাকৃতির পৃথিবীটার সর্ব দিকে আকাশ সুউচ্চ হওয়ার অর্থ সম্প্রসারণ হওয়া বুঝায়।

বিজ্ঞান বলছে সম্প্রসারণের ফলে মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত বস্তুঘনত্ব হারিয়ে ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ফলে মহাবিশ্বের আকার ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের এ চরিত্রটি উল্লিখিত আয়াত প্রস্তাবের সাথে দ্বিধামুক্তভাবে খাপ খেয়ে যায়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত এ বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করেছে– "আমি আকাশমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছি শক্তি দ্বারা, নিশ্চয়ই আমি একে সম্প্রসারণ করতেছি" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৭)। উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালবাচক শব্দ (موسعون) 'মুসিওনা' এর মূল শব্দ (وسع) 'ওসিউ' যার অর্থ আরও সম্প্রসারিত করা, বিস্তৃত করা ইত্যাদি। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ দাঁড়ায় 'সম্প্রসারণ করা হচ্ছে বা করতেছি।

উল্লিখিত আয়াত প্রস্তাবগুলো ১৪০০ বছর পূর্বেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিজ্ঞানের সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে আল কুরআনের পাতায়। আর আজ বিজ্ঞান সেই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের আবিষ্কার দ্বারা চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্য আল কুরআনের সত্যতার প্রমাণ মাত্রা বৃদ্ধি করেছে মাত্র। এ আয়াত প্রস্তাবে সৃষ্টি বিষয়ক আরও একটি বিজ্ঞানভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে, তা হচ্ছে 'সৃষ্টি করেছি শক্তি দ্বারা' অর্থাৎ সৃষ্টির মূল উপাদান 'শক্তি'। বিগব্যাংগ তত্ত্বে 'সৃষ্টির মূল উপাদান শক্তি' এবং সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের কথা বিজ্ঞানীরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়ে উক্ত আয়াত প্রস্তাবের সত্যতার পার্শ্বে নতজানু-ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে আবারও প্রমাণ করে দিল, জ্ঞানের প্রসারতায় এটা সন্দেহ মুক্ত নির্ভুল কিতাব" (সূরা আল বাকারা ঃ ২)।

সূরা আর রহমান ঃ ৭ আয়াতে (ميزان) মিযান শব্দটির অর্থ মাপযন্ত্র, সমতা, ভারসাম্য, পরিমাপ, মাপন পদ্ধতি, মাপন সহায়ক, মাপন প্রক্রিয়া, মানদণ্ড ইত্যাদি। যা দ্বারা কেবল ওজন নয় বরং দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপও বুঝায়। আর (اداع) 'অদায়া' শব্দের অর্থ স্থাপন, সংস্থাপন, ফেলে রাখা, রেখে দেয়া, লেগে থাকা, যুক্ত, সংযুক্ত ইত্যাদি। এখানে মিজান ও অদায়া শব্দ দুটি সামায়া (আকাশ) শব্দটির সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বে বা সুউচ্চ আকাশে 'মাপন সহায়ক' সংযুক্ত করে রাখার আভাস দেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা আজ টেলিস্কোপের সাহায্যে ১১শ কোটি আলোক বর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত দেখতে পায়। মহাকাশের জ্যোতিষ্কদের দূরত্ব মাপার জন্য প্রথমে প্যারালাক্স পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। এ পদ্ধতিতে নিকটবর্তী কয়েকটি জ্যোতিষ্কের দূরত্ব মাপা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে মহাকাশে 'মাইল ফলক' হিসেবে ছড়িয়ে থাকা শেফিড নামক বিশেষ ধরনের নক্ষত্রের পাঠানো আলোক তথ্য থেকে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের দূরত্ব মাপা হয়। স্পেকট্রাস্কোপি বিদ্যার আশীর্বাদে আধুনিক বিজ্ঞান মহাকাশের জ্যোতিষ্কদের বহির্ভাগের পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত

www.pathagar.com

উত্তাপ ও আলোক তথ্য থেকে স্পেকট্রাস্কোপির মাধ্যমে তার পদার্থ, রসায়ন, মৌল, উত্তাপ, দীপ্তি, আবহাওয়া, আকার-আকৃতি, আকর্ষণ বা চৌম্বকক্ষেত্র, গতি-বিধি ও দূরত্বের প্রায় নিখুঁত পরিমাপ তথ্য দেয়। বস্তুত মহাকাশের প্রতিটি জ্যোতিষ্ক জন্মগতভাবে মিজান, মাপন সহায়ক বা মাইল ফলক, যা থেকে ওই সমস্ত তথ্য আসে এবং বিজ্ঞানীরা স্পেকট্রাস্কোপির মাধ্যমে সেই পাঠ গ্রহণ করে মাত্র। উল্লিখিত আয়াতের পরবর্তী দুটি আয়াতে বলা হয়েছে "যেন তোমরা ন্যায্য পরিমাপের ক্ষেত্রে গাফেল হইও না। ন্যায্য পরিমাপের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করো এবং (ওজনে কম দিয়ে) মানদণ্ডের ক্ষতি সাধন করো না" (সূরা আর রহমান ঃ ৮-৯)।

এখানে ৫৫ঃ৮ নং আয়াতে মহাকাশে এঁটে দেয়া মহামাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষ যেন গাফেল, অজ্ঞ, অমনোযোগী বা অনবহিত না হয়ে জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে মহাপরিকল্পকের মহাব্যবস্থাপনাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে সেই বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। সূরা আর রহমান ঃ ৯ নং আয়াতে আল্লাহ মানুষকে তাঁর মহাপরিমাপ ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সৃষ্টির সর্বত্র পরিকল্পিত ভারসাম্য ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে সমাজে পরিমাপের ভারসাম্য রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মৃত্যু ও জীবন সৃষ্ট

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম, তিনি পরাক্রমশীল" (সূরা মূলক ঃ ২)। সাধারণভাবে আমরা সবাই জানি জীবন একটি সত্তা, আর এ সত্তা বা জীবনের অনুপস্থিতির নাম মৃত্যু। মৃত্যুকে কোনো সত্তা বলা হয় না। জীব দেহে জীবসত্তা না থাকার নামই মৃত্যু। মৃত্যু অর্থ জীবনহীনতা। অথচ আল কুরআনে উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, স্রষ্টা 'মৃত্যু ও জীবন' সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ জীবনের পূর্বেই মৃত্যুকে সৃষ্টি করার কথা এখানে বলা হয়েছে। আল-কুরআনের উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুকে যদি সৃষ্টি করা হয় তাহলে মৃত্যু একটি সত্তা। কিন্তু এ সত্তাকে আমরা কোনোভাবেই গবেষণাগারে প্রমাণ করতে পারি না। তাহলে কি বিরাট এক জনগোষ্ঠী শুধু অন্ধ বিশ্বাসের বোঝা মাথায় করে বয়ে বেড়াবে আর তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআন এখানে লাঞ্ছিত হবে!!! যেখানে কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে "এটা সন্দেহ মুক্ত নির্ভুল কিতাব"–সূরা আল বাকারা ঃ ২। "এতে মিথ্যার কোনো অনুপ্রবেশ ঘটবে না সম্মুখ দিয়ে বা পিছন দিয়ে। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ"–সূরা

www.pathagar.com

হা-মীম আস্ সাজদাহ ঃ ৪২। তাহলে এখানে বিরুদ্ধবাদীরা এ ভেবে উল্লসিত হবে যে, 'কুরআনের তথ্য সত্য পরিহার করেছে'।

প্রাণ সৃষ্টিজগতের একটি রহস্যময় অদৃশ্য শক্তিসত্তা, যা জীবদেহে প্রমাণিত। কিন্তু জীবদেহের বাইরে গবেষণাগারে আমরা তা প্রমাণ করতে পারি না। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের উক্তি হচ্ছে, "তারা প্রাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দাও তা আমার প্রভুর আদেশ ঘটিত ব্যাপার এবং সে সম্পর্কে তাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেয়া হয়েছে" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)। এ থেকে বলা যায় আল কুরআনের মতে প্রাণ সম্পর্কে যত গবেষণাই করা হোক তাতে বড় রকমের কোনো সাফল্য আসবে না। অর্থাৎ প্রাণ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা সম্ভব নয়। সুতরাং মৃত্যু সম্পর্কেও তেমন কিছু জানা সম্ভব নয়, যেহেতু মৃত্যু হচ্ছে প্রাণেরই প্রতিপ্রাণ।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিরই বিপরীত সৃষ্টি আছে। যেমন, বস্তুর বিপরীত প্রতিবস্তু, প্রোটনের বিপরীত প্রতিপ্রোটন বা এ্যান্টি প্রোটন আছে। এমন কি বিজ্ঞানীরা বলেছেন, তাদের গাণিতিক হিসেব তত্ত্ব অনুযায়ী ব্লাক হোলের বিপরীতে হোয়াইট হোল বা শ্বেতগহবর অবশ্যই আছে। অন্তত গাণিতিকভাবে তো আছেই। তবে বিজ্ঞানীরা কৃষ্ণগহবর বা ব্লাক হোলের সন্ধান পেলেও শ্বেতগহবরের সন্ধান এখনও পাননি। তাদের বিশ্বাস শ্বেতগহবরের সন্ধান একদিন নিশ্চয়ই মিলবে।

প্রতিটি সৃষ্টিরই যখন বিপরীত সৃষ্টি আছে এবং প্রাণ একটি সৃষ্টি, তখন অবশ্যই প্রাণের বিপরীত প্রতি-প্রাণ আছে এবং এ প্রতি-প্রাণই হচ্ছে 'মৃত্যু' বা মৃত্যুকেই আমরা প্রতি-প্রাণ বলতে পারি। এখান থেকেই প্রমাণ হতে পারে মৃত্যুও একটি অদৃশ্য সৃষ্টি-সত্তা, যা ১৪০০ বছর পূর্বেই আয়াত-প্রস্তাবদ্বয়ে নির্ভুলভাবে সত্যতার সাথে গেঁথে দেয়া হয়েছিল। আমরা জানি পদার্থের ভিত্তি প্রোটনের আয়ুষ্কাল ১০৩১ বৎসর, অর্থাৎ দশ হাজার কোটি, কোটি, কোটি কোটি বৎসর। আর এ সুদীর্ঘায়ু প্রোটনসমৃদ্ধ জীবদেহ স্বাভাবিকভাবেই কোটি কোটি বৎসর জীবনকে নিয়ে টিকে থাকার কথা। কিন্তু এ স্বাভাবিকতার বিপরীতে জীবের প্রজাতি অনুযায়ী কয়েক মিনিট থেকে শুরু করে মাত্র কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা যায়। অর্থাৎ সাধারণভাবে এক-একটি প্রজাতির জীব এক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে। যেমন নিম্ন শ্রেণীর পতঙ্গ মাত্র কয়েক দিন বাঁচে, মানুষ সাধারণত ৬০,৭০ বা ৮০ বৎসর বাঁচে, আবার কচ্ছপ, কুমির, কিংবা তিমি প্রায় ৫০০ বছর বাঁচে। এমনিভাবে প্রত্যেকটি প্রজাতির জন্য জীবনের পরিব্যাপ্তি এক একটি ছকে বাঁধা মহাকুশলীর ব্যবস্থাপনা। আমরা একটা পতঙ্গকে কয়েক শত বছর বেঁচে

www.pathagar.com

থাকতে দেখি না; আবার একটা কুমিরকে কারণ ছাড়া কয়েক দিনেই মরে যেতেও দেখি না; আমরা দেখি শুধু জীবন চক্রের একটা সুনির্দিষ্ট ছক, যা কোনভাবেই জীবন ধারণকারী পদার্থ প্রোটনের আয়ুষ্কালের সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। "এবং কোন জীবই আল্লাহর হুকুমে লিখিত নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত মরতে পারে না" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৫)। "তোমাদের মরণকাল নির্ধারিত করে দিয়েছি; এতে আমি অসমর্থ নই" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৬০)।

প্রোটনের বিপরীত প্রতি-প্রোটন আবিষ্কারের ফলে সুদীর্ঘায়ু এ প্রোটনের ধ্বংস দর্শনের জন্য আর কোটি কোটি বৎসর অপেক্ষা করতে হয় না। প্রোটনের আয়ুষ্কাল যতই দীর্ঘই হোক একটি প্রতি-প্রোটনের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে নিঃশেষে দুটোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যা পদার্থের মৃত্যুকেই নিশ্চিন্ত করে এবং তা শক্তিতে রূপান্তিত হয়। পদার্থের এই মৃত্যু বা ধ্বংসপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পারমাণবিক জ্বালানি ও বোমা আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

একজন মানুষের জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন এবং মৃত্যু দুটোই তার মধ্যে কোষ পর্যায়ে গেঁথে দেয়া থাকে বা বিরাজ করে। প্রতিনিয়ত জীবন যেমন ধীরে ধীরে গড়ে উঠে, মৃত্যু তেমনি ধীরে ধীরে জীবনকে গ্রাস করে চলে। মানুষের দেহ দশ ট্রিলিয়ন বা দশ লক্ষ কোটি কোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিদিন এ কোষের শতকরা এক থেকে দেড় ভাগের মৃত্যু হচ্ছে এবং প্রায় অনুরূপ হারে নতুন কোষ জন্ম নিচ্ছে। শিশুকালে কোষ পর্যায়ে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের হার বেশি থাকে, তাই শিশুরা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। মধ্য বয়সে কোষের মৃত্যু এবং জন্মের হার প্রায় সমান হয়, ফলে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়। আবার শেষ বয়সে কোষের জন্মের চেয়ে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়, ফলে বার্ধক্যে মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে তার মৃত্যু ঘটে।

এখানে যদি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কথা আসে তাহলে বলতে হয় দুর্ঘটনাজনিত কারণে আকস্মিকভাবে কোষ পর্যায়ে প্রাণ সৃষ্টির পরিবেশ নষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পরিবেশ ত্বরান্বিত হয়। ফলে জীবের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রাণ হচ্ছে দেহকোষের অসংখ্য উপাদানের সম্মিলিত ক্রিয়াশক্তি, যা অদৃশ্য থেকে আগত জৈব রাসায়নিক নির্দেশনা। আর মৃত্যু হচ্ছে অদৃশ্য থেকে আগত সেই জৈব রাসায়নিক নির্দেশনার প্রতিবন্ধক শক্তি যা নির্দেশনাকে বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ প্রাণ হচ্ছে জৈব রাসায়নিক নির্দেশনা এবং মৃত্যু হচ্ছে ওই নির্দেশনা বন্ধের নির্দেশনা। এখান থেকে প্রমাণ হয় শুরু থেকেই জীবের কোষপর্যায়ে জীবনের সাথে সুপরিকল্পিতভাবে মৃত্যুও গেঁথে দেয়া থাকে।

www.pathagar.com

আবার আমরা এটাও জানি লবণ দেহের একটি জীবন রক্ষাকারী উপাদান। অথচ এ উপাদানটির মধ্যেই লুকায়িত অবস্থায় ফাঁদ পেতে আছে মৃত্যু। ক্ষয়কারী পদার্থ সোডিয়াম ও জীবন নাশক পদার্থ ক্লোরিন গ্যাস একত্রিত হয়ে তৈরি হয় জীবন রক্ষাকারী সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রাণ রক্ষাকারী উপাদানের মধ্যেও মৃত্যুকে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি কোনভাবে দেহ কোষের মৃত্যুকে রোধ করা সম্ভব হতো তাহলে মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারতো। কিন্তু সমস্যা হতো দেহের বর্ধন জনিত কারণে। এ অবস্থায় মাত্র ২০০ বৎসরে একটা মানবদেহের ওজন হতো সমগ্র পৃথিবীর ওজনের চাইতেও বেশি। এভাবে দেহের বর্ধন চলতে থাকলে সময়ের সিঁড়িতে কল্পনাতীতভাবে তা সৃষ্টিজগতকে ছাড়িয়ে অসীমতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। কিন্তু সৃষ্টিজগত কোনভাবেই এটা মেনে নিতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে মৃত্যু-ব্যবস্থাকে প্রস্তুত রাখতেই হয়। অর্থাৎ মৃত্যুকে বাদ দিয়ে সুশৃঙ্খল সৃষ্টি মোটেও সম্ভব নয়।

আবার যদি অমরত্বের আশায় কোনো উপায়ে দেহ কোষের সৃষ্টি ও মৃত্যুর হার সমান রাখা যায় সে ক্ষেত্রে সৃষ্টি সূচনা পেরিয়ে বেরিয়ে আসতেই পারে না, অর্থাৎ জন্মেই মৃত্যু। এ ক্ষেত্রে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই অনর্থক। সুতরাং ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাকুশলী দ্বারা কোষ পর্যায়ে জন্ম-মৃত্যুর কম-বেশির নির্ধারিত হার ব্যতিরেকে একটি কল্যাণকর সৃষ্টি অসম্ভব। অর্থাৎ একটা উপযোগী সুশৃংঙ্খল সৃষ্টিজগতের জন্য পূর্বেই মৃত্যু ব্যবস্থা তৈরি রাখা শর্ত, যা উল্লিখিত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। "তোমাদের মরণকাল নির্ধারিত করে দিয়েছি ; এতে আমি অসমর্থ নই।"–সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৬০ "জীব মাত্রই মরণশীল" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)।

জীবনের আবির্ভাব

পৃথিবীতে কীভাবে জীবন আবির্ভূত হয়েছে? কী ছিল এর প্রতিক্রিয়া? কোথা হতে এসেছিল-প্রাণের স্পন্দন? পৃথিবীর কোনো মতবাদ এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। পৃথিবীর কোন ডারউইন একে সঠিক তথ্য-প্রমাণে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। কারণ

"তারা প্রাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বলে দাও, ওটা আমার প্রভুর আদেশ ঘটিত ব্যাপার এবং সে সম্পর্কে তাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে" (১৭ঃ৮৫)।

www.pathagar.com

যে মানুষ তার শরীরের একটা কোষের হিসেব রাখতে হিমশিম খেয়ে যায় সে মানুষ তার স্রষ্টা এবং স্রষ্টার যাবতীয় সৃষ্টি বিষয়ে কতটুকু জ্ঞান রাখতে সক্ষম? এমনি স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের প্রতিনিধি-বার্ট্র্যান্ড রাসেল এক সময় প্রশ্ন করেছিলেন-"স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছে?" এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে তিনি বলেছিলেন, 'স্রষ্টা বলতে কেউ নেই, সবই কারণের ফল'। এক সময় মানুষের কাছে এ তত্ত্বটি বেশ বাজার পেলেও ঐ কারণেরই আদি কারণ যে 'একজন স্রষ্টা' তা ম্লান করতে পারেনি কখনোই। তাই সে তত্ত্ব বিজ্ঞানের কাছে আজ ধিকৃত হয়ে অস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বার্ট্র্যান্ড রাসেলের এ উত্তর পাওয়া যায় দার্শনিক ফেন্সিস বেকনের বক্তব্য থেকে- "সামান্য দর্শন-জ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর অধিক দর্শন-জ্ঞান মানুষকে ধর্মের দিকে টেনে আনে"।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন জীবদেহ থেকে বিশেষ এক ধরনের শক্তি আলোর আকারে বের হয়, যা খালি চোখে দেখা যায় না। কিরলিন ফটোগ্রাফির সাহায্যে এ আলোক রশ্মির ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। জীবদেহের ঐ আলো সাধারণ আলোর চেয়ে বেশ বর্ণিল, দীপ্ত ও চঞ্চল। অথচ জড়বস্তু থেকে ঐ ধরনের আলোর বিচ্ছুরণ মোটেও ঘটে না। বিজ্ঞানের এ আবিষ্কার থেকেই প্রমাণ হয়, প্রাণ একটি শক্তিসত্তা, যা আসে অদৃশ্য থেকে। প্রমাণ হয় "বল, ওটা আমার প্রভুর আদেশ ঘটিত ব্যাপার" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)।

বিজ্ঞানী চার্লস ইউজিন গাই, ফ্রেড হোয়েল, স্যার বার্নাড লোভেল এবং আরও অনেকের গাণিতিক হিসেব চিত্র থেকে জানা যায়- একটি আমিষ-অণু বা প্রোটিন তৈরি হবার লক্ষ-কোটি ($১০^{৪৫}$) উপায় থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ছাড়া অবাধ রীতিতে একটি আমিষ-অণু বা প্রোটিন তৈরি হতে মহাবিশ্বের সমুদয় পদার্থের চাইতে লক্ষ-কোটি গুণ বেশি পদার্থকে নড়াচড়া করতে হবে মহাবিশ্বের বয়সের চাইতে কোটি কোটি গুণ বেশি সময় ধরে। মহাবিশ্বের সমুদয় পদার্থ ও সময়ের চাইতে লক্ষ-কোটি গুণ বেশি পদার্থ এবং সময় যেখানে আমাদের কাছে কল্পনাতীত, সেখানে অলৌকিক স্রষ্টার উপস্থিতি ছাড়া অবাধ রীতিতে প্রাণ'ত দূরের কথা একটা আমিষ-অণু তৈরি হবার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। কাজেই এখানে জীবনের জন্য ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন একটা মনীষাকে স্বীকার করতেই হয়। অন্যথায় এরূপ একটি 'গাণিতিক হিসেবচিত্র' প্রাণের অস্তিত্বকে একেবারেই অস্বীকার করে।

বিষয়টি আবিশ্বাস্য মনে হলেও 'গাণিতিক হিসাবচিত্রকে' একেবারে নাকোচ করা যায় না, কারণ গাণিতিক চুলচেরা হিসেবই মহাশূন্যে ঘূর্ণীয়মান

www.pathagar.com

এ পৃথিবী থেকে ভিন্ন গতির চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ বা কোনো গ্রহাণুকে ছুঁয়ে আসতে পথ দেখায়। বিভিন্ন গতির গ্রহ-উপগ্রহ বা গ্রহাণুর মাঝে মহাশূন্যের খেয়াযানকে চুলচেরা গাণিতিক হিসেবের সাথে চালাতে না পারলে যাত্রীসহ চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত মহাশূন্যে। ফিরে আসতে পারতো না খেয়াযান এ্যপোলো-স্পুটনিকগুলো। যেহেতু খেয়াযান বা রকেটের সর্বোচ্চ গতির চাইতে পৃথিবী কমপক্ষে আড়াইগুণ বেশি গতিসম্পন্ন সেহেতু রকেটটি ফিরে এসে দেখত 'সেখানে আর সেখানটি নেই'।

বিজ্ঞানের গবেষণায় বস্তুধর্মের নিয়মনীতি অনুযায়ী জীবদেহের উপাদান-এনজাইম তৈরীর সম্ভাব্যতা ১:১০^{৭৮}। অর্থাৎ ১-এর পরে ৭৮টি শূন্য দিয়ে যে বিশাল সংখ্যা আসে তত বার সম্ভবনাহীনতার পর এনজাইম তৈরীর সম্ভবনা আসে মাত্র ১ বার। এছাড়া প্রোটিন বা আমিষ-অণু তৈরীর মূল উপাদান এ্যামাইনো এসিড উৎপাদনের সম্ভবনা বৈজ্ঞানিক ফ্রেড হোয়েলের হিসেব অনুযায়ী ১:১০^{৪০,০০০}। অর্থাৎ ১-এর পরে ৪০ হাজার শূন্য দিয়ে যে মহাবিশাল সংখ্যাটি আসে তত বার সম্ভবনাহীনতার পর এ্যামাইনো এসিড সৃষ্টির সম্ভবনা আসে মাত্র ১ বার। ফলে অবাধ রীতিতে একটা আমিষ-অণু তৈরীর সম্ভবনা একেবারেই কল্পনাতীত। এরূপ সম্ভবনাহীনতার মধ্যেও আমাদের চারিদিকে আমিষ অণু সমৃদ্ধ প্রাণের ছড়াছড়ি বিজ্ঞান জগতে যেন এক অবাক-মহাবিস্ময়। বিজ্ঞানের এ সকল গবেষণাই যেন আমাদেরকে প্রমাণ করে দেয় সুশৃঙ্খল সৃষ্টি জগতের পিছনে একজন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন অদৃশ্য মহাবিজ্ঞ স্রষ্টার হাত অবশ্যই কার্যকর। যুক্তিযুক্তভাবেই ঘটনাস্থলে, এক আল্লাহ এসে যাচ্ছেন। সুতরাং সত্যের খাতিরে এখানে স্রষ্টাকে মেনে নিতেই হয়। আবার ইসলামকে বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনো উপায়ও থাকে না।

বিজ্ঞান বুঝতে পেরেছে স্রষ্টার ভাষা

একুশ শতকের শুরুতে বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার হচ্ছে 'জেনেটিক কোড' যা চন্দ্র অভিযান বা মহাশূন্য অভিযানের চেয়েও বিস্ময়কর সাফল্য। বিজ্ঞানীরা প্রাণী ও উদ্ভিদের জেনেটিক কোড আবিষ্কার করে বিশ্বকে তাক-লাগিয়ে দিয়েছে।

কম্পিউটার এবং দেহযন্ত্র উভয়ই চলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। কম্পিউটার চলে মাত্র দুটি ইলেকট্রনিক্স ডিজিট দিয়ে এবং দেহযন্ত্র চলে চারটি রাসায়নিক ডিজিট দিয়ে। ইটের পর ইট দিয়ে যেমন দালান তৈরি হয়, তেমনি কোষের

www.pathagar.com

পর কোষ দিয়ে তৈরি হয় জীবদেহ। একজন মানুষের দেহে এ কোষের সংখ্যা ধরা হয় ১০ হাজার কোটি। প্রতিটি কোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। এ ৪৬টি ক্রোমোজোমে থাকে প্রায় লাখখানেক জিন। এ ক্রোমোজোম ও জিনগুলোর উপাদান হলো ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড বা ডি. এন. এ। এই ডি. এন. এ-তে থাকে সেই চারটি রাসায়নিক ডিজিট বা নিউক্লিওটাইড এডিনিন, থাইমিন, সাইটোসিন ও গুয়োনিন, সংক্ষেপে এ.টি.সি.জি। এ চারটি নিউক্লিওটাইডের যে কোন তিনটি মিলে একটি গ্রুপ বা কোডন তৈরি হয়। এ.টি.সি.জি নানাভাবে সজ্জিত হয়ে মোট (৪×৪×৪)=৬৪টি কোডন তৈরি করতে পারে। এ ৬৪টি কোডনের মধ্যে যে কোনো ৬১টিই কোনো না কোনো এ্যামাইনো এসিড তৈরির সংকেত বা নির্দেশ দেয় এবং বাকি ৩টি ওই এ্যামাইনো এসিডগুলো একজোট হয়ে তা দিয়ে পলিপেপটাইড শিকল তৈরি শুরু ও শেষ হওয়ার সংকেত দেয়।

জীবদেহে ২০ রকমের এ্যামাইনো এসিড থাকে। যার প্রত্যেকটি (২টি ছাড়া) তৈরিতে একাধিক কোডনের সংকেত লাগে। ৬৪টি কোডনের একটি দল মিলে এ্যামাইনো এসিড তৈরি ও পলিপেপটাইড শিকল তৈরির সংকেত দেয়, এ একেকটি দলকেই জেনেটিক কোড বা জিন মানচিত্র বা জিন সংকেত বলা হয়। ডি.এন.এ-তে এ রকম একটি কোড গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সেটা অনুলিপি হয়ে বার্তা বাহক আর. এন. এ বা রাইবো নিউক্লিক এসিডে পরিণত হয়। জেনেটিক কোডের পলিপেপটাইড শিকল তৈরির এ বার্তাটি আর.এন.এ-র মাধ্যমে কোষের রাইবোজমে পৌঁছে এবং সেখানে প্রথমে পলিপেপটাইড ও পরে প্রোটিন তৈরি হয়। এ প্রোটিনই হল দেহ গঠনের মূল উপাদান।

www.pathagar.com

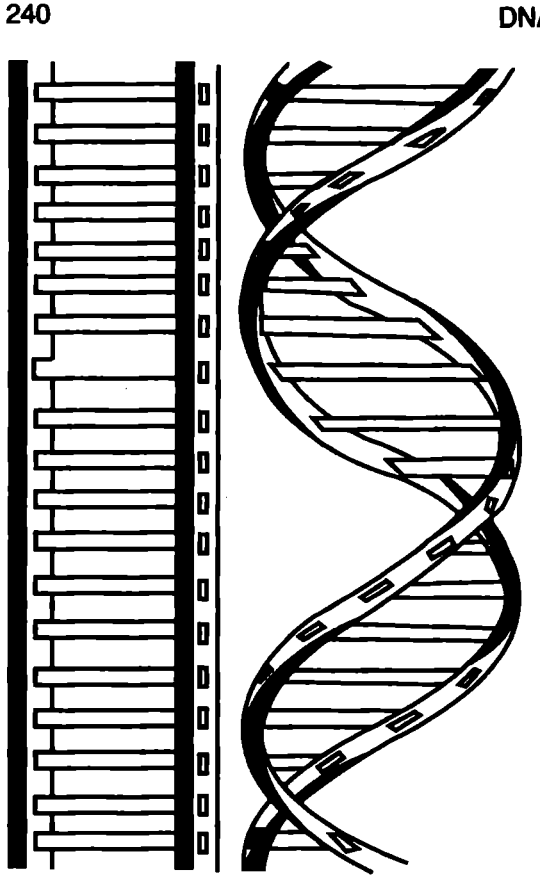

Double helix এর সংগঠনে জেনেটিক কোড বা জিন মানচিত্র

মানব দেহে প্রায় ৫০ হাজার বিবিধ রকমের প্রোটিন আছে যা কেবল ২০টি মৌলিক এ্যামাইনো এসিড থেকে উৎপন্ন। দেহের কোন কোষে কোন মুহূর্তে কোন প্রোটিন বা ভিটামিন তৈরি হবে বা না হবে সেটা নির্ভর করে এটিসিজিগুলোর সজ্জা-বিন্যাস বা জিন মানচিত্রের ওপর। এ জিন মানচিত্র আসলে এক প্রকার জৈব রাসায়নিক নির্দেশনা, যার আকর্ষণ আসে অদৃশ্য থেকে।

www.pathagar.com

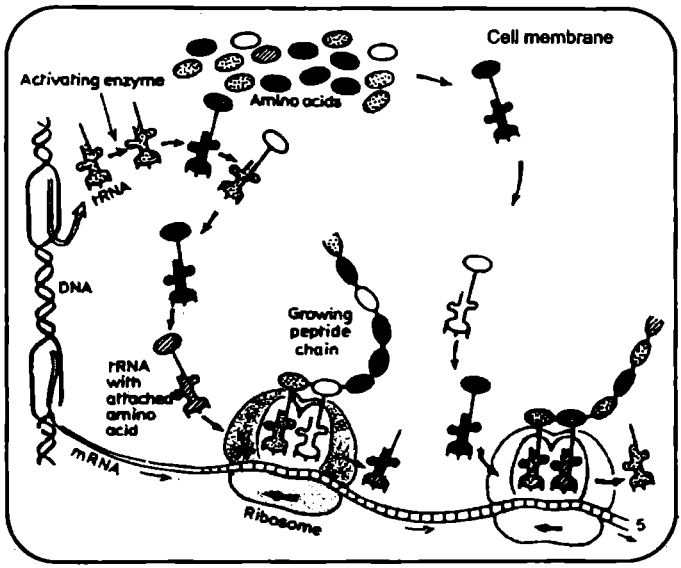

DNA-এর নির্দেশে এনজাইম গুচ্ছ এমাইনো এসিডকে বিভিন্ন উপায়ে একটি ব্যাকটেরিয়ায় রূপান্তরিত করছে।

মানবদেহে ১০ হাজার কোটি কোষের প্রত্যেকটিতে এটিসিজির সংখ্যা প্রায় ৩০০ কোটি। এ ৩০০ কোটি এটিসিজি থাকায় এর সজ্জা বিন্যাস হতে পারে ২৫৬-এর পর ২৪০ কোটি সংখ্যক শূন্য দিলে যে মহা-বিশাল সংখ্যাটি হয় তত প্রকারে। এ সংখ্যা এত বিশাল যে তা লিখতে একটা মানুষের ২৪ ঘন্টা বিশ্রামহীনভাবে ৪৫টি বৎসর সময় লাগবে এবং তা দ্বারা প্রায় ২৪ লক্ষ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ তৈরি হবে। বিষয়টি মহাশক্তিশালী স্রষ্টার অনুসন্ধান করে। আর এভাবেই সুদৃঢ় হয় বিজ্ঞান ও ধর্মের ঐক্য।

মানব দেহের একটি মাত্র কোষেই পাঁচ শত কোটি বিবিধ তথ্য আছে। পুস্তকে রূপ দিলে তা প্রায় সহস্রাধিক গ্রন্থের একটা বিশাল লাইব্রেরির সমান হবে। আর একটা মানুষের পূর্ণ দেহ যতগুলো তথ্যে গঠিত তা প্রায় লক্ষ-কোটি লাইব্রেরীতে রক্ষিত যাবতীয় পুস্তকের তথ্যের সমান। জিন মানচিত্রের এ মহা-বিশাল সংখ্যক পার্থক্যের সম্ভবতা থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য ঘটে খুবই সামান্য, শতকরা .০১ ভাগ মাত্র। আর একজন মানুষের সাথে অন্য একজন মানুষের জিন-মানচিত্রের মিল থাকে শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ। শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ মিল থাকা সত্ত্বেও মাত্র .০১ ভাগ জিন-মানচিত্রের পার্থক্যের কারণে যেখানে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের একজনের সাথে

www.pathagar.com

অন্যজনের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে একজন স্রষ্টাকে উপস্থিত রেখেই ৯৯.৯৯ ভাগ সম্ভাব্য পার্থক্যের কথা ভাবতে হয়।

জিন মানচিত্রের বিচিত্র রকমের পার্থক্য ঘটার সুবিশাল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বংশক্রমের এই 'অপরিবর্তিত ধারা' কুরআনের বাণীর দিকেই নির্দেশ করে,

"আমি তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারি এবং এরূপ আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি যা তোমরা মোটেও অবগত নও" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৬১)।

এমন আরও অনেক অজানা-অজ্ঞাত কারণ রয়েছে যা জীবমণ্ডলের চেনা মুখকে, চেনা স্বভাবকে একেবারেই অচেনা করে দিতে পারে, সেক্ষেত্রে মানুষের কিছুই করার থাকে না; এখানে সহজেই প্রাধান্য পেয়ে যায় ডারউইনের থিওরী (এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী)। অথচ যুগ যুগ ধরে জীবের অপরিবর্তিত বংশধারা জ্ঞানী সমাজকে মহাবিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। জগত-বিজ্ঞানীগণ হয়তো আজ নতুন করে এভাবেই আবার এ মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছেন। "চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যই আমি ঐসব নিদর্শন ব্যক্ত করে থাকি" (সূরা আল আনআম ঃ ২৬)। "বিশ্ববাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন"-সূরা আয যারিয়াত ঃ ২০। "তোমাদের নিজেদের (দেহের) মধ্যেই তো (অসংখ্য নিদর্শন) রয়েছে, তোমরা কি দেখতে পাও না?" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ২১)।

জীববিজ্ঞানীদের দাবি অনুযায়ী শুধু খনিজ জ্বালানীতেল থেকে পরিবেশ-দূষণেই ক্যান্সার জাতীয় রোগ মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করতে পারে। এ ছাড়া পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়া ও অন্যান্য বহুবিধ কারণ রয়েছে এবং বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনকারী প্রভাব জেনেটিক্সের পরিবর্তন এনে মানুষ প্রজাতির ধারা-প্রবাহকে অকল্পনীয় পরিবর্তন করতে সক্ষম। অথচ ভিটামিন সি, সোডিয়াম সেলিনাইটসহ প্রায় ২০০টি জ্ঞাত এবং অসংখ্য অজ্ঞাত সূক্ষ্ম বস্তুকণা আমাদের অলক্ষ্যে জীবকুলের অপরিবর্তিত বংশধারা বজায় ও ক্যান্সার জাতীয় রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত থেকে জানিয়ে দেয় "তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন" (সূরা লুকমান ঃ ২০)।

জেনেটিক কোড বা জিন মানচিত্রের উপর নির্ভর করে মানব প্রকৃতি। এটা হচ্ছে স্রষ্টার নিজস্ব নিয়ম বা নিজস্ব ভাষা। লক্ষ-কোটি উপায়ে জীব দেহের জিন-বিন্যাস পুনঃবিন্যাসের বিপুল সম্ভাবনা এবং পরিবর্তনের মহাপ্রশস্ত পরিবেশগত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে জীবকুলের প্রজাতি

www.pathagar.com

রক্ষা করার কুরআনিক ওয়াদা হচ্ছে "আল্লাহর বিধানে তুমি কখনও কোনো প্রকার পরিবর্তন দেখবে না" (সূরা আল ফাত্হ ঃ ২৩)। আল্লাহর প্রকৃতি! যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই" (সূরা আর রূম ঃ ৩০)। " যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর উপযোগী করেছেন" (সূরা আল আ'লা ঃ২)।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন যে তারা স্রষ্টার ভাষা বুঝতে পেরেছেন। তাদের দাবি অনুযায়ী তারা স্রষ্টার সৃষ্টিকৌশলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। অথচ আল কুরআনে বলা হয়েছে- "তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে? বলে দাও, রূহ আমার রবের আদেশ সংঘটিত ব্যবস্থা এবং তাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান-দেয়া হয়েছে" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)। জিন মানচিত্র বা বিভিন্ন প্রোটিন তৈরির জৈব-রাসায়নিক নির্দেশনাই বলে দেয় 'প্রাণ' স্রষ্টার আদেশ ঘটিত অলৌকিক ব্যবস্থা বা নির্দেশনা। যুগান্তকারী এ আবিষ্কারই আজ বিজ্ঞানীদেরকে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি কৌশলের খুব কাছাকাছি এনে দিয়ে স্রষ্টায় বিশ্বাসের পথকে আরো সুগম করেছে। আর এভাবেই সুদৃঢ় করছে বিজ্ঞান ও ধর্মের ঐক্য-বন্ধন। বিজ্ঞান ঘোষণা করছে ইসলাম আর শুধু ঠুনকো বিশ্বাসের বিষয় নয়। প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য ফিরে তাকাতেই হয় কুরআনের ঐশীবাণীর দিকে।

ক্লোনিং পদ্ধতি

সম্প্রতি দুটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানবভ্রূণে স্টেমসেল নামের এক শ্রেণীর আদি কোষকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেটা আস্তে আস্তে দেহের যে কোনো শ্রেণীর কোষের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে। ওই আদি কোষ চামড়া থেকে শুরু করে হৃদপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের কোষে বিস্তার লাভ করতে পারে। স্টেমসেল নামের ওই আদি কোষ প্রকৃতপক্ষে প্রোটোপ্লাজমের ভগ্নাংশ বা প্রাণ কোষের মূল উপাদান। মানব দেহে দুই'শ দশ ধরনের বিভিন্ন টিস্যু রয়েছে। ওই আদি কোষ দেহের বিভিন্ন ধরনের টিস্যুর মধ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এর সাহায্যেই নতুন করে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ তৈরি করা সম্ভব হবে। এই স্টেমসেল বা আদি কোষের ব্যবহার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যুগান্তকারী চরম উৎকর্ষের ধারায় রোগ প্রতিরোধ, নিরাময়, দেহের বংশগত বা জন্মগত যে কোনো প্রকার ত্রুটি দূর করাসহ ক্লোনিং পদ্ধতিতে আস্ত মানবও তৈরি সম্ভব হবে। এখন এটা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে এখানে নৈতিকতার প্রশ্ন আসে, কারণ এ

www.pathagar.com

স্টেমসেল সংগ্রহ করা হয় মানব-ভ্রুণ থেকে, যা পাওয়া যায় গর্ভপাত কেন্দ্র বা এ্যাবারশন ক্লিনিক ও ফার্টিলিটি ক্লিনিকগুলোতে।

এর পরেও নৈতিকতার বাধার মুখে থেমে থাকেনি বিজ্ঞান। ইতোমধ্যে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে ভ্রুণ তৈরির উপাদান। তাহলে কি মানুষ এখন নিজেকেই নিজের স্রষ্টা বলে দাবি করবে? নাকি প্রাণবন্ত এ পৃথিবীসহ নিজেকে কারণের ফল বলবে? অথবা অন্য কোন গ্রহের অতি বুদ্ধিমান জীব, যারা বহুপূর্বেই স্টেমসেল ও মানব তৈরির কলা কৌশল আয়ত্ত করেছে, তাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে? তাহলে এখানে আবার প্রশ্ন আসে, অন্য গ্রহের অতিবুদ্ধিমান জীবগুলোর স্রষ্টা কে ? "তোমাদের নিজেদের (দেহের) মধ্যেই তো (আল্লাহকে চেনার অসংখ্য নিদর্শন) রয়েছে তোমরা কি দেখতে পাও না?" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ২১)। মানুষ উপাদানের ব্যবহার ও পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম কিন্তু কোনো উপাদান সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। আর আল্লাহ বলেছেন-"আমি তোমাদেরকে অস্তিত্বে এনেছি অস্তিত্বহীন থেকে" (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৭)। প্রাণের অস্তিত্বটি আল্লাহ পাকের সরাসরি আদেশজাত, তাই আজও আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার মাঝেও রয়েছে বোধগোম্যতার অন্তরালে জ্ঞানহীন অব্যাখ্যাত শূন্যতা।

আকাশ সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ

কুরআনে আল্লাহ সরাসরি প্রস্তাব করেছেন-"তিনি আকাশকে নির্মাণ করেছেন সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ" (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩২। "আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বসবাসের স্থান এবং আকাশকে করেছেন ছাদ, -----" (সূরা আল মু'মিন ঃ ৬৪)। "আসমানকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ বিশিষ্ট; কিন্তু ওরা তাঁর নিদর্শনরাজী হতে বিমুক্ত" (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩২)। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ আকাশে আলাদা সুরক্ষিত ছাদ স্থাপন করার কথা বলেন নাই বরং সমস্ত আকাশটাকেই 'সুরক্ষিত ছাদ' বলে উল্লেখ করছেন। আয়াত প্রস্তাবে এরূপ সুস্পষ্টতা থাকা সত্ত্বেও আমরা সুদূর আকাশে পৃথক সাতটা অভেদ্য কঠিন ছাদ খুঁজে পেতে চাই। অথচ আমরা আমাদের উর্ধ্বে কোনো সুরক্ষিত কঠিন ছাদ চোখে দেখি না। এমন কি প্রায় একহাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়লেও এরূপ কোনো কঠিন দৃশ্যমান অভেদ্য ছাদ বিজ্ঞানের চোখে আজ পর্যন্ত ধরা পড়ে নাই। তবে বিজ্ঞানের আশির্বাদেই আমরা জ্ঞান দ্বারা যুক্তিযুক্তভাবে

www.pathagar.com

অনুভব করতে পারি সত্যই আল্লাহ 'আকাশকে নির্মাণ করেছেন সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ'।

পৃথিবীকে আঘাত হানার জন্য প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০ লক্ষ উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসে। উল্কাপাতের পরিণতি আমরা জানতে পারি পার্শ্ববর্তী মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহ 'ফোবোস' থেকে। ফোবোস হচ্ছে মঙ্গলের দুটি উপগ্রহের একটি, যার বায়ুমণ্ডলীয় নিরাপত্তা ছাদ না থাকায় সেখানে প্রতিনিয়ত উল্কাপাত ঘটে। ফলে এর উপরিভাগ অবিশ্বাস্য রকমের মিহি নিউক্লিয়ার ধুলোয় আচ্ছাদিত। অথচ পৃথিবীর ক্ষেত্রে বায়মণ্ডলীয় অদৃশ্য প্রতিরোধতায় ঢুকে পরার সাথে সাথে বাতাসের ঘর্ষণে উল্কাপিণ্ডগুলো নিঃশেষ-ভস্মে পরিণত হয়। আর সেই সাথে পৃথিবীকে উল্কাপাত থেকে নিরাপত্তা দিয়ে বায়ুমণ্ডলীয় আকাশ পরিচয়-প্রমাণ দেয় 'সুরক্ষিত ছাদ' হিসেবে।

আমরা জানি সূর্যে প্রতিমুহূর্তে হাজার হাজার বিস্ফোরণ ঘটে। যার প্রতিটা বিস্ফোরণ প্রায় লক্ষ লক্ষ পারমাণবিক বোমার শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সৌরগ্যাস-ধূলিকণা নিক্ষেপ করে। এ নিক্ষিপ্ত সৌরগ্যাস-ধূলিকণা বা সৌরবায়ু সেকেন্ডে প্রায় ৫০০ মাইল গতিতে ধাবিত হয়ে কমবেশি ১০ দিনের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিতে পৃথিবী এলাকায় আঘাত হানে। সৌরবায়ু জীবদেহের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে দেহকোষের মৃত্যু বা বিকৃতির ফলে ঘাতক মরণব্যাধি ক্যান্সার অনিবার্য। আমাদের অজান্তে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল 'সুরক্ষিত ছাদ' হিসেবে প্রচণ্ড প্রতাপে সৌরবায়ুকে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার আমাদেরকে জানিয়ে দেয়, মহাশূন্য শুধু-শুধু শূন্য নয় বরং মহাশূন্য অসংখ্য শক্তি-কণা বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণায় ভরপুর এক মহাবিশাল সমুদ্র। সেখানে প্রতি সেকেন্ডে প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ৪/৫টি শক্তি-কণা তীব্র গতিতে আঘাত হেনে দেহকোষকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। অথচ তীব্র গতিসম্পন্ন এ সকল চার্জযুক্ত প্রাণঘাতী সূক্ষ্ম শক্তি-কণিকাগুলো প্রাণকে বাঁচাতে পৃথিবীর 'সুরক্ষিত ছাদের' প্রভাবে চৌম্বক শক্তির সাথে আশ্চর্যজনকভাবে সমন্বিত হয়ে জীবমণ্ডলের বসবাসকারী নিরক্ষীয় অঞ্চল ছেড়ে প্রাণশূন্য মেরু অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। তার পরেও যে সমস্ত শক্তি-কণা পৃথিবীর চৌম্বক শক্তিকে উপেক্ষা করে ধেয়ে আসতে থাকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের জীবমণ্ডলের দিকে, সেখানেও রয়েছে এক অদৃশ্য বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা। বায়ুমণ্ডলের এক একটি স্তরে এক একপ্রকার ক্ষতিকর শক্তি-কণা বিশোষিত হয়ে পড়ে। যেমন-দূরবর্তী অতি বেগুনী রশ্মি বায়ুমণ্ডলীয় E-region-এ শোষিত হয়, এক্স-রে E-region-এ বিশোষিত

www.pathagar.com

হয় এবং কোসমিক-রে স্ট্রেপটোস্ফেয়ার এবং ট্রপোস্ফেয়ার-এ বিশোষিত হয়। কি আশ্চর্য এ বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা! সেখানে ক্ষতিকর আলোক রশ্মির প্রবেশাধিকার না থাকলেও পরিমিত কল্যাণকর আলোকরশ্মির প্রবেশাধিকার ঠিকই আছে। "তোমাদের উর্ধ্বে নির্মান করেছি সুদৃঢ় স্তরসমূহ" (সূরা আন নাবা ঃ ১২)।

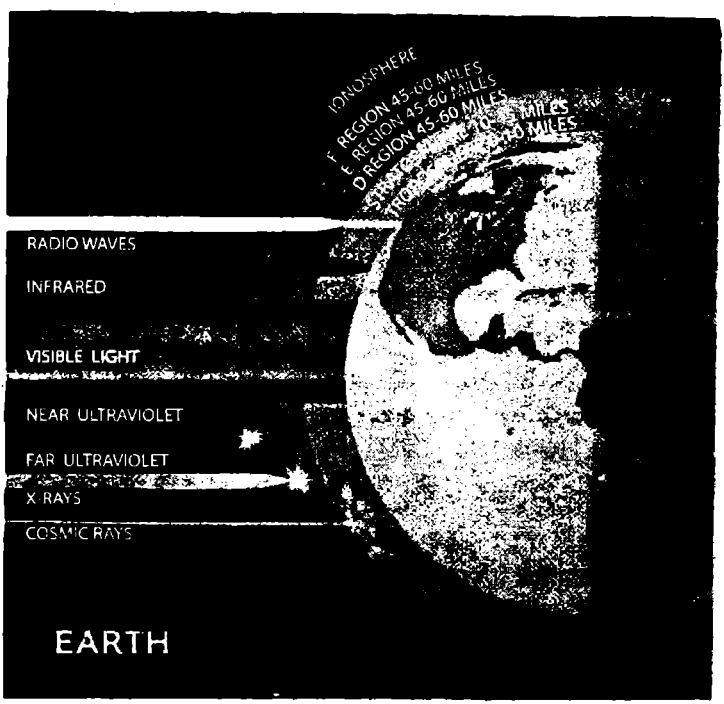

বায়ুমণ্ডলীয় অদৃশ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা উল্কাপতন, জীবনঘাতী মহাজাগতিক রশ্মি, সৌরবায়ু এবং সূর্যের ক্ষতিকর অবলোহিত রশ্মির উত্তাপ থেকে জীবনকে সুকৌশলে রক্ষা করে চলেছে।

আমরা জানি নির্দিষ্ট মাত্রার প্রাণদানকারী ইনফ্রারেড-রে বা অবলোহিত রশ্মির অতিমাত্রাই আবার হয়ে যায় প্রাণঘাতী। সূর্য থেকে আগত সবটুকু অবলোহিত রশ্মি সরাসরি পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়লে সবকিছু ভস্মে পরিণত হয়ে যেত। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণঘাতী অবলোহিত রশ্মিকে ছেঁকে প্রাণদানকারী নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। আবার যদি ঐ বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রাণদানকারী নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

মাত্রার অবলোহিত রশ্মিকে নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কমিয়ে দিত তাহলে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চারই হতো না। পৃথিবীটা ধীরে ধীরে শীতলতার দিকে এগিয়ে বরফ পিণ্ডে পরিণত হয়ে জলযান চলাচল অনিশ্চিত-অসম্ভব হয়ে পড়ত।

দিনের বেলায় সৌরকিরণ থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে যে তাপ সঞ্চারিত হয়, তার শতকরা ২০ ভাগ তাপ বায়ুমণ্ডলে আটকা পড়ে। ফলে রাতের বেলায় পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হিমাঙ্কে পৌঁছাতে পারে না, বরং জীবন ধারণের মত উষ্ণ থাকে। যদি বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকত তবে পৃথিবীপৃষ্ঠের সঞ্চিত তাপমাত্রা রাতের বেলায় সম্পূর্ণ হারিয়ে হিমাঙ্কে পৌঁছে যেত। ফলে পৃথিবীতে জীবের জন্ম হত এক দুরূহ ব্যাপার। এক্ষেত্রেও সমস্ত জলরাশি বরফপিণ্ডে পরিণত হয়ে জলযান চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ত। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় আনলেই আমরা পেয়ে যাই পৃথিবীর 'প্রতিরক্ষা ছাদের' ঠিকানা। উল্কা পতন, সৌর বায়ু, মহাজাগতিক ক্ষতিকর রশ্মি ইত্যাদি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করে যে বায়ুমণ্ডল জীবনের জন্ম, প্রতিরক্ষা ও প্রতিপালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সেই বায়ুমণ্ডলকে আমরা যুক্তিযুক্তভাবেই 'প্রতিরক্ষা ছাদ' বলতে পারি।

পৃথিবীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সকল প্রকার বোঝা বহন বা আঘাত সহ্য করতে হয় একা বায়ুমণ্ডলকে। প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে ঘোর অজ্ঞতার যুগের এমন একটি জটিল বিষয়ের প্রস্তাবনাকে আজকের বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে এসে অলৌকিক বলে স্বীকার করতেই হয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে যদি আমরা আবার আল কুরআনের দিকে দৃষ্টি ফিরাই তাহলে সেখানেও আমরা অনুরূপ আরও ইঙ্গিত পাই-"প্রতিরক্ষা ও আশ্রয়দানকারী বায়ুমণ্ডলের শপথ" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ১)। "অতিগুরুতর বোঝা বহনকারীর শপথ" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ২)।

"কৃতকার্যতার সাথে স্বাচ্ছন্দে চলমানের শপথ" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ৩)। "নির্ধারিত বণ্টন পদ্ধতির শপথ" (সূরা আয যারিয়াত ঃ৪)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো যেন বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিরক্ষা ছাদের প্রতিই ইঙ্গিত করে। আয়াতগুলোর মূল শব্দসমূহের সবগুলো অর্থ নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে সেখানে সন্দেহাতীতভাবে আমরা একটা সুরক্ষিত নিরাপত্তা ছাদের সন্ধান পেয়ে যাই। পেয়ে যাই ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা জীবনময় পৃথিবীকে রক্ষার জন্য এক মহাকুশলীর অতিনাজুক-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমন্বয় ব্যবস্থা। এ সমন্বয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার লক্ষ কোটি উপায় থাকা সত্ত্বেও যেন এক মহাকুশলীর ইশারায় মহাসূক্ষ্ম একটা নাজুক উপায়ের ওপর জীবনময় পৃথিবীটা দণ্ডায়মান। সামান্য একটু এদিক-সেদিক হলেই ভেঙ্গে পড়তে পারে জীবনময়তার এ সমন্বয় ব্যবস্থা। সৃষ্টিজগতটা পরিণত হয়ে যেতে পারে এক জ্ঞানহীন নির্বোধ-বোবা প্রকৃতির অপরিকল্পিত বিশৃংখল মহাবিশ্বে। কাজেই একজন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানময় মহাকুশলীর উপস্থিতি ছাড়া এমন সুশৃঙ্খল

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের কল্পনাই করা যায় না। প্রকৃত সত্যকে খুঁজে পেতে হাত বাড়াতেই হয় কুরআনের বাণীর দিকে। "মহা বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ" (সূরা ইয়াসীন ঃ ২)।

সাত স্তর আসমান-জমিন

"সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি 'জগতসমূহের' রব" (সূরা ফাতেহা ঃ ১)। এখানে মহাবিজ্ঞানময় আল কুরআনের শুরুতেই বহুজগতের ধারণা দেয়া হয়েছে। আল কুরআনের বহু স্থানে 'জগতসমূহ, আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল' এ বহুবচনমূলক শব্দগুলো এসেছে। যেমন–"... আর এতে সন্দেহ নেই যে, এটা 'জগত-সমূহের' রবের বিধানের বিশদ ব্যাখ্যা" (সূরা ইউনুছ ঃ ৩৭)। "(আল-কুরআন) জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ" (সূরা যুমার ঃ ২)। "মহান আল্লাহই 'জগতসমূহের রব" (সূরা আল মুমিন ঃ ৬৪)। "এটা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ" (সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৪৩)। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আবার এ 'জগতসমূহকে' সাত দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, "আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তর আকাশ এবং অনুরূপ সংখ্যায় যমীন----" (সূরা তাহরীম ঃ ১২)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে আমরা সাত স্তর আসমান এবং সাত স্তর যমীনের ধারণা পাই। অবশ্য গ্রীক ও রোমানদের মত আরবরাও সাতকে একটি প্রতীক সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন, যার অর্থ বহু কিংবা অসংখ্য। কিন্তু ইসলাম বলে আল্লাহ এক-অসীম, আল্লাহর রাজ্যও এক-অসীম। এদিকে আবার বিজ্ঞানও বলে আকাশ বা শূন্যতা অসীম। তবে সম্প্রতি বিজ্ঞান বহুজগতের কথা ভাবতে শুরু করেছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রমাণ করেছে সৃষ্টিজগত সম্প্রসারণশীল। সৃষ্টির শুরুতে মহাবিস্ফোরণের ফলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শুরু হয় এবং কোটি কোটি বছর ধরে বেলুন ফোলানোর মত গ্লোবাকারে সর্বদিকে তা প্রচণ্ড গতিতে (প্রায় ২৫০০০ মাইল/সেকেন্ড) সম্প্রসারিত হচ্ছে, যার কোনো শেষ নেই।

এই অসীম আসমানকে একটার উপর আর একটা এভাবে সাতটা ছাদ বা সাতটা রেখা টেনে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ অসীমের মধ্যে এ ছাদ বা রেখাও হয়ে যাবে অসীম। আবার যমীন বলতে আমরা সাধারণভাবে আমাদের এ পৃথিবীর পৃষ্ঠটাকেই বুঝি। এ যমীনকে সাতটা স্তরে বিভক্তির বিষয় বুঝতে হলে পৃথিবীর গঠন প্রকৃতি বুঝতে হবে। অবশ্য অনেকেই আমাদের এ ভূ-পৃষ্ঠের মত আরও ছয়টা স্তর পৃথিবীর মাটির নিচে খুঁজে পেতে চান, কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব এর সঠিক ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেন না। তারা বলেন-'কুরআনে জমিনের সাতটা স্তরের কথা বলা হয়েছে, কাজেই জমিনের নিচে এরূপ সাতটা স্তর আছে এটা বিশ্বাস করতে হবে, এর কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই'। এ বিষয়টি পৃথিবীর গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে জানা

www.pathagar.com

শিক্ষিত লোকদের কাছে বড়ই বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। কারণ বিজ্ঞান মাটির নিচে ভূপৃষ্ঠের মত এরূপ সাতটা স্তর প্রমাণ করতে পারে না। মাত্র ৮,০০০ মাইল ব্যাসের গ্লোবাকৃতির এ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ভূ-কেন্দ্রের গভীরতা মাত্র ৪০০০ মাইল। ভূ-বিজ্ঞানীগণ ভূ-ত্বক থেকে শুরু করে ভূ-কেন্দ্র পর্যন্ত এই চার হাজার মাইলের বিস্তৃতিকে মোটামুটি অশ্বমণ্ডল, গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(১) অশ্বমণ্ডল–অশ্বমণ্ডল বা শিলামণ্ডলটি বিভিন্ন প্রকার শিলা ও খনিজ উপাদানে গঠিত। এই মণ্ডলের গড় গভীরতা বা বিস্তৃতি ৬৫ কিলোমিটার। অশ্বমণ্ডলের উপরি ভাগের হালকা ও কঠিন আবরণকে ভূ-ত্বক বলে। ভূ-ত্বকের গড় গভীরতা বা বিস্তৃতি মাত্র ১৬ কিলোমিটার এবং এর বাকি ৪৯ কিলোমিটার উত্তপ্ত এবং আংশিক গলিত লাভা। কারণ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রতি ১০০০ ফুট গভীরতায় ১৬° ফাঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। সে মতে ১৬ কিলোমিটার গভীরে ভূ- ত্বকের নিচের তাপমাত্রা প্রায় ৯০০° ফাঃ। অশ্বমণ্ডলের গড় অপেক্ষিক গুরুত্ব তিন। অর্থাৎ এই মণ্ডলের বস্তুর গড় ওজন পানি অপেক্ষা তিনগুণ বেশি।

(২) গুরুমণ্ডল–অশ্বমণ্ডলের নিচে ২৮৯৫ কিলোমিটার বিস্তৃত এ অংশকে গুরু মণ্ডল বলে। অশ্বমণ্ডলের চেয়ে গুরুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেশি এবং এর পুরোটাই গলিত লাভা। গুরুমণ্ডলের বস্তুর গড় ওজন পানি অপেক্ষা আট গুণ বেশি।

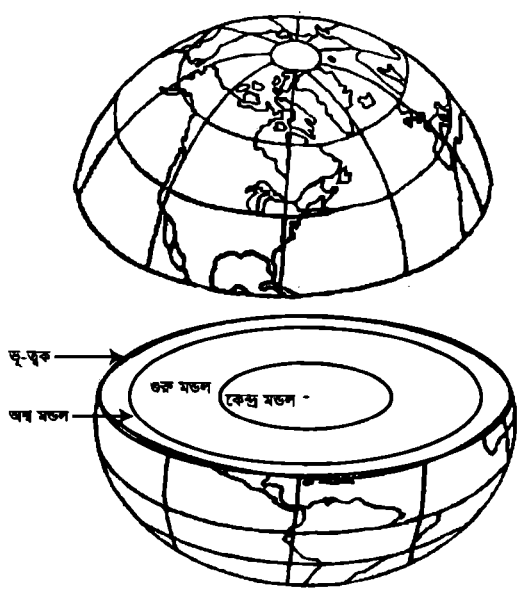

ভূ-ত্বকের তিনটি ভাগ।

www.pathagar.com

(৩) কেন্দ্রমণ্ডল– গুরুমণ্ডলের নিচ থেকে ভূ-কেন্দ্র পর্যন্ত ৩৪৭৫ কিলোমিটার বিস্তৃত অংশকে কেন্দ্রমণ্ডল বলে। এই মণ্ডলের বস্তুর গড় ওজন পানি অপেক্ষা এগার গুণ বেশি। কেন্দ্রমণ্ডলের তাপমাত্রা গুরুমণ্ডলের চেয়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে কেন্দ্র পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০০০০ সেঃ।

ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাড়ে সাত পাউন্ড এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে ভূ-কেন্দ্রে গিয়ে এর চাপ দাঁড়ায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ২,৬২,৫০,০০০ পাউন্ড। এত উচ্চ তাপ ও চাপে কোনো পদার্থই কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না; আবার তরল অবস্থায়ও থাকতে পারে না। কারণ চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে পদার্থের গলনাঙ্কও বৃদ্ধি পায়। ফলে এ মণ্ডলের পদার্থও গলিত লাভার ন্যায় থাকে।

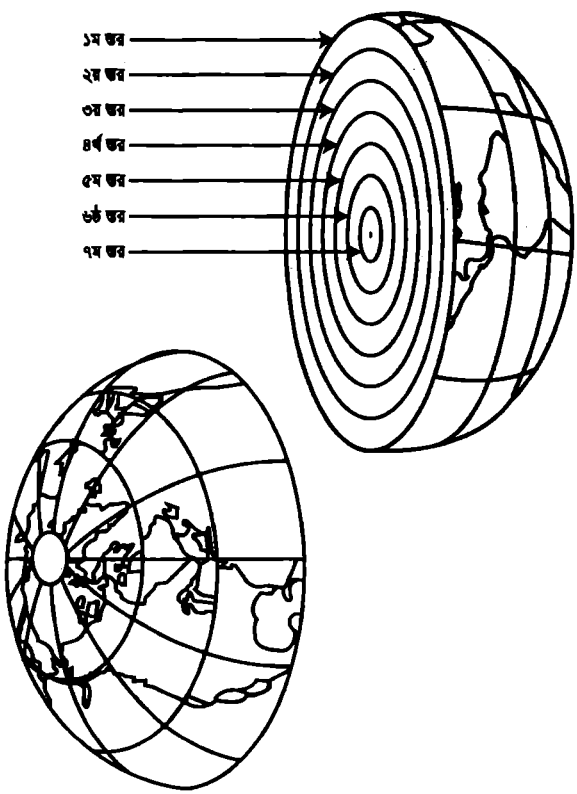

গ্লোবাকার পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিচে সাতটি স্তর ধরে বিভক্ত করলে চিত্রের ন্যায় মাত্র ৫৭১.৪২ মাইল বিস্তৃত এক একটি স্তর পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

পৃথিবীর উল্লিখিত তিনটি ভাগ থেকে জানা যায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রের দিকে তাপ, চাপ ও বস্তুঘনত্ব ক্রমান্বয়ে বেশি। ফলে ১৬ কিলোমিটার ভূ-ত্বকের নিচে থেকে ভূ-কেন্দ্র পর্যন্ত পুরোটাই কর্দমাক্ত গলিত লাভা এবং এর মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁকা বা বিশেষ কোনো কঠিন স্তর নেই। এখানে কিভাবে জমিন সাত বা বহুস্তরে বিভক্ত হবে এর ব্যাখ্যা দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের নিচে সাতটা স্তর ধরলে জমিনের সবগুলো স্তরই প্রথম আসমানের মধ্যেই অবস্থিত হয়, কারণ সমস্ত পৃথিবীটাই প্রথম আসমানের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় জমিন সম্পর্কিত কুরআনের প্রস্তাবটিকে বিবেচনায় এনে পৃথিবীর মাটির নিচে ভূ-পৃষ্ঠের ন্যায় ৭টি স্তর প্রমাণ করতে আমরা ব্যর্থ হই। তবু যদি আমরা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ভূ-কেন্দ্র পর্যন্ত স্তরে বিভক্ত করতে চাই তবে এক একটি স্তরের বিস্তৃতি হয় মাত্র ৪০০০÷৭=৫৭১.৪২ মাইল। জমিনের এক একটি স্তরের এত অল্প বিস্তৃতি ধর্ম মেনে নেয় না।

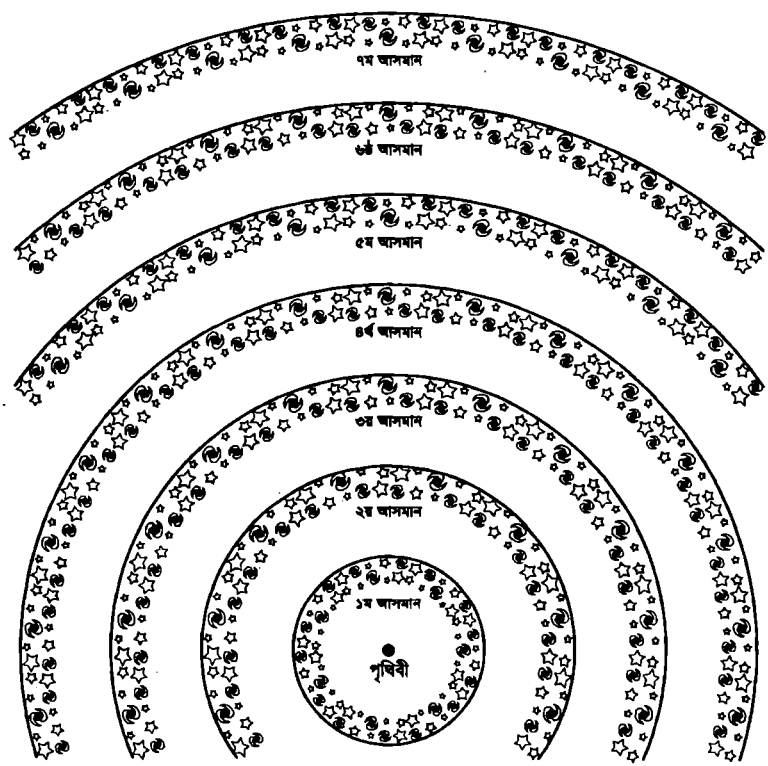

গ্লোবাকার পৃথিবীর উর্ধ্বে সাতস্তর আসমান ধরলে সবগুলো আসমান হবে গ্লোবাকৃতি

www.pathagar.com

আবার গ্লোবাকার পৃথিবীর উর্ধ্বে যদি সাতস্তর আসমান ধরা হয়, তাহলে আসমানগুলো হয় গ্লোবাকার এবং সৃষ্টিজগতটা হয়ে যায় পৃথিবী কেন্দ্রিক। তখন পৃথিবীটা হয়ে যাবে স্থির, যেহেতু পৃথিবীটা মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু কুরআন ও বিজ্ঞান তা কোনভাবে মেনে নেয় না। "এর মধ্যে সমস্তই (সৃষ্টিজগতের যাবতীয় বস্তুই) সঞ্চালনশীল" (৩৬ঃ৪০) ".....সৃষ্টিতে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই সন্তরণশীল একটি সুনির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত" (সূরা আর রা'দ ঃ ২, ৩১ঃ ২৯, ৩৫ঃ১৩)।

জগতসমূহ বা সাতস্তর আসমান ও সাতস্তর জমিন সম্পর্কিত কুরআনিক প্রস্তাবনাকে গবেষকগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ দৃশ্যমান সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র তারকারাজিকে আসমানের একটি স্তর ধরে ঊর্ধ্বাকাশে অভেদ্য মজবুত ছাদবিশিষ্ট মোট সাতটি স্তর আছে বলে ব্যাখ্যা করেন, যা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় গ্রহণযোগ্যতা পায় না। কারণ বিজ্ঞানের আশির্বাদে মানুষ আজ এগারো হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে এরূপ কোনো ছাদ দেখা সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো গবেষক প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিকে এক একটি জগত ধরে বহুজগত বা বহু আসমানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ পৃথিবীর উর্দ্ধে বায়বীয় সাতটি স্তরকে সাত স্তর আসমান ধরে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সাতস্তর আসমানের এরূপ কিছু কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও সাতস্তর জমিন সম্পর্কে তেমন কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

কুরআনের 'সাত স্তর বা জগতসমূহের' প্রস্তাবনাগুলোর সাতকে প্রকৃত অর্থে ধরলে আসমান-জমিনের সাত সাতটা স্তর খুঁজে পেতে হবে। আসমান-জমিনের স্তর সাতটাই হোক বা বহুই হোক, স্তর বিভাজনের ব্যাখ্যা অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। তবে এখন পর্যন্ত আমরা গবেষকদের কাছ থেকে এমন কোনো তথ্য পাইনি যা বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা পেতে পারে। যে সকল গবেষক প্রত্যেকটি দ্বীপজগত বা গ্যালাক্সিকে এক একটি স্তর ধরে বহু আসমানের প্রস্তাব করেছেন তাঁদের এ প্রস্তাবনা বৈজ্ঞানিক যুক্তির কাছাকাছি এসেও ম্লান হয়ে যায় যখন রাসূল সা.-এর মেরাজ সম্পর্কিত কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়। মেরাজের ব্যাখ্যায় হাদিসে ১ম, ২য়, ৩য় এভাবে ৭ম আসমানের ধারাবাহিক উল্লেখ আছে এবং ৭ম আসমানে আল্লাহর সাথে রাসূল সা.-এর কুদরতি সাক্ষাতের কথাও বলা হয়েছে। এখানে বহু-স্তর আসমানের পরিবর্তে প্রকৃত সাতটা স্তরের কথাই প্রমাণ হয়। তাই আসমানের বহুস্তরের প্রস্তাবনা এখানে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে বহু আসমান এবং বহু-স্তর আসমানের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। বহু

www.pathagar.com

আসমান বলতে সমপর্যায়ের অনেকগুলো আসমানকে বুঝায়, কিন্তু বহু-স্তর আসমান বলতে সংগঠন ভিত্তিক স্তরও বুঝানো যেতে পারে। যেমন- গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, দেশ, মহাদেশ ইত্যাদি।

আসমান সম্পর্কে বার্নাবাসের বাইবেলে বলা হয়েছে-".....প্রথম আসমানের তুলনায় এ পৃথিবী সূচাগ্র বিন্দু পরিমাণ, আর প্রথম আসমান দ্বিতীয়ের তুলনায় তাই, আর এরূপ প্রত্যেক আসমান একে অন্যের তুলনায় পরবর্তীটির চেয়ে অনুরূপ ক্ষীণকায়....."(১০৫। পঞ্চেন্দ্রিয়)।

সৃষ্টিজগতের বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হচ্ছে মহাবিশ্বের সর্বত্র সাংগঠনিক কাঠামো-ব্যবস্থা। আমরা পরমাণুর ইলেকট্রন-প্রোটন থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের যে দিকে তাকাই না কেন, সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মহাপরিকল্পক-এর সাক্ষ্য দেখতে পাই। দেখতে পাই সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবস্থা। যেমন–কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন, কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি উপজেলা, কয়েকটি উপজেলা মিলে একটি জেলা, কতকগুলো জেলা মিলে একটি বিভাগ, কয়েকটি বিভাগ নিয়ে একটি দেশ, কয়েকটি দেশ নিয়ে একটি মহাদেশ গঠিত হয়। ঠিক তেমনি, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, নিহারিকা, এভাবে সাত বা বহু-স্তর সংগঠন হতে পারে। আমরা যদি আসমান-জমিনের এরূপ সংগঠন ভিত্তিক স্তর ভাগ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটা কঠিন প্রস্তাবনার মুখোমুখী হতে হয়।

সাধারণত আমরা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের ফাঁকা দিকটাকে আসমান বলি এবং ভূ-পৃষ্ঠসহ নিচের বস্তুকে আমরা জমিন বলি। এখন যদি আমরা পৃথিবীর মত সকল মূলগ্রহকে প্রথমস্তর জমিন এবং ভূ-পৃষ্ঠের ঊর্ধ্বে তার ম্যাগনেটোস্ফেয়ার (চৌম্বকাকর্ষণ) পর্যন্ত প্রথমস্তর আসমান ধরি এবং এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি ঘূর্ণায়মান গ্রহ নিয়ে একটি সৌরজগত (২য় স্তর আসমান), কয়েকটি ঘূর্ণায়মান সৌরজগত নিয়ে একটি নিহারিকা (৩য় স্তর আসমান), কতকগুলো ঘূর্ণায়মান নিহারিকা নিয়ে একটি উপগ্যালাক্সি (৪র্থ স্তর আসমান) কতকগুলো উপগ্যালাক্সি নিয়ে একটি গ্যালাক্সি (৫ম স্তর আসমান), কয়েকটি ঘূর্ণায়মান গ্যালাক্সি নিয়ে একটি গ্যালাক্সিগুচ্ছ (৬ষ্ঠ স্তর আসমান), সবগুলো চলমান গ্যালাক্সিগুচ্ছ নিয়ে একটি সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব (৭ম স্তর আসমান ধরা যেতে পারে)। এ সংগঠনগুলোর প্রত্যেকেরই একটা প্রভাব-বলয় আছে। ফলে কেউ কারো প্রভাব-বলয়ের মধ্যে ঢুকতে পারে না এবং সংগঠনগুলোর এ প্রভাব-বলয়কেই সুরক্ষিত ছাদ বলা যেতে পারে।

আবার যদি আমরা মূলগ্রহকে প্রথম স্তর জমিন ধরে ঐ জমিন বা যৌগিক পদার্থকে বিভাজন করি তাহলে পাওয়া যাবে মৌলিক পদার্থ (২য় স্তর), মৌলিক পদার্থকে বিভাজন করলে অণু (৩য় স্তর), অণুকে বিভাজন করলে

www.pathagar.com

পরমাণু (৪র্থ স্তর), পরমাণুকে বিভাজন করলে ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন (৫ম স্তর), ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনকে বিভাজন করলে আলফা, বিটা, গামা-রে (৬ষ্ঠ স্তর), আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতি রশ্মিকে বিভাজন করলে পাওয়া যাবে শক্তি (৭ম স্তর জমিন)। "আমি এ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছি শক্তি দ্বারা, নিশ্চয় আমি একে সম্প্রসারণ করতেছি" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৭)। এভাবে শক্তিকে বিভাজনের পথ ধরেই হয়তো মানুষ একদিন প্রবেশ করবে মনোজগতে। বিজ্ঞান পেয়ে যাবে আত্মার ঠিকানা। তখন হয়তো প্রমাণ হবে আত্মা, মন ও প্রাণ দিয়েই বস্তুজগত সৃষ্টি। সৃষ্টির বিভাজন যেখানে শেষ স্রষ্টার অস্তিত্ব সেখানে শুরু। এখানে বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে অদৃশ্য শক্তিসত্তা 'স্রষ্টা'র অস্তিত্ব। আবার বিজ্ঞানও খুঁজে পায় না স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো যুক্তিযুক্ত উপায়। "যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা হতে। (সূরা আয্ যুমার ঃ ৬)।

এখানে স্তর বিভাজনে ভুলত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক, তবে ভবিষ্যতে এ সংগঠন ভিত্তিক স্তর বিভাজন-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা পেয়ে যেতেও পারে। উল্লিখিত এ স্তর বিভাজন প্রস্তাবনার বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হচ্ছে গ্রহ থেকে ঊর্ধ্বমুখী সংগঠনগুলোকে আকাশের সংগঠন বা স্তর ধরা হয়েছে এবং গ্রহ বা দৃশ্যমান বস্তু থেকে নিম্নমুখী সংগঠনগুলোকে জমিনের সংগঠন ধরা হয়েছে। তবে ধারাবাহিকতায় সবগুলো সংগঠন একই জাতীয়; শুধু বিশালতার কারণে ঊর্ধ্বমুখী সংগঠনের আকাশ বা শূন্যতা আমরা দেখতে পাই এবং অতি ক্ষুদ্রতার কারণে নিম্নমুখী সংগঠনের শূন্যতা আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি না। বরং জমাটবদ্ধ ও স্থির মনে করি, যদিও গ্রহ থেকে ঊর্ধ্বমুখী সংগঠনের তুলনায় নিম্নমুখী সংগঠনের বস্তুঘনত্ব অনেক কম, অর্থাৎ শূন্যতা অনেক বেশি। যেমন, সৌরজগতের বস্তুঘনত্বের চেয়ে একটা অক্সিজেন, হাইড্রোজেন বা একটা কার্বন পরমাণুর বস্তুঘনত্ব অনেক কম।

ধ্বংস দিবস

ইসলাম বলে প্রকৃতি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত প্রকৃতি জগতের একটি মূলনীতি। ইসলামের এ মূলনীতির সাথে Big Bang তত্ত্বের কিছুটা ঐক্য রয়েছে। অর্থাৎ বিশ্ব যদি ক্রমহ্রাসমান হারে সম্প্রসারণশীল হয় তবে একদিন এটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। Big Bang তত্ত্বের এ বিষয়টি এখনও পুরোপুরি প্রমাণিত হয়নি। যেদিন এটি প্রমাণিত হবে (যদি আদৌ হয়), সে দিন ঐশী ও প্রকৃতি দর্শনের মাঝে ঐক্যের তালিকায়

www.pathagar.com

আরও একটি মূলনীতি যোগ হবে। এখানে ইসলাম কেবল বিশ্বজগতের ধ্বংসের নীতি উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত হয় না। ধ্বংস-পূর্বকালে প্রাকৃতিক জগতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে সেসবও ইসলাম উল্লেখ করেছে। এসব ঘটনার ব্যাখ্যায় সতর্কতার সঙ্গে বিজ্ঞান ও ধর্মের ঐক্য খোঁজা হলে ভবিষ্যতে তা মিলেও যেতে পারে। এমনটি হলে বিজ্ঞান ও ধর্মের ঐক্যে আরও একটি মাত্রা যোগ হবে। প্রকৃতি জগত ধ্বংসের ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের ঐশীগ্রন্থের প্রস্তাবনাগুলো হচ্ছে–

(১) "তোমরা কি নিশ্চিত হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না ?" (সূরা আল মুলক ঃ ১৭)।

(২) "তখন পর্বতমালা সমেত জমিন উৎক্ষিপ্ত হবে এবং ধাক্কায় ধাক্কায় তারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়বে" (সূরা আল হাক্কাহ ঃ ১৪)।

(৩) "সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর ন্যায়" (সূরা আল মায়ারিজ ঃ ৮)।

(৪) "পর্বতসমূহ বহমান ধূলিরাশিতে পরিণত হবে" (সূরা মুযাম্মিল ঃ ১৪)।

(৫) "তখন চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন। যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে আজ পালাবার স্থান কোথায়?" (সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৮-১০)।

(৬) "যখন কর্ণবিদারী মহানিনাদ উপস্থিত হবে" (সূরা আল আবাসা ঃ ৩৩)।

(৭) "যখন তারকারাজি চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে" (সূরা আত ত্বাকভীর ঃ ২)।

(৮) "যখন সমুদ্র স্ফীত হবে" (সূরা আত ত্বাকভীর ঃ ৬)

(৯) "যখন আকাশের (বায়বীয়) আবরণ উন্মোচিত (অকার্যকর) করা হবে"(সূরা আত ত্বাকভীর ঃ ১১)।

(১০) "যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হবে এবং যখন কাওকাব বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষিপ্ত হবে"(সূরা আল ইনফিত্বার ঃ ২-৩)।

(১১) "শপথ আকাশের এবং সহসা আঘাতকারীর। তুমি কি জানো এ সহসা আঘাতকারী বস্তুটি কি ? এটি একটি প্রজ্জ্বলিত জ্যোতিষ্ক" (সূরা আত ত্বারিক ঃ ১-৩)।

(১২) "যখন পৃথিবী আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী যখন তার বোঝাসমূহ বের করে দিবে" (সূরা আল যিলযাল ঃ ১-২)।

(১৩) "সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত হবে পতঙ্গের ন্যায় এবং পর্বতসমূহ ধুনিত হবে রঙ্গীন পশমের ন্যায়"(সূরা আল কারিয়াহ ঃ ৪-৫)।

www.pathagar.com

উপরোক্ত কুরআনিক প্রস্তাবনাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি আমাদের এ পৃথিবীটা হঠাৎ কোনো এক সময় কোন কিছুর আঘাতে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অজ্ঞতার যুগে নাজিল হওয়া কুরআনের এ ধরনের বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রস্তাবনাগুলো সত্যিই অলৌকিকতার দাবি রাখে। সেই যুগে একজন নিরক্ষর মানুষ কীভাবে এমন কথাগুলো বলতে পারেন? যেখানে বলা হয়েছে, সূর্যগ্রহণের সময় সহসা কতকগুলো পাথর, গ্রহাণু বা জ্যোতিষ্ক পৃথিবীকে আঘাত করতে পারে। ফলশ্রুতিতে আঘাতকারী বস্তুগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে প্রজ্জ্বলিত হয়ে সমস্ত আকাশ গলিত ধাতুর ন্যায় আলোকিত হবে, মহাবিস্ফোরণের ন্যায় একাধিক কর্ণবিদারী শব্দ হবে, পর্বতমালা সমেত জমিন উৎক্ষিপ্ত হয়ে ধাক্কায় ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়বে এবং তারা বহমান সূক্ষ্ম-মিহি ধূলোরাশিতে পরিণত হয়ে সম্পূর্ণ আকাশ নিউক্লিয়ার ধূলিমেঘে ছেয়ে চন্দ্র-সূর্যকে জ্যোতিহীন করে ফেলবে, মানুষগুলো পতঙ্গের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হবে, সমস্ত পৃথিবী প্রকম্পিত হবে, ভূত্বক ফেটে গলিত লাভা (বোঝাসমূহ) বের হয়ে আসবে এবং সমুদ্র প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হবে।

এখন আমরা দেখব প্রস্তাবনাগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটুকু। আমরা জানি প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড আমাদের এ পৃথিবীতে আঘাত করার জন্য ছুটে আসে। লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ডগুলো পৃথিবীর বায়বীয় স্তরে প্রবেশ করার সাথে সাথে বাতাসের ঘর্ষণে উত্তপ্ত হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ উল্কাপিণ্ড বা গ্রহাণুদের আবাসস্থল মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে মিটিওরিট ও এসটিরয়েড বেল্ট। মিটিওর বা উল্কাপিণ্ডগুলো আকারে খুব ছোট এবং সংখ্যায় অসংখ্য। এদের বিচ্যুতির পরিমাণও খুব বেশি। এদের ব্যাস হয় কয়েক ফুট থেকে কয়েক হাজার ফুট পর্যন্ত।

এসটিরয়েড বা গ্রহাণুগুলো আকারে উল্কার চেয়ে বড় এবং সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। গ্রহাণুগুলোর ব্যাস কয়েক ফুট হতে কয়েক শত মাইল পর্যন্ত হয়। এদের কক্ষপথ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্য অঞ্চলে হলেও মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং অন্যান্য গ্রহদের আকর্ষণ-প্রভাব গ্রহাণুদেরকে মাঝে-মধ্যে তাদের কক্ষ থেকে ভিন্ন গতিপথে চলতে বাধ্য করে। কক্ষবিচ্যুত ভিন্ন গতিপথের এ গ্রহাণুগুলোর বিস্তৃতি ঘটে ভিতরের দিকে বুধের ভিতর পর্যন্ত এবং বাইরের দিকে শনির সীমা পর্যন্ত। এছাড়া ওট ক্লাউড (Oort cloud) বেল্টের কোটি কোটি ধূমকেতুও আমাদের পৃথিবীর জন্য বিরাট হুমকি। ধূমকেতুদের আবাসস্থল ওর্ট ক্লাউড নামের এ বেল্টের বিস্তৃতি সৌরজগত ছাড়িয়ে প্রায় দুই আলোকবর্ষেরও অধিক। সৌরজগতের নিয়ম অমান্যকারী এ ধূমকেতুদের মাথার ব্যাস

www.pathagar.com

কয়েক গজ থেকে কয়েক মাইল পর্যন্ত হতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ ধুমকেতুর আঘাতেই কয়েকবার পৃথিবীতে মহাধ্বংস ও তুষার যুগ নেমে এসেছিল বলে বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস।

কক্ষবিচ্যুত অবাধ্য ওই গ্রহাণুগুলো বা ধূমকেতুর গতিপথ যখন চিত্রের ন্যয় পৃথিবীর কক্ষ তলের দীর্ঘ সমান্তরালে পৃথিবীকে অতিক্রম করে তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আগন্তক জ্যোতিষ্কটি আছড়ে পড়তে পারে পৃথিবীর উপর।

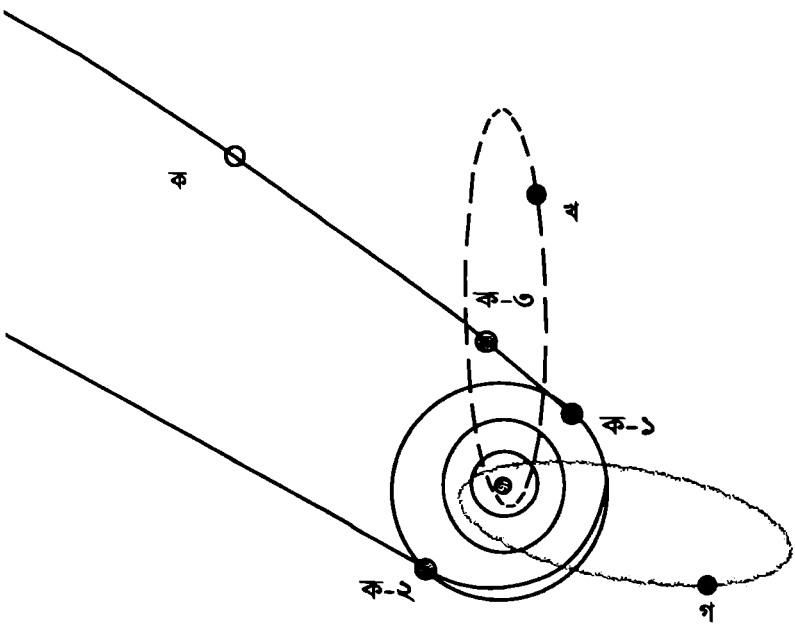

পৃথিবীতে ধুমকেতু বা উল্কা পতনের সম্ভবনা

www.pathagar.com

আবার সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই লাইনে থাকায় সূর্যের দিকে তিন বস্তুর একত্রিত অভিকর্ষ বল বৃদ্ধি পায়। ফলে সে সময় পৃথিবীর দিকে দূরের কোনো আগন্তুক বস্তুকে সজোরে স্বাগত জানানোর সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর সেই সময় পৃথিবীর কক্ষগতি ও আগন্তুক বস্তুটির কক্ষগতি যদি বিপরীতমুখী হয় তবে মুখোমুখী সংঘর্ষে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা আরও বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ। এমন সম্ভাবনার কথা সামনে রেখেই হয়তো ইসলামের নবী চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সময় সেজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন।

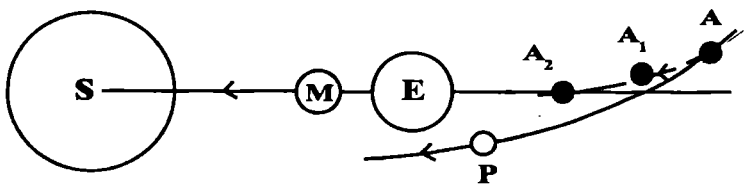

সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই লাইনে থাকায় সূর্যের দিকে তিন বস্তুর একত্রিত অভিকর্ষ বল বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর দিকে আসা দূরের কোনো আগন্তুক বস্তুকে স্বজোরে স্বাগত জানায়।

নিকট অতীতে সাইবেরিয়ার বনাঞ্চল টেঙ্গোস্কায় মাত্র ১৫০ ফুট দৈর্ঘ একটি উল্কাপতনের চিত্র থেকে আমরা ১০/১২ মাইল ব্যাসের একটা গ্রহাণুপতনের ধ্বংসক্ষমতা কিছুটা অনুমান করিতে পারি। ১৯০৮ সাল ৩০ জুন সকাল বেলা সাইবেরিয়ার আকাশে সহসা একত্রে শত সহস্র বজ্রধ্বনীর শব্দ-কম্পন নিয়ে বিশাল অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় একটি অগ্নিগোলক চোখের পলকে ছুটে এসে আঘাত হানে পৃথিবীর বুকে। প্রায় হাজার কিলোমিটার দূরের মানুষও অনুভব করতে পেরেছিল এর আলোর ঝলকানি ও শব্দ-কম্পন। সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার গতিতে ছুটে আসা মিটিওরটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় স্তরে প্রবেশের সাথে সাথে বাতাসে বাধা পেয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং এর গতি নেমে আসে ১১ কিলোমিটার/সেকেন্ডে। ফলে বহুগুণ হ্রাস পায় ধ্বংসের পরিমাণ। তারপরও সেখানে সৃষ্টি হয় ৪০ কিলোমিটার ব্যাসের ধ্বংস গোলক।

মাত্র ৪০,০০০ টন ওজনের ১৫০ ফুট দৈর্ঘ একটি পাথরের আঘাতে ৪০ কিলোমিটার বৃত্তের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি কোন বৃক্ষ। যদি এটি কোন সমুদ্রে আঘাত হানতো তবে সমুদ্রের জল স্ফীত হয়ে এক কিলোমিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করতো। যদি এটি ১৫০ ফুট উল্কা না হয়ে

www.pathagar.com

এর চেয়ে কয়েকগুণ বড় একাধিক উল্কা বা মাত্র ১০/২০ মাইলের কোনো গ্রহাণু বা ধূমকেতু হতো তবে অকার্যকর হয়ে পড়তো বায়ুমণ্ডলীয় বাধা, আর সেটি পূর্ণ অবয়বে তীব্র গতিতে আঘাত হানতো পৃথিবীকে। প্রচণ্ড শব্দ, কম্পন, আলোক, উত্তাপ, ভূত্বক ফেটে আগ্নেয় লাভা উদগীরণ, জলোচ্ছ্বাস এবং উৎক্ষিপ্ত পর্বতসমূহ ধাক্কায় ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মিহি-সূক্ষ্ম নিউক্লিয়ার ধূলিমেঘে চন্দ্র-সূর্যকে আচ্ছাদিত করে দিয়ে নামিয়ে আনত মহাধ্বংস। শেষ মুহূর্তে আর একবার প্রমাণ হতো ঐশী-কুরআন সত্য! আর সেই সাথে পতঙ্গের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত মানুষগুলো জানতে পারতো 'সামনে বা পিছন দিয়ে কোনো মিথ্যা প্রবেশ করতে পারেনি কুরআনের মধ্যে'।

সেই দিন পৃথিবীটা মহাধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেলেও কুরআনে উল্লিখিত মহাধ্বংসের হাত থেকে নিশ্চিত রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা বিজ্ঞান অনুমোদন করে না। কারণ সুযোগের অপেক্ষায় থাকা লক্ষ লক্ষ গ্রহাণু বা ধূমকেতু ছাড়াও দূরের কোনো কুয়াশার বা কোনো দানব নক্ষত্রের সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলেও পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে অনুরূপ ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। বিজ্ঞান একাকার হয়ে যেতে পারে কুরআনের সাথে, পূর্ণ হতে পারে শেষ দিনের ব্যাপারে দেয়া শর্তাবলী।

যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর ইবাদত করে

লক্ষ্য করা যায় আল কুরআনের বেশকিছু আয়াতের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে–"আসমান-জমিনে যা কিছু রয়েছে সবকিছু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহরই ইবাদাত করে" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)। সাধারণ জ্ঞানে আমরা বুঝতে পারি ইবাদাত করা বা দাসত্ব করা জ্ঞান-বিবেক সম্পন্ন জীবেরই কাজ। আয়াতে আসমান-জমিনের সবকিছু বলতে বোধ-নির্বোধ জীবকূল এবং গ্রহ-নক্ষত্রসহ সৃষ্টিজগতের যাবতীয় পদার্থকে বুঝায়। মানুষ ছাড়া নির্বোধ জীব ও যাবতীয় জড় পদার্থ কিভাবে স্রষ্টার ইবাদাত করে তা শুধু অন্ধভাবে বিশ্বাস করা ছাড়া বুঝার কোনো উপায় নেই।

তবে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ক্রমে ক্রমে অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল ছিঁড়ে আমাদেরকে জানিয়ে দেয় জড় পদার্থ প্রতিনিয়ত স্রষ্টার বেধে দেয়া বিধান পালন করে চলে। পরমাণুর ইলেকট্রন-প্রোটন থেকে শুরু করে গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, নিহারিকা, উপগ্যালাক্সি, গ্যালাক্সিসহ মহাবিশ্বের সবকিছুই

www.pathagar.com

স্রষ্টার বেধে দেয়া নিজ নিজ কক্ষপথে ঘোরে। মূলত এভাবেই তারা আল্লাহর ইবাদত করে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কেউই এ বিধানের ব্যাতিক্রম ঘটাতে পারে না বা বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে না। এখানে প্রমাণ হয়– "আসমান-জমিনে যা কিছু রয়েছে সবকিছু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহরই ইবাদত করে" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)। "আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত নেই" (সূরা আন নামল ঃ ৭৫)। "এটা সন্দেহমুক্ত নির্ভুল ঐশীগ্রন্থ" (সূরা আল বাকারা ঃ ২)।"এতে মিথ্যার কোন অনুপ্রবেশ ঘটবে না সম্মুখ দিয়ে বা পিছন দিয়ে, এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ" (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৪২)।

মহাকাশ বিজয়

মহাকাশ বিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। মাত্র কয়েক বছরপূর্বে (১৯৬১) বিজ্ঞানীরা মহাকাশ বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন। এই বিজয়ের প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে মানুষ যখন মহাকাশ বিজয়ের কল্পনাও করতে শিখেনি, ঠিক সেই সময় আরবের একজন নিরক্ষর মানুষের মুখ দিয়ে আল্লাহ প্রকাশ করে দিলেন–"হে জ্বিন ও মানব; তোমরা আসমান জমিনের সীমাতিক্রম যদি করতে পার তবে তা করো, কিন্তু সে অতিক্রম তোমরা করতে পারবে না শক্তি ব্যতিরেকে" (সূরা আর রহমান ঃ ৩৩)।

এ আয়াতে আল্লাহ উচ্চ শক্তি অর্জনের মধ্যে দিয়ে মানুষের মহাকাশ বিজয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন চরম সত্যতার সাথে। প্রতি সেকেন্ডে ১১ কিলোমিটার গতিতে পৃথিবীর মুক্তগতি অতিক্রম করার শক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ চরম শক্তি অর্জন করে মহাকাশ বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছে। এভাবেই বিজ্ঞান ও ধর্মের ঐক্য আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। এখানেও বিজ্ঞান পারেনি কুরআনকে অতিক্রম করতে। 'তবু কি তাদের ভুল ভাঙ্গবে না, যারা বলে বাইবেল দেখে কুরআন রচনা করা হয়েছে'! কুরআন ছাড়া বাইবেলসহ দুনিয়ার সকল ঐশীগ্রন্থ মন্থন করে এমন একটি আয়াত উপস্থাপন করা কি সম্ভব ? "আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত নেই" (সূরা আন নামল ঃ ৭৫)।

www.pathagar.com

সূর্যের গ্রহ ১১টি

"স্মরণ করো, ইউসুফ বলেছিল নিজের পিতাকে, হে পিতা! আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি গ্রহ এবং চন্দ্র ও সূর্য, ওরা আমার সামনে সিজদাবনত" (সূরা ইউসুফ ঃ ৪)। হযরত মূসা আ.-এর সম্প্রদায়ের নবী হযরত ইসহাক আ.-এর পুত্র হযরত ইউসুফ আ. স্বপ্নে দেখলেন চন্দ্র-সূর্য ও ১১টি গ্রহ তাঁকে সিজদা করছে। সে সময় স্বপ্নের ইশারায় তিনি জানতে পারলেন বাবা-মা ও ১১ ভাই তাঁর দ্বারস্থ হবেন, এবং ঘটনাক্রমে হয়েছিলেনও তাই। তবে এ আয়াতে আমাদের সৌরজগতের ১১টি গ্রহের ইঙ্গিতও থাকতে পারে। যেহেতু চন্দ্র-সূর্যের সাথে ১১টি গ্রহের উদাহরণে হযরত ইউসুফ আ.-এর ১১ ভাইয়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং সেখানে আরও বলা হয়েছে-"ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে অন্বেষীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে" (সূরা ইউসুফ ঃ ৭)। সেহেতু সৌরজগতের ১১টি গ্রহ থাকাই যুক্তিযুক্ত।

আমাদের বিজ্ঞানজগত বহুকাল ধরে সৌরজগতে চন্দ্র-সূর্য এবং ৯টি গ্রহ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। হালে এসে বিজ্ঞান সৌরজগতের আরও ২টি নতুন গ্রহসহ মোট ১১টি গ্রহ আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা হয়তো আরও একবার প্রমাণ করলেন কুরআনের বাণী সত্য। বিজ্ঞান এখানে একাত্মতা ঘোষণা করে মিলে যেতে পারে কুরআনের বাণীর সাথে। তখন হয়তো প্রমাণমাত্রায় যোগ হবে আরও একটি তথ্য। তথ্যের নির্ভুলতা "এটা সন্দেহমুক্ত নির্ভুল ঐশী-কিতাব" (সূরা আল বাকারা ঃ ২)। "তোমার প্রভুর বাণীসমূহ বাস্তবতায় ও মধ্যপন্থায় পরিপূর্ণ, তাঁর বাণীর কোনো পরিবর্তনকারী নেই" (সূরা আল আনআম ঃ ১৫)।

মহাকাশে মানুষের জীবিকা

কুরআনে বলা হয়েছে "আকাশে তোমাদের জীবিকা রয়েছে এবং প্রতীক্ষিত সবকিছু" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ২২)। কুরআনের এমন একটি উক্তি সেই ঘোর অন্ধকার যুগের মানুষের কাছে যুক্তিহীন ও বিব্রতকর মনে হলেও আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে এসে মানুষ ঠিকই অনুধাবন করতে পারছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে মানুষ আজ জানতে পেরেছে 'পৃথিবীর জীবকুল তথা মানুষের জীবন-জীবিকা সবই আসে আসমান থেকে সৌরকিরণ ও মহাজাগতিক রশ্মির মাধ্যমে'। প্রাণ সৃষ্টির জন্য ওই সমস্ত রশ্মিই পৃথিবীতে জৈবরাসায়নিক নির্দেশনা গঠনে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

আসমান থেকে সূর্যকিরণ ও মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর বুকে না পড়লে পৃথিবীতে কোনো প্রাণের সৃষ্টি হতো না এবং কোনো উদ্ভিদেরও জন্ম হতো না। ফলে পৃথিবীর পরিচিতির জন্য এখানে থাকতো না কোনো জীবনের সন্ধান।

জীবন উদ্দেশ্যহীন নয়

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যাঁর সত্যের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এখানে মিথ্যার কোনো আশ্রয় নিতে হয়নি। যেমনটি নিতে হয়েছিল জনপলকে–"কিন্তু আমার মিথ্যার দ্বারা ঈশ্বরের সত্যের গৌরব যদি বৃদ্ধি পায় তবে আমিও বা পাপী বলে বিবেচিত হবো কেন?" (রোমীয়ঃ৩ঃ৭)। বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলোই আজ প্রমাণ করে 'সকল সত্য যেন কুরআনেই আটকে পড়ে আছে'। বিজ্ঞানের সত্য কখনও ঐশী সত্যকে অতিক্রম করতে পারে না।

কুরআনের বৈজ্ঞানিক সফলতা দেখে জগত চমকিত হলেও ওদের বোধোদয়ে কোনো সাহায্য হবে না 'যারা বলে আল্লাহ নেই'। তবে জ্ঞানী চিন্তাশীল বিশ্ববাসী আজ এটা বিশ্বাস করতে ব্যধ্য 'জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্ব যতই সমৃদ্ধ হবে, বিশ্বজনীন ধর্ম 'ইসলাম' চিন্তাশীল জ্ঞানী মানুষকে ততই কাছে টানবে। বিভিন্ন ধর্মের মোকাবিলায় সত্যের মাপকাঠিতে ইসলাম বিশ্বমানবের কাছে ততই গ্রহণযোগ্য হবে'। বিজ্ঞানীদের উক্তিগুলোর মধ্যে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হচ্ছে- সকল বিজ্ঞানীই 'এক' মহাশক্তি 'এক' ঈশ্বরের কথা বলেছেন। দ্বিত্ববাদ, তৃত্ববাদ বা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী হয়েও নিজেদের মনের অজান্তে বিজ্ঞানীরা বার বার 'এক' স্রষ্টার কথা বলে মূলত ইসলামের একত্ববাদেরই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কুরআনের কাছে নতজানু বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলোই আজ দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেয় "আল্লাহর কোন্ কোন্ বাণীকে তোমরা অস্বীকার করবে"? (সূরা আর রহমান ঃ ১৩)। "আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত নেই" (সূরা আন নামল ঃ ৭৫)। "এতে মিথ্যার কোন অনুপ্রবেশ ঘটবে না সম্মুখ দিয়ে বা পিছন দিয়ে, এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ" (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৪২)। কোনোভাবেই স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানহীন দশায় পতিত হতে পারেন না। তাই কুরআনই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক এ তথ্যগুলোর ইঙ্গিত প্রদান করে। আমরা শুধুই দেখতে পাই তথ্যের নির্ভুলতায়, জ্ঞানের প্রসারতায় এবং যুক্তির দৃঢ়তায় "এটা সন্দেহমুক্ত নির্ভুল কিতাব" (সূরা আল বাকারা ঃ ২)।

www.pathagar.com

'আল-কুরআন সঠিক ঐশীগ্রন্থ' ইসলামের এ দাবির সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং যুক্তি-প্রমাণও একই দাবি জানায়। কাজেই বিজ্ঞানের দীর্ঘ পর্যালোচনার পর 'আল-কুরআন সঠিক ঐশী গ্রন্থ' ইসলামের এ দাবিকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বিজ্ঞানের কোন তথ্য-তত্ত্ব বা ধারণা দিয়ে কুরআনকে মাপা চলে না। কুরআনকে মাপতে হলে বিজ্ঞানের 'প্রমাণিত সত্যের' প্রয়োজন। কুরআন সর্বযুগের সর্বাধুনিক বিশুদ্ধ তথ্য-উপাত্ত নিয়েই প্রকাশিত রয়েছে। একে বিশুদ্ধ করার দুঃসাহস কারো নেই বা কেউ যেন না দেখায়। তবে মানবিক সীমাবদ্ধ চাপানো তথ্যের দায় কুরআন কখনই গ্রহণ করে না।

আল কুরআনের বক্তব্য আল্লাহ চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলেননি বরং বিচক্ষণের মতো বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে ইসলামের প্রতিটি বিষয় বিবেক-বুদ্ধি সম্মত বা 'যৌক্তিক'। আর যেকোন বিষয় বিবেক-বুদ্ধিগ্রাহ্য হলে সেটার উপর অটল থাকা বেশ খানিকটা সহজ হয়। পশ্চিমা বিশ্বের অমুসলিমরা চোখ-কান বন্ধ করে কুরআন হাদিসের বিরোধিতা করে। কিন্তু ইসলাম বিশ্ববিবেকের কাছে উন্মুক্ত আহ্বান জানায় কুরআন-হাদিস পড়ে জেনে-শুনে যুক্তিযুক্তভাবে এর বিরোধিতা করতে। আহ্বান জানায় উপযুক্ততার সাথে কুরআন হাদিসের ভুল ধরতে।

কুরআনে বহু আয়াত আছে, যা বিজ্ঞানের তথ্যের সাথে হুবহু মিলে যায়, কিন্তু সমস্ত কুরআন খুঁজে এমন একটি আয়াত পাওয়া যায় না, যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মিলে না বা বিজ্ঞান বিরোধী। আবার বিজ্ঞানে এমন কোন মৌলিক তথ্যও আমরা পাই না যা কুরআনের তথ্যকে অতিক্রম করেছে। আর এটা প্রমাণ করার জন্য কুরআনে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, "তারা কি সতর্কতার সাথে কুরআনকে অনুধাবন করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ হতে হতো, তবে তারা তাতে বহু অসামঞ্জস্য ও অসংগতি প্রত্যক্ষ করতো" (সূরা আন নিসা ঃ ৮২)। "অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য" (সূরা আল হিজর ঃ ৭৫)। ইসলাম মূলত বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ইসলাম শুধু দোয়া-মুনাজাত আর ঝাড়-ফুঁকের ধর্ম নয়। ইসলাম বিশ্বকে উপহার দিয়েছে এক নির্ভুল বিজ্ঞান সম্মত কার্যপ্রণালী। ফলে বিজ্ঞান ও ধর্মের ঐক্যে ফাটল ধরার কোনো উপায় নেই।

কুরআনে বিশ্বপ্রকৃতি তথা বিজ্ঞানের উপর যেসব আয়াত এসেছে সেগুলো আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন। এ আয়াতগুলোই প্রমাণ দেয় কুরআন সঠিক ঐশীগ্রন্থ। এ আয়াতগুলোর মধ্যে বহু জায়গায় 'তোমরা চিন্তা করো' 'তোমরা

www.pathagar.com

লক্ষ্য কর' 'তোমরা যদি জ্ঞানী হও' এ ধরনের কথার উল্লেখ আছে, যা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করার নির্দেশ করে, সুতরাং এগুলো বিজ্ঞান ভিত্তিক আয়াত। যেমন-"তারা কি আসমান ও জমিনসমূহের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখে না; এবং তাদের প্রতি, যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, এবং তাদের নির্ধারিত কাল অত্যাসন্ন। (সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৫)। "হে রসূল বল, আসমান ও জমিনসমূহে যা কিছু আছে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো" (সূরা ইউনুস ঃ ১০১)।

১৪০০ বৎসর পূর্বের যে গ্রন্থের বিজ্ঞান ভিত্তিক সবগুলো আয়াতই বর্তমান বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত সত্যের সাথে হুবহু মিলে যায়, সেই গ্রন্থের আলৌকিক বিশ্বাসপূর্ণ আয়াতগুলো বিশ্বাস না করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না, যদিও আমরা সেগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রমাণ করতে পারি না। যেমন-আল্লাহ, জাহান্নাম, জান্নাত, পরকাল, ফেরেশ্‌তা, জ্বিন ইত্যাদি।

ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি আজকের সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের অক্লান্ত গবেষণায় যা আবিষ্কার হয়েছে, সেই জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকার যুগে মরু সাহারার বুকে বসে একজন নিরক্ষর মানুষ কোনো চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই ১০০% অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করে দিলেন। যাঁর মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসা বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো ১০০% সত্য হয়, তাঁরই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা ঐতিহাসিক, ঈমান-একিন ও আদেশ-নিষেধের বাণীগুলো কী করে মিথ্যা হতে পারে? বরং তা ১০০% সঠিক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। চিন্তা করুন অবশ্যই এটা বুঝবেন যদি সত্যসন্ধানী হন।

সাত শতকের অজ্ঞ যুগে মুহাম্মদ সা. এত বড় তত্ত্বের কুরআন প্রকাশ করে কিভাবে বলে দিলেন "এতে কোনো সন্দেহ নেই, বা এটা নির্ভুল কিতাব"! এখানে ওই সকল লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা বলে থাকেন 'কুরআন মানব রচিত' 'কুরআনে ভুল আছে' বা 'কিছু কিছু ভুল থাকতে পারে'। যুক্তি-প্রমাণে বিশ্বাস করলে অবশ্যই আপনি ইসলামের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য।

আল্লাহর আইনাবলীর উপর নির্দেশমূলক যেসব আয়াত এসেছে সেগুলো শুধু পালন করার জন্য। যেমন- কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, চুরি, ধর্ষণ, ব্যভিচার, সূদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম-হালাল বিষয়ে। আবার গায়েব বা অদৃশ্যের ওপর যেসব আয়াত এসেছে, যেমন- আল্লাহ, ফেরেশ্‌তা, বেহেশ্‌ত, দোযখ, মিজান, পুলসিরাত ইত্যাদি সেগুলো সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বর্হিভূত, শুধুমাত্র ঈমান-আকিদা বিষয়ক। ওইগুলো বিশ্বাস করার নামই ঈমান।

ইসলাম প্রকৃতিতে ঐক্যের কথা বলে। ইসলামের দাবি অনুযায়ী এ ঐক্য স্রষ্টার একক ও পরম সত্তা তথা স্রষ্টার তাওহীদেরই বহিঃপ্রকাশ। ইসলামের

www.pathagar.com

মূলনীতিই হলো 'তাওহীদ'। রিসালাত, কিয়ামত ও অন্যসব নীতি হলো তাওহীদের ফল। পদার্থ বিজ্ঞান আজ সেই তাওহীদের নীতির কাছাকাছি অবস্থানে এসেছে। ফলে এখানে জ্ঞানীদের জন্য 'জীবন উদ্দেশ্যহীন' একথা বলার আর কারো কোনো সুযোগই থাকলো না। কাজেই ভুলে গেলে চলবে না, জানতে হবে নিজেকে, বুঝতে হবে জীবনের উদ্দেশ্য।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শুধু বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, প্রকৃতির উর্ধ্বে ও তাঁর সার্বভৌমত্ব বিরাজমান, সেই নিদর্শন তিনি নবী-রসূলদের মারফত দেখিয়েছেন। যেমন–ইব্রাহীম আ.-এর জন্য আগুন শীতল ও আরামদায়ক হওয়া, জবাইকৃত টুকরা টুকরা করা মৃত পাখীদের জীবিত করা; মূসা আ.-এর লাঠি সাপ হয়ে যাদু গিলে ফেলা, লাঠির আঘাতে দরিয়ার পানি বিভক্ত করা; ঈসা আ.-কে বিনা পিতায় জন্মদান এবং তাঁর দ্বারা মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টি দান; শেষ যুগের রসূল মুহাম্মদ সা.-এর দ্বারা অঙ্গুলির ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা, ঊর্ধ্বাকাশে গমন (মেরাজ) ইত্যাদি।

প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যা কিছু নিদর্শন আছে তার সবই বিজ্ঞান বহির্ভূত বিষয়, বিজ্ঞানও এ ব্যাপারে নীরব আছে। নীরব না থেকে যদি কেউ বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে বিজ্ঞান-বহির্ভূত বিষয়ে আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করে তবে তা হবে নিছক অন্ধ বিশ্বাস, বেঈমানী বা অস্বীকৃতির ওপর বিশ্বাস। নাস্তিকতার উপর বিশ্বাস অযৌক্তিক ও বিজ্ঞান বহির্ভূত বিষয়। কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা আমার নির্দেশসমূহকে মিথ্যা বলে তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির" (সূরা আল আনআম ঃ ৩৯)। সমস্ত জীবের মধ্যে আল্লাহর নিকট তারাই নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে" (সূরা আল আনফাল ঃ ৫৫)। প্রকৃতির ঊর্ধ্বে নবীগণের মুযিজা ও আউলিয়াগণের কারামতে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কারণ আল্লাহর সর্বশেষ রসূল সা.-এর মেরাজে সশরীরে বায়তুল মোকাদ্দাস হয়ে বেহেশত-দোযখ দেখে এসে বর্ণনা দেয়া, বাস্তবে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে কোনো দিন যাননি কিন্তু অবিশ্বাসী কাফিরদের প্রশ্নের জবাবে মসজিদুল আকসার সব বিবরণ বলে দিয়েছিলেন। মুজিজা বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু না হলেও ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রমাণিত।

সত্য ধর্ম

সত্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে সত্য ধর্ম-বিশ্বাসটা কী? পবিত্র তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন পর্যালোচনা

www.pathagar.com

করলে দেখা যায় সত্য ধর্ম-বিশ্বাস হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম আ.-এর নির্দেশিত পথ তথা সকল নবীদের প্রতি বিশ্বাস। যারা হযরত ইব্রাহীম আ.-এর নির্দেশিত পথকে সত্য ধর্ম বলছেন তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ তা মানছেন না। কাজেই হযরত ইব্রাহীম আ.-এর নির্দেশিত পথের সাথে ইহুদীবাদ, খৃস্টবাদ ও ইসলামের কতদূর মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা আলোচনার বিষয়। হযরত ইব্রাহীম আ. সারাজীবন ধরে বলে গেছেন 'আল্লাহ এক তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি কারো পিতা নন, কাউকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেননি'। "ইব্রাহীম ছিল এক জাতির জনক, আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুগত এবং ছিল না মোশরেকদের অন্তর্গত" (সূরা আন নাহল ঃ ১২০)। অথচ ইহুদীরা বলছেন 'ওজায়ের আল্লাহর পুত্র' আবার খৃস্টানরা বলছেন 'ঈসা-মসীহ আল্লাহর পুত্র' (৯ঃ৩০)। অন্যদিকে কুরআন বলছে "ইব্রাহীম ইহুদী ছিল না, খৃস্টানও ছিল না, সে ছিল আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান) এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৭)। "হে কিতাবিগণ! ইব্রাহীম সম্পর্কে কেন তর্ক করো, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। তোমরা কি বুঝ না?"(সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৫)। কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়, হযরত মূসা আ. ও হযরত ঈসা আ.-এর ওপর নাজিলকৃত কিতাবসমূহে কোথাও আল্লাহর সাথে কারো অংশী স্থির করার কথা বলা হয়নি বরং আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

কুরআনে আরো বলা হয়েছে "যে কেউ ইব্রাহীমের পথ হতে মুখ ফিরাবে সে মহান্ধ ও আত্মবিস্মৃত; আর আমিই তাকে পৃথিবীতে (নবী রূপে) মনোনিত করেছি এবং অবশ্যই সে আখিরাতে পুণ্যবানদের অন্যতম। স্বীয় রব যখন তাকে বলল, আত্মসমর্পণ করো, সে বলল, আত্মসমর্পণ করলাম বিশ্বরবের। এ বিষয়ে ইব্রাহীম ও ইয়াকুব স্বীয় পুত্রদের অছিয়ত করেছেন; হে পুত্রগণ! তোমাদের এ দ্বীনকে আল্লাহ মনোনিত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না"(সূরা আল বাকারা ঃ ১৩০- ১৩২)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ সকল মানুষকে ইব্রাহীম আ.-এর অনুসারী হওয়ার জন্য বলেছেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী বা মুসলমান। এখানে ইব্রাহীম আ. ও ইয়াকুব আ. আপন সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী হওয়ার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন। জনৈক ইহুদী পণ্ডিত 'কেন তিনি মুসলমান হলেন?' এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন "কুরআনের অনুসারী মুহাম্মদ সা.-এর জীবনী, ইব্রাহীম আ.-এর প্রবর্তিত চলমান জীবনব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়"।

www.pathagar.com

অমুসলিম পণ্ডিত ডেভিড আর্ক হার্ড তার 'দি স্পিরিট অব দি হার্ট' নামক গ্রন্থে লিখেছেন-"ধর্ম হিসেবে ইসলাম কোন নতুন মতাদর্শ শিক্ষা দেয় না, কোন নতুন প্রত্যাদেশ বা নতুন কোন শিক্ষা-দীক্ষার কথাও বলে না। তাছাড়া কোন পুরোহিততন্ত্রও ইসলামে নেই। ইসলাম মানুষের জন্য পেশ করে ধর্ম সমর্থিত একটি সংবিধান, রাষ্ট্রের জন্য একটি শাসনতন্ত্র।"

মূলত ইহুদী-খৃস্টানদের দ্বারা বিকৃত হয়ে যাওয়া ইব্রাহীম আ.-এর ধর্ম 'ইসলামকে' মুহাম্মদ সা. পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে যান। সে কারণে মুসলমানরা প্রতি ওয়াক্ত নামাজে রাসূল সা.-এর প্রতি যে দরুদ পাঠ করেন সেখানে তারা 'রাসূল সা. ও তাঁর বংশধরদের জন্য আল্লাহর কাছে ঐরূপ রহমত ও কল্যাণ কামনা করেন, যেরূপ কল্যাণ ও রহমত আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম আ. ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বর্ষিত করেছিলেন।' অধিকাংশ খৃস্টানই যিশুর বাণী পালন করে না। তারা পলের নীতি অনুসরণ করে। বাস্তবে মুসলমানরাই যিশুর নীতির অতি নিকটবর্তী। তাই দেখা যায় কিতাবধারী ইহুদী-খৃস্টানদের মধ্যে যাদের স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে তারা কখনই ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করেন না, বরং অনেক ইহুদী-খৃস্টান পণ্ডিতরা ইসলাম গ্রহণ করে চলেছেন।

ইতিহাসের বিখ্যাত সমরনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপাট বলেছেন, "যিশুখৃস্টের ছয়শত বছর পর আরবরা যখন পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত ছিল, তখন মুহাম্মদ সা., ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, মূসা ও যিশুখ্রিস্টের আল্লাহর ধর্মীয় বিধান নিয়ে আসেন। ----- মুহাম্মদ সা. ঘোষণা করলেন, "এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।"

ইসলাম দাবি করে বিশ্বমানবের জন্য প্রেরিত বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. ইব্রাহীম আ.-এর যোগ্য অনুগামী রূপে তাঁরই প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের দাওয়াত সফলতার সাথে বিশ্বমানবের কাছে পৌছে দিয়েছেন। ইসলাম একটি স্বভাব ধর্ম। ইসলামের আদর্শ মূলত মানুষের ধ্যান-ধারনা ও চিন্তাধারার উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। আর সেই সাথে এ ধর্ম সমাজে সর্বোচ্চমানের মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও নিশ্চিত করে। তাই ইসলাম যুগে যুগে সত্য, শান্তি আর মুক্তির একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে বিশ্বমানবের কাছে অনুসরণীয়।

ইসলামে গোঁজামিলের কোনো অবকাশ নেই। ইসলামের প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডে রয়েছে পূর্ণাঙ্গতা, সার্বজনীনতা, কার্যকারিতা, সার্থকতা, ঐতিহাসিকতা, যুগোপযোগিতা, বৈজ্ঞানিকতা ও বাস্তবতা। এ সম্পর্কে মি.

www.pathagar.com

নেপোলিয়ন বলেছেন Islam is a complate code of life." অর্থাৎ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ডা. মরিস বুকাইলিও বলেন, "ইসলামের কুরআন এমন এক অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ যার মধ্যে সার্বজনীনতা, বৈজ্ঞানিকতা ও বাস্তবতা বিদ্যমান।

কোন নাস্তিকের সামনে ওহীর প্রমাণ উপস্থাপন করা অর্থহীন। কিন্তু একজন আস্তিক যে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার পক্ষেই শুধু ওহীর যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবন করা সম্ভব। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, এ মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে সে সবই একজন মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। তিনিই পরম নিপুণতার সাথে এ বিশ্বপ্রকৃতি পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন। কোনো এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে এ দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে হয় যে, দয়াময় স্রষ্টা অন্ধকার দুনিয়াতে মানুষের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিধিবিধান না দিয়ে প্রেরণ করেননি। স্রষ্টা-প্রদত্ত এ বিধিবিধানই ওহীয়ে-এলাহী নামে পরিচিত, যা ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত একটা বিষয়ই শুধু নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবেই এটা একটা বাস্তব প্রয়োজনও বটে। আর এটা অস্বীকার করা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

আল্লাহ সৃষ্টির সেরা রূপে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে যেন সর্বকালীন কল্যাণ ও শান্তির অধিকারী হতে পারে সে কারণে হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে তাদের মধ্যে যুগোপযোগী বিধান দিয়ে পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন- "নিশ্চয় হেদায়াত করা আমার দায়িত্ব এবং ইহকাল ও পরকালের মালিক আমিই" (সূরা আল লাইল ঃ ১২-১৩)।

ইসলাম বলে আল্লাহ এক আল্লাহর বিধানও মূলত এক, শুধু ভাষার ব্যবধানে নামের ব্যবধান। আল্লাহর বিধান যখন ইব্রানী ভাষায় নাযিল হয়েছে তখন তার নাম হয়েছে 'তাওরাত'। আল্লাহর বিধান যখন ইউরানী ভাষায় নাযিল হয়েছে তখন তার নাম হয়েছে 'যবুর'। যখন আল্লাহর বিধান সুরিয়ানী ভাষায় নাযিল হয়েছে তখন তার নাম হয়েছে 'ইঞ্জিল'। এবং যখন তা আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে তখন তার নাম হয়েছে 'কুরআন'। স্রষ্টার নিকট সমস্ত মানবজাতি এক এবং তাদের মূল ধর্মবিশ্বাসও একই। তাই সমস্ত নবীগণই ধর্মের মূল কথা 'কালিমা তৈয়িবা' শিখিয়ে গেছেন। কালিমা তৈয়িবার অর্থ-পবিত্র কথা। এ কালিমার দুটি অংশ, প্রথম অংশে রয়েছে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে রিসালাত বা নবীদের স্বীকৃতি। যেমন—

www.pathagar.com

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইব্রাহীম খালিলুল্লাহ।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইসমাঈল যাবিহউল্লাহ।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মূসা কালিমুল্লাহ।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈসা রূহুল্লাহ।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

এ কালিমার প্রথম অংশ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'-এর দ্বারা দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, অংশীবাদ, বহু-উপাস্যবাদ, পৌত্তলিকতা, জড়বাদ, নিরিশ্বরবাদ ইত্যাদি যাবতীয় মতবাদকে অস্বীকার করা হয়েছে। তবে এখানে ঐশীগ্রন্থ কোনোভাবেই চাপানো তথ্য-বিকৃতির দায় গ্রহণ করে না।

বস্তুত সকল মানুষের জন্য ইসলাম বা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা, যা আদম আ. থেকে শুরু করে বিভিন্ন নবীদের দ্বারা তা প্রবর্তিত হয়ে শেষ রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর দ্বারা পূর্ণতা পেয়েছে। বুদ্ধি গ্রাহ্যভাবেও স্রষ্টার প্রতি 'আত্মসমর্পণ'ই হতে পারে বিশ্বমানবের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য সরল, সঠিক জীবন ব্যবস্থা। তাই সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আল্লাহ বলেছেন,

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)। আল্লাহ আরও বলেন "যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় তবে তা কখনও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, এবং পরকালে সে হবে সর্বশান্ত" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫)। আলোচ্য আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ পূর্ববর্তী যাবতীয় বিধানগুলো বিকৃত হওয়াই বাতিল করে দিয়েছেন, এবং এখানে ওই সমস্ত লোকদের জন্য শিক্ষাও রয়েছে, যারা বলে থাকেন 'সব ধর্মই কম-বেশি ভাল এবং ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম এরূপ ধারণা গোঁড়ামী'।

ধর্ম বিকৃতি

ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ দুনিয়ায় মানব জাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে যুগোপযোগী বিধান দিয়ে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির মধ্যে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের কাজ, আল্লাহর বিধানগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং আল্লাহর বিধানের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। যেন মানুষ আল্লাহর বিধান পূর্ণভাবে বুঝে পালন করতে পারে এবং ধর্মকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বর্তমানে নবুওয়াতের ধারা বন্ধ হওয়ায় আল্লাহর বিধানের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার সেই দায়িত্ব অবশ্য এখন আলেমদের।

www.pathagar.com

আগত সকল নবী-রসূলগণ আল্লাহ্ প্রেরিত যুগোপযোগী বিধান দ্বারা মানুষের মধ্যে হেদায়েত প্রচার করে থাকেন। একজন নবীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রচারিত বিধান লোক পরম্পরায় মুখস্থের আকারে মুখে মুখে প্রচার হতে হতে পরবর্তীতে যখন সেগুলো তাদের আপন স্বার্থের প্রয়োজন মেটাতে বিকৃত হয়ে

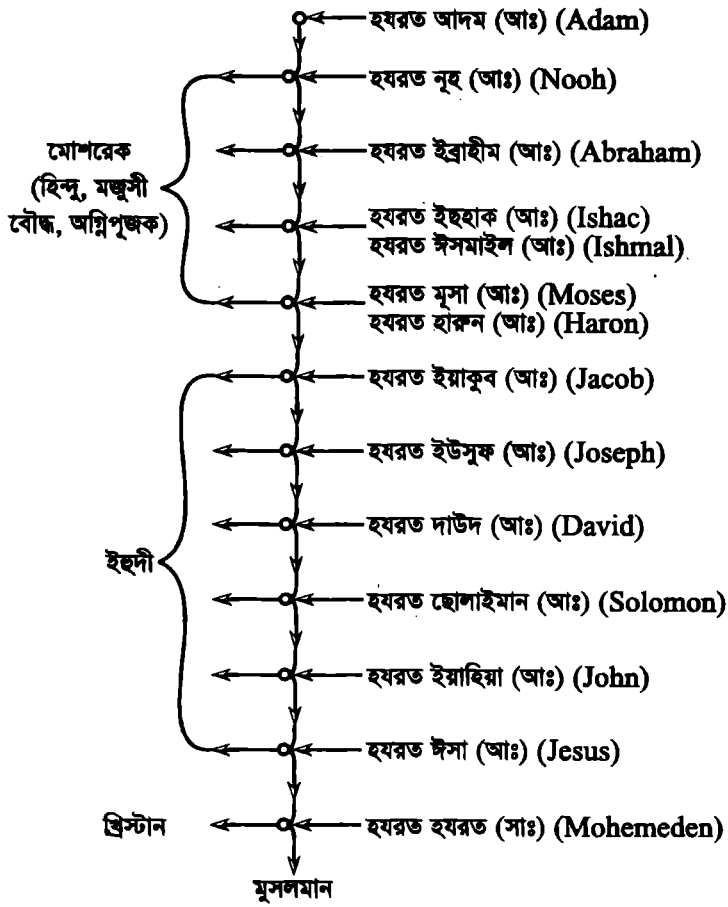

নবীগণের আগমন ও ধর্ম বিতৃতির সংক্ষিপ্ত রেখা চিত্র।

যায়। তখন তাদেরকে সঠিক পথে আনতে আর একজন নবী আসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমনি দশায় আল্লাহ্ ওই সমস্ত বিকৃত ধর্ম বাতিল করে দিয়ে পথভ্রষ্ট জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে পূর্ববর্তী বিধান সংশোধন ও সংযোজনপূর্বক যুগোপযোগী করে নতুন বিধান দিয়ে আর একজন নবী পাঠান। তিনি দুনিয়ায়

www.pathagar.com

নবুওয়াতের দায়িত্ব পেয়ে প্রাপ্ত সঠিক বিধান প্রচার করতে থাকেন। ওই সময় পূর্ববর্তী বিকৃত ধর্মের লোকদের মধ্য থেকে কিছু কিছু লোক পরবর্তী নবপ্রবর্তীত সঠিক ধর্মে ফিরে এলেও অবশিষ্ট লোকগুলো বাপ-দাদার পালিত ধর্ম বলে সেই বিকৃত পুরাতন ধর্মেই থেকে যায়। উল্লেখ্য যে, একজন নবীর আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী যাবতীয় ধর্ম বাতিল হয়ে যায়। ফলে নবাগত নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে কেউ পূর্ববর্তী ধর্মের সঠিক বিধান পালন করলেও তা আর আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। কাজেই নিয়মের ধারা বজায় রাখতে সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)। "যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় তবে তা কখনও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, এবং পরকালে সে হবে সর্বশান্ত"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫।

এমনি ধারায় যুগে যুগে একজন নবীর মৃত্যুর পর স্বার্থন্বেষীদের দ্বারা এক একটি বিকৃত ধর্মের সৃষ্টি হয়। এ বিকৃত ধর্মগুলোই কালের স্রোতে আরও বিকৃত হয়ে বিভিন্ন মোশরেক জাতিতে রূপ নেয় বলে ইসলামের বিশ্বাস। অবশ্য জিন্দাবেস্তা, ত্রিপিটক এবং বেদ-বাইবেলেও অনাগত মহামানব আগমনের ধারণা রয়েছে, যা ইসলামের এ বিশ্বাসকে পরিপূর্ণরূপে সমর্থন করে।

ইসলাম মনে করে মূলত দুনিয়ার সকল ধর্মই এক, এবং এক আল্লাহর মনোনীত ধর্মেরই বিকৃত রূপ। ইসলাম এ পর্যন্ত আগত সমস্ত নবী-রাসূলগণকে ভক্তি ভরে স্বীকার করে, অন্যথায় কোন মুসলমানেরই ঈমান পূর্ণতা পায় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা নাজিল হয়েছে ইব্রাহীম (Abraham), ইসমাঈল (Ishmael), ইসহাক (Isaac), ইয়াকুব (Jacob), ঈসা (Jesus), ও অন্যান্য নবীদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে, তাতেও বিশ্বাস করি ; আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান)" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৪)। এভাবে অন্যান্য ধর্মের য়গম্বরদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে ইসলাম এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে, প্রচলিত অন্যান্য ধর্মসমূহের ক্ষেত্রে যা অচিন্তনীয়-অকল্পনীয়।

আল্লাহ সকল যুগের নবীদেরকে যুগোপযোগী বিধান দিয়েছেন অনুরূপ মুজিযাও দিয়েছেন। যেমন ফেরাউনের যুগে যাদুবিদ্যার প্রভাব ছিল খুব বেশি তাই মূসা আ.-কে আল্লাহ মুজিযা দিয়েছিলেন হাতের লাঠি সাপ

www.pathagar.com

হয়ে যাওয়া, মৃতকে জীবিত করা ইত্যাদি। আবার বিজ্ঞানের যুগ আসন্ন তাই আল্লাহ মুহাম্মদ সা.-কে বিজ্ঞান ভিত্তিক মুজিযা দিয়েছিলেন, যেমন মেরাজে মহাকাশ ভ্রমণ।

সকল ঐশীগ্রন্থে আল্লাহ্!

যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে স্রষ্টার নাম বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ, ইলাহ, ইল, এলি, এলোহ, এলোহিম, এলোহিয়া, জেহোভা, উলুহ, অল্ল, অল্লাহ, অল্লোহ, গড, ঈশ্বর, খোদা, ভগবান ইত্যাদি। একটি চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে যে, সেমেটিক, আরবী, হিব্রিয়, সিরিক, আরামিক, ক্যালেডিয়, হুমুরাবী, এরিয়ন, সংস্কৃত প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাসমূহে স্রষ্টার আসল নাম হিসেবে ব্যবহৃত শব্দগুলো একই ধাতুমূল থেকে উৎপন্ন। শুধু খোদা, গড, ঈশ্বর, ভগবান এ শব্দগুলো আলাদা ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে এবং এর ভাবার্থ এক বুঝালেও ধাতুমূল আলাদা।

ভাষাবিদগণ অনুমান করেন যে, মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই তাওহীদবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্ব-প্রতিপালকের একক সত্তা বুঝানোর জন্য 'আল্লাহ' শব্দটির প্রচলন রয়েছে। যেমন-প্রাচীন কালদানীয় ও সুরিয়ানি ভাষায় আল্লাহ শব্দটি 'এলহিয়া' প্রাচীন হিব্রু ভাষায় 'উলুহ্' এবং আরবি ভাষায় 'ইলাহ' রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিবর্তিত আরবী ভাষায় 'ইলাহ' এর সাথে আরবী 'আল' অব্যয় যুক্ত হয়ে 'আল ইলাহ' বা 'আল্লাহ' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। বেদ, বাইবেল ও কুরআন এই তিনখানা সু-প্রসিদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে বিশ্বপ্রভুর মূল নাম যথাক্রমে অল্ল (অল্লাহ, অল্লোহ), এল (এলী, এলোহিম, এলাহিয়া), ইলাহ (আল্লাহ)। এই নামগুলো একই ধাতুমূল 'অ-ল-হ' থেকে ব্যুৎপন্ন এবং একই তাৎপর্য বহন করে। তাহলে আমরা দেখি 'লা-ইলাহা (অল্ল, এল) ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ নেই কোনো ইলাহ্ (অল্ল, এল) আল্লাহ ছাড়া। এখানে সকল ধর্মের পবিত্র বাণী একই রকম।

সর্বশেষ ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআনে স্রষ্টার নাম এসেছে 'আল্লাহ' শব্দে। আল্লাহ শব্দটির কোনো ভাষান্তর হয় না, কারণ এক কথায় আল্লাহ শব্দের অর্থ করা যায় না। এর অর্থ করতে হলে একসাথে অনেকগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়, যেমন- রহমান, রাহিম, খালেক, মালেক, রাজ্জাক সহ প্রায় ৯৯টি শব্দ ব্যবহার করতে হয়। কাজেই 'আল্লাহ' শব্দের ভাষান্তর সম্ভব নয় এবং

www.pathagar.com

'আল্লাহ'ই হতে পারে বিশ্বপ্রভুর জন্য একমাত্র উপযোগী নাম। তবে 'অল্ল' ও 'এল' এই দুটি শব্দের সাথে 'আল্লাহ' শব্দটি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ও একই অর্থবোধক। কুরআনে উল্লিখিত ৯৯টি গুণবাচক নামের সমষ্টিগত গুণবাচক নাম ইলাহ-এর সাথে 'আল' অব্যয় যোগ হয়ে যে 'আল্লাহ' শব্দটি এসেছে এটাকেই ইসলাম বিশ্বপ্রভুর প্রকৃত নাম বা জাত নাম বলে।

স্রষ্টার 'আল্লাহ' নামটি কুরআনে এসেছে ২৬৯৮ বার। মাত্র চার অক্ষরের আল্লাহ (اللّٰه) নামটির এমন বৈশিষ্ট্য যে এক এক করে এর তিনটি অক্ষর বাদ দিলেও কোনো অবস্থায় তা আল্লাহ নামের বৈশিষ্ট্যকে ছাড়ে না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ যেমন অব্যয়, অক্ষয়, চিরঅম্লান, ঠিক তাঁর নামটিও অব্যয়, অক্ষয়, চিরঅম্লান। যেমন- (اللّٰه) আল্লাহ শব্দ থেকে (ا) আলিফ অক্ষর বাদ দিলে উচ্চারণ দাঁড়ায় (لله) লিল্লাহ অর্থ আল্লাহর জন্য। আলিফ এবং লাম অক্ষরদুটি বাদ দিলে থাকে (ل) 'লাহু' শব্দের অর্থ আল্লাহর। আবার প্রথম তিনটি অক্ষর বাদ দিলে থাকে শুধু (ه) 'হু' অর্থ তিনি। কুরআনের অনেক জায়গায় 'হু' শব্দ দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। এ কারণে ইসলাম দাবি করে 'আল্লাহ' ছাড়া বিশ্বে স্রষ্টার আর যত নাম আছে যেমন– ঈশ্বর, ভগবান, গড, জেহোভা প্রভৃতি নামগুলোর যেকোনো একটি অক্ষর ছেড়ে দিলেই তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই 'আল্লাহ' নামটি যে অনন্ত-অসীম চিরঅম্লান বিশ্বপ্রভুর আসল নাম, এই আলোচনায় সে কথাই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। "আর এমন লোকও আছে যে বিনা জ্ঞানে, বিনা দলিলে ও সুষ্ঠু কিতাব ছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে" (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৮)।

বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় আমরা প্রমাণ পেয়ে যাই কুরআনই একমাত্র অবিকৃত সঠিক ঐশীগ্রন্থ। যেহেতু ইসলাম অবিকৃত এবং সঠিক ধর্ম, সেহেতু ইসলামে ভাঁওতাবাজীর কোনো স্থান নেই। কোনো একক ব্যক্তির চরিত্র দিয়ে ইসলামকে মাপা চলে না। ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম নিয়ে যারা ভাঁওতাবাজী করে দোয়া তাবিজের ব্যবসা করে, কবরের মোরাকাবা করে, উদ্ভট কথা বলে মূলত তারা ঈমানহীন। অনেক সময় দু-একজন আলেমেরও পদস্খলন ঘটতে পারে। চুরি, ঘুষ, ধর্ষণের মত অনৈতিক কাজেও তারা জড়িয়ে পড়তে পারে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যখন দোদুল্যমনতা প্রবল হয় তখনই এমনটি ঘটে থাকে। এ দোদুল্যমনতাই আবার মানুষকে ধর্মের দিক থেকে নাস্তিকতার দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে। কাজেই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দোদুল্যমনতা কাটিয়ে উঠা প্রতিটি ধার্মিকের জন্য একান্ত জরুরী। আর এ দোদুল্যমনতা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজন ধর্ম এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিপ্রমাণের সমন্বয়।

www.pathagar.com

ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা

ইসলামের দাবি হচ্ছে–'ইসলামের মহত্ব, উদারতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিপূর্ণ সত্যতা দেখে চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও সারাবিশ্বে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল কাটিয়ে যৌক্তিক বিশ্বাসের আড়ালে প্রতিনিয়ত শত শত মানুষ একত্ববাদী ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তি লাভ করছেন'। তাদের আরও দাবি হচ্ছে–'ধর্মান্তরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের ধর্মান্তরিত হতে দেখা যায় না। বড় বড় জ্ঞানী-গুণী চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব যখন স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হয় তখন অন্যান্য ধর্মে শিক্ষা, চাকুরী, আর্থিক সুবিধাদিসহ বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার সার্থকতা মোটেও টেকসই নয়'। ইসলামের এ দাবির স্বপক্ষে এখানে বিখ্যাত, জ্ঞানী-গুণী নওমুসলিম ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্বলিত বক্তব্য থেকেই এর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ উপলব্ধি করা যেতে পারে। তাদের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য আমাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটা বিশেষ প্রভাবও ফেলতে পারে।

* শব্দ-বিজ্ঞানী, ভূ-বিজ্ঞানী ও গ্রন্থকার, ইংল্যান্ডের অধিবাসী প্রফেসর হারুন মোস্তফা লিওন তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-"ইসলামের গৌরবজনক দিক হলো-ইসলাম কতকগুলো যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানব মনের এ প্রয়োজনীয় অংশগুলো (যুক্তি) ইসলাম ত্যাগ করতে দেয়নি। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অনুসন্ধান ও পরামর্শ গ্রহণ করে অধ্যয়ন করার নির্দেশ দেয়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে সত্যের অনুসন্ধান ও যাচাই করার অগ্রাধিকার আছে।

হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন-'মহান আল্লাহ যুক্তির মত এমন উত্তম জিনিস আর তৈরি করেননি'।

হযরত ঈসা আ.-এর উপদেশ- 'সব জিনিসকে পরীক্ষা করে দেখুন, তারপর উত্তমটি তাড়াতাড়ি গ্রহণ করুন'। এটা ইসলামের সাথে প্রায় মিলে যায়। সূরা আলজুমু'আতে আছে, 'যারা অন্ধকারকে অনুসরণ করে বুদ্ধি ও যুক্তির ব্যবহারে অবহেলা করলো, যা মহান দাতা ও চিরস্থায়ী আল্লাহ দান করেছেন, তারা যেন এমন গাধার মতো-যে গাধার পিঠে বইয়ের বোঝা রাখা হয়েছে'।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন-'পৃথিবী অন্ধকারময়, জ্ঞানই আলো। কিন্তু যে জ্ঞানের মধ্যে সত্য নেই তা ছায়া বিশেষ'।

www.pathagar.com

মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, 'ইসলাম' একটি শব্দ যা সত্য-শব্দের সাথে সমার্থবোধক, সুতরাং যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে 'সত্যকে' জানতে হবে। জানা একমাত্র যুক্তি দিয়েই সম্ভব।"

* বিখ্যাত রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী এবং 'বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে মুহাম্মদ সা.' নামক প্রবন্ধ সিরিজের লেখক, ইরানের অধিবাসী প্রফেসর রেভারেন্ড ডেভিড বেঞ্জামিন কেলদানী; (মুসলিম নাম অধ্যাপক আব্দুল আহাদ দাউদ) তাঁর ইসলাম গ্রহণ সর্ম্পকে বলেন–"ইসলাম সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, এ সত্যকে অনুধাবন করতে পেরেই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এজন্য আমার প্রতি কেউ কোনো চাপ সৃষ্টি করেনি; বা অন্য কোনো কারণও নেই। আমি খৃস্টান ধর্মবোধের প্রতি সামান্যতম আঘাত দেয়ার ইচ্ছাও পোষণ করি না। আমি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা. ও আল্লাহর প্রেরীত অন্যান্য নবীগণের মতই হযরত ঈসা আ. ও হযরত ইব্রাহীম আ.-কে মানি ও ভালোবাসি।

পাক কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, 'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তা'লাশ করছে? আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমার ওপর, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, এবং তাদের বংশধরগণের ওপর আর যা কিছু পেয়েছেন মুসা ও ঈসা এবং অন্যান্য সমস্ত নবী-রাসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত' (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩-৮৪)।

* প্রফেসর কেলদানী একজন বিখ্যাত ক্যাথলিক পাদ্রী হিসেবে খৃস্টানধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপক পর্যালোচনাপূর্বক খৃস্টানদের প্রতি বিরোধিতা পরিহার করে শ্রদ্ধা ও নিরপেক্ষতার সাথে ইসলামকে অনুধাবন করার সবিনয় আহ্বান জানান। তিনি বলেন- "আল্লাহ পিতাও নন, পুত্রও নন। তাঁর কোনো জননী নেই বা তিনি জাত নন। 'পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্রাত্মা ঈশ্বর'-নীতি হলো ঈশ্বরের একত্বের প্রকাশ্য অস্বীকৃতি। যতক্ষণ পর্যন্ত খৃস্টানগণ ত্রিত্ববাদ-বিশ্বাস ত্যাগ করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহতে বিশ্বাসী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার আল্লাহর নিকট অবিশ্বাসীই থাকবেন। আসলে খৃস্টানরা প্রকৃতভাবেই অবিশ্বাসী। "নিশ্চয় কতক অবিশ্বাসী আছে যারা বলে আল্লাহ তিনের একজন। যদি তারা এরূপ কথন হতে নিবৃত না হয়, তবে তাদের ওপর এক বেদনাদায়ক শাস্তি নিপতিত হবে যা কাফিরদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে" (সূরা আল মায়িদাহ ঃ ৭৩)। খৃস্টানরা বলে 'স্বর্গের ঈশ্বর হলো অবাস্তব ও অলীক। গীর্জার তিন ঈশ্বরের

www.pathagar.com

পৃথক পৃথক সত্তা রয়েছে, এর মধ্যে পিতা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে হলেন প্রকৃত ঈশ্বর, কিন্তু পুত্র হলেন একজন নবী ও ঈশ্বরের সেবক, আর তৃতীয়টি হলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অগণিত পবিত্রাত্মার সমষ্টি।"

* বিশিষ্ট সাহিত্যিক, প্রখ্যাত সাংবাদিক, জনপ্রিয় নাট্যকার, অভিনেতা, ওজস্বী বাগ্মী, তামিলনাড় , ভারতের অধিবাসী জনাব আবদুল্লাহ্ আদিয়ার একটি ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজনৈতিক অপরাধে জরুরি আইন বলে বন্দী হয়ে দেড় বছর কারাভোগ করেন। এই সময় তাঁর সাথে চরম দুর্ব্যবহার করা হয়, ফলে তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। দুশ্চিন্তায় পড়ে তিনি মনকে হালকা করার জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়তেন, কিন্তু কোনো ধর্মই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারে নাই। একমাত্র ইসলাম ধর্মেই তিনি পথের দিশা খুঁজে পান এবং বুঝতে পারেন 'আল্লাহ ভীতিই চরম বুদ্ধিমানের কাজ এবং সে অন্তরে দুনিয়ার অন্য কারো ভয় স্থান পায় না'।

ইসলাম গ্রহণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়ার পূর্বেই তাঁর ইসলাম সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ রচনা পড়ে অনেক ব্যক্তি এবং পরিবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন "একমাত্র ইসলামী অনুশাসনের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমেই সকল শ্রেণীবৈষম্য সংঘাত ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়া সম্ভব। কারণ ইসলামী অনুশাসন মানব মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো বিধান নয় এ বিশ্বজগতের একমাত্র প্রভু আল্লাহই এ অনুশাসনের রচয়িতা। তাই আল্লাহর দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাঁর অনুশাসনই বাস্তবায়িত করতে হবে"।

* বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইংরেজির অধ্যাপক মাখন লাল ধর, (মুসলিম নাম-অধ্যাপক মো. নূরুদ্দীন আলমগীর) ফরিদপুর, বাংলাদেশের অধিবাসী। তিনি এক শিক্ষিত কায়স্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্ত বয়সে তিনি খৃস্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের সাথে গভীরভাবে পরিচিত হন এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সত্য ও শান্তি লাভ করেন।

নিজের বাড়িতে পূজামণ্ডপ থাকায় ছোটকাল থেকেই বারমাসে তেরপূজার আচার-অনুষ্ঠান ও দেব-দেবী সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

www.pathagar.com

* ইংলান্ডের অধিবাসী, বিখ্যাত গ্রন্থকার, কবি ও ঔপন্যাসিক উইলিয়াম বাচেল পিকার্ড, (মুসলিম নাম-বশির পিকার্ড) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন "প্রত্যেকে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত (ইসলামিক) চেতনা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তার মা-বাপ তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা মজুসী (অগ্নিপূজক) হিসেবে গড়ে তোলেন" (হাদিস)। ইসলাম ধর্মের আওতায় জন্মগ্রহণ করেও এ বাণীর সত্যতা বুঝতে আমার অনেক বছর কেটে গেছে। ইসলাম হল সেই ধর্মেরই নাম, বিভ্রান্তিকর ভাবে যা পাশ্চাত্যজগতে 'মুহাম্মদবাদ' বলে আখ্যায়িত হয়েছে। 'ইসলাম' অর্থ আল্লাহর প্রতি 'আত্মসমর্পণ'। এর আরও এক অর্থ হলো 'শান্তি'। যে শান্তি কেবল আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অর্জন করা যায়।

পাশ্চাত্যে একটা ধারণা রয়েছে যে, ইসলাম হলো মুহাম্মদ সা. কতৃক প্রবর্তিত নতুন এক ধর্ম, এ ধারণা ভুল। আসলে ইসলাম ছিল আদম আ., ইব্রাহীম আ. মূসা আ. এবং বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে উল্লিখিত সকল নবী–রাসূলগণের ধর্ম। যিশু খৃস্টের ধর্মও ছিল ইসলাম। মুহাম্মদ সা. সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে বাণী প্রচার করে গেছেন তা হলো-আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, কোন সাহায্যকারী নেই, তিনি ছাড়া বন্দেগীর উপযুক্ত আর কেউ নেই।"

খৃষ্টীয় প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্বাসের মধ্যে লালিত-পালিত জনাব পিকার্ডকে সন্তুষ্ট এবং ধরে রাখতে পারে নাই খৃষ্টধর্ম। তিনি বলেন "সহজপ্রাপ্য বস্তু যেমন নষ্ট হয়, তেমনি হালকা বিশ্বাসের সিদ্ধান্তও পরিশেষে গুলিয়ে যায়। সে কারণে আমি যতদূর পেরেছি পাশ্চাত্য লেখকদের লিখিত ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে সমালোচনাপূর্ণ লেখাগুলো পড়ে দেখার চেষ্টা করেছি, যার বেশিভাগই ছিল ইসলাম বিরোধী। কিন্তু কিছু অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং বিদ্বেষহীন ও সংস্কারমুক্ত লেখকবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পর্কীয় মতবাদের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। আমার সিদ্ধান্ত ছিল সজ্ঞানে, বস্তুর লাভালাভের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করি নাই। বরং এই নতুন ধর্মকে সম্ভাব্য সকল দিক থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেই আমি তাকে গ্রহণ করেছি।"

* জার্মানের অধিবাসী কুটনৈতিক, ধর্মপ্রচারক এবং সমাজকর্মী মোহাম্মদ আমান বহম তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন- "বিধর্মীদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবার প্রথম কারণ হচ্ছে, ইসলামের মূলনীতিগুলো এমন যুক্তিপূর্ণ, বাস্তবতাসম্পন্ন এবং হৃদয়গ্রাহী যে, যে কোনো সত্যসন্ধানীর মন এতে অভিভূত না হয়ে পারে না। ইসলাম সকল

www.pathagar.com

মানুষকে কুসংস্কারের হাত থেকে রক্ষা করে সকলকে সমান ও উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ইসলামের ধৈর্য ও উদারতা। ইসলামের দৈনন্দিন প্রার্থনারীতি (দৈনিক পাঁচবার নামাজ) মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। একমাস রোজা নিজেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শিখায় এবং এই দুটি প্রয়োজনীয় গুণ মানুষকে সৎ ও মহৎ হতে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধর্মের সামাজিক পরিবেশে আমি জীবনযাপন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে পর্যালোচনা করার সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই একটিমাত্র সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, ইসলামই একমাত্র যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই হচ্ছে ইসলামের মূল শিক্ষা।"

* সহকারী মানব জাতি বিশারদ, জাপানের অধিবাসী মোহাম্মদ সুলাইমান তাকিউচী তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-"মানব জীবনের সকল সমস্যার বাস্তব ও সুস্পষ্ট সমাধান রয়েছে ইসলামে। মানব সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো ইবাদতের স্থান ইসলামে নেই।

তিনি ইসলামকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব-মানবতা, বিশ্ব-সমতা তথা আন্তর্জাতিক ধর্ম বলে উল্লেখ করে বলেন-"মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম হিসেবে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বের ইসলাম এবং কুরআন সময়ের সকল বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে আজও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় টিকে আছে। ইসলাম যেহেতু স্বভাব ধর্ম তথা জন্মগত ধর্ম, তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের কাছে প্রয়োজনবোধে একে নমনীয় করারও প্রয়োজন রয়েছে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে-মানব সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে ইসলাম অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।

বৌদ্ধ ও খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে আমি জানি, এ উভয় ধর্ম একথাই শিক্ষা দেয়, 'পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করো, মানব সমাজ ত্যাগ করো, তবেই মুক্তি'। পক্ষান্তরে ইসলাম হাটে-ঘাটে, শহরে-বন্দরে মসজিদ তৈরি করে জামায়াতে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেয় এবং সেই সাথে সামাজিক কর্তব্য পালনেরও নির্দেশ দেয়। এ উভয় কাজকেই ইসলাম ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছে। এরূপ অপূর্ব চমৎকার ব্যবস্থা শুধু ইসলাম ধর্মেই আছে। আত্মা এবং শরীর নিয়েই মানুষের জীবন। সুতরাং পূর্ণ মানব জীবনের জন্য আমাদের আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব জীবনকে পৃথক না করে এ উভয় অংশকেই ইবাদতের মধ্যে গণ্য করে মানব জীবনের জন্য এক সুন্দর দর্শন গড়ে তুলেছে ইসলাম।"

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক ও ব্যারোনেট, ইংল্যান্ডের অধিবাসী স্যার চার্লস এডওয়ার্ড আর্চিবল্ড ওয়াটকিন্স হ্যামিলটন (মুসলিম নাম- আবদুল্লাহ

www.pathagar.com

হ্যামিলটন)। তিনি ইসলাম সম্পর্কে বলেন-"অজ্ঞতা ও গোঁড়ামীমুক্ত ধর্ম হিসেবে ইসলামের কোনো জুড়ি নেই। ইসলাম সমাজতান্ত্রিক সমস্যার এক নিখুঁত সমাধান। দুর্বলের জন্য এ ধর্ম বল স্বরূপ গরীবের জন্য এ ধর্ম ধন স্বরূপ।

ইসলামের মতে, কর্ম ছাড়া শুধু বিশ্বাস অমূলক। কেননা কর্মহীন বিশ্বাসের অস্তিত্ব জীবন্ত নয়। কর্মের পরিমাণ অনুযায়ী পুরস্কার ইহ এবং পর উভয় কালেই। আমার কৃতকর্মের জন্য আমাকেই ফল ভোগ করতে হবে, অন্য কেউ সাহায্য করতে আসবে না।

ইসলাম প্রতি দিনের জীবনে মানবতাকে তুলে ধরে। পক্ষান্তরে সাম্প্রতিক কালের খৃস্টানরা কথায়, কাজে ও মতবাদে রবিবারের ধর্মীয়-উপাসনা সেরে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে আল্লাহর বান্দাদের নিধনে ব্যস্ত থাকে।"

* হল্যান্ডের নৃতত্ত্ববিদ, লেখক ও বিখ্যাত পণ্ডিত, প্রফেসর আর, এল, মেল্লামা বলেন- "(ইসলামী) আইনের বিশদ দফাগুলো শিক্ষা করার নামই ইসলাম নয়। বরং ইসলাম তার চেয়ে অনেক বড় অনেক ব্যাপক। প্রথমেই ইসলামের মূল্যবোধে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং ঈমানের গভীরতার পরিমাণের ওপরে জ্ঞানের পরিমাণ নির্ভর করবে।

আমার কাছে ইসলামের সৌন্দর্য কি এবং বিশেষ করে কোনো বস্তু আমাকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করেছিল। এর উত্তর আমি সংক্ষেপে ছয় দফায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করছি-

(১) এক ও অদ্বিতীয় পরম সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে কোন জটিলতা নেই এবং প্রত্যেক ন্যায়ানুগ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে এটা সহজেই গ্রহণযোগ্য। সবকিছু আল্লাহর ওপর নির্ভর করে। তিনি কারো জন্মদাতা নন এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়।

(২) বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা প্রত্যক্ষ বা সরাসরি। আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষকে সর্বোচ্চ নির্দেশ ও হেদায়েত দেয়া হয়েছে। তাই ঈমানদারের কোন মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না। ইসলামে যাজকের কোনো স্থান নেই। এ ধর্মে আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা মানুষের নিজের ওপর নির্ভর করে। ইহলোকে মানুষ নিজেকে পরলোকের জন্য প্রস্তুত করবে। সে তার নিজের কর্মের জন্য দায়ী হবে। একজনের নেক কাজ দিয়ে অপরজনের প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে না। কারো ওপর এমন বোঝা চাপানো হবে না, যে বোঝা বইবার ক্ষমতা তার নেই।

www.pathagar.com

(৩) ইসলামের সহনশীলতার শিক্ষা ও মতবাদ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই। মুসলমানকে যে কোনো স্থান থেকে সত্যের অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে। অন্য ধর্মের উত্তম বস্তুসমূহের মূল্য নিরূপণ করতে এবং শ্রদ্ধা করতেও তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(৪) ইসলামের ভ্রাতৃত্বের দরজা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এ মতবাদ একমাত্র ইসলাম ধর্মই কার্যে পরিণত করতে সক্ষম। মুসলমান পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, একে অপরকে ভাই বলে স্বীকার করে। আল্লাহর নিকট সব মানুষই সমান। হজ্জের সময়ে ইহরামের পোশাকে তা বিশেষ তাৎপর্যসহকারে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে।

(৫) বস্তু, দেহ ও মন যে অবস্থায় থাকে ইসলাম তাকে সে প্রেক্ষিতেই গ্রহণ করে। দেহের প্রয়োজন অনুসারে মন-মানসিকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মানুষকে এমনভাবে চলতে হয় যেন মন বস্তুর উপরে জয়ী হয় এবং বস্তুকে দমন করে রাখে।

(৬) ইসলামে মদ ও চৈতন্য বিলোপকারী ঔষুধ (মাদক দ্রব্য) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা এমন একটা বিষয় যা সম্বন্ধে বলা চলে, "ইসলাম স্থান ও কালের অনেক অগ্রবর্তী।"

* ড. রামদাস পি. এইচ. ডি., (মুসলিম নাম- ড. রশিদ উদ্দীন খাঁন) তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-"আমার নিকট ইসলাম মানব জাতির জন্য একমাত্র ধর্ম। আমার বিশ্বাস এ ধর্মের মধ্যেই সব ধর্মীয় গোত্র ও মতাদর্শ একটি সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে। মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে প্রভেদ রয়েছে, এ পথ অনুসরণ করেই আমরা তা নিরসন করতে পারি। এ পথ অনুসরণ করার সাথে সাথে আমরা এমন এক শক্তির রাজ্যে উপনীত হই, যেখানে একমাত্র আল্লাহ স্বয়ং ক্ষমতায় সমাসীন। সহিষ্ণুতা এ ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং গোটা মানব জাতির সামগ্রিক উন্নতিই এ ধর্মের লক্ষ্য। মানব জীবনের সকল কার্যকলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে আল-কুরআন একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এমন অনেক বিষয় রয়েছে সেসব বিষয়ে গীতা ও উপনিষদের সাথে কুরআনের মিল আছে।

গীতায় মানুষের তৈরি সমস্ত উপাস্যের (দেব-দেবীর) মূলে কুঠারাঘাত করে শুধু পরম ব্রহ্মের নিকট সম্পূর্ণ রূপে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এটাই সত্যিকারভাবে সেই সনাতন ধর্মের আলোকরশ্মি (সত্য), যা চরম ও পরমভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে ইসলামের মধ্যে কুরআনের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

সাহায্য ও আলোর দিশা পেতে হলে আমাদের অবশ্যই এ গ্রন্থের শিক্ষায় ফিরে যেতে হবে। সে ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের সারগর্ভ বাণীসমূহের তাৎপর্য বুঝার চেষ্টা করা উচিত। কেননা কুরআনের বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরম কল্যাণ ও উৎকর্ষ (উন্নতি)। বস্তুত ইসলাম হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির অনুসরণ যোগ্য একমাত্র ধর্মমত।

* ইংল্যান্ডের অধিবাসী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ড. সারা লেনসন বলেন–"যখন কোনো বিখ্যাত বিজ্ঞানীর উক্তি 'সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন' এরূপ স্বীকৃতির কাছাকাছি এলেই ছাত্ররা আমাকে থামিয়ে দিতো। বলতো ম্যাডাম! নাস্তিকতা যদি বিজ্ঞান সম্মত হতো তাহলে কি এসব বিজ্ঞানী আস্তিক হতেন? আমি থমকে গিয়ে ভাবতাম। এ ভাবনাই একদিন আমাকে শুধু স্রষ্টার অস্তিত্বই নয়, বরং সুস্পষ্ট রূপে এক, অদ্বিতীয় ও মহান আল্লাহর সন্ধান দিল, যে সত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ও সন্ধান ইসলাম দিয়ে থাকে।

যে মহাসত্যের সন্ধানে মানুষ যুগ যুগ ধরে তাঁর অপর্যাপ্ত ও সসীম জ্ঞানকে ক্ষয় করে ফিরছে। আমার দৃষ্টিতে 'তাওহীদ বা একত্ববাদ'ই হচ্ছে তার একমাত্র সমাধান। এ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকেই ব্যর্থ হচ্ছে, আর অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ সত্যের শেষ ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে। কিন্তু সময়ের ও মেধা-মনীষার এত অপচয় না করে মহাসত্যের নির্ভুল নাগাল পাওয়ার জন্য ইসলামের কোনো বিকল্প নেই। তবে দেশ, সমাজ ও পরিবেশের প্রচুর বাধাবিপত্তির কারণে এদের অনেকেই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের সাহস পান না। পাশ্চাত্যে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।"

ড. সারা আরো বলেন–"আমি বরাবরই দুঃসাহসী। আর তাই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিকে খুব জোর গলায় এবং ফলাও করে প্রচার করেছি। আমি দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, বর্তমান বিশ্বে বস্তু ও মন সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষ যত অশান্তি ভোগ করছে-এসব কিছু থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো ইসলামকে পূর্ণরূপে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার প্রত্যাশী, আর তা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলাম ও কুরআনের বাস্তবায়ন।"

* ভারতের অধিবাসী ড. জিয়াউর রহমান আজমী পি,এইচ,ডি, অধ্যাপক মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলেন-"হিন্দু ধর্ম যথারীতি অধ্যয়ন না করলেও হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ এবং চারপাশে কঠিন ধর্মীয় পরিবেশের কারণে আমি

www.pathagar.com

একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। এমন কি হিন্দু ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মকেই সঠিক মনে করতাম না। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সামান্য একটু জানার সুযোগ হলে দেখলাম যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। তখন আমি নতুন করে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে চরমভাবে জ্ঞান অর্জন করতে লাগলাম কিন্তু এ ধর্ম আমাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলো না বরং চরম হতাশায় ফেলে দিল।

পরে তিনি ইসলামের সত্য সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং চরম নির্যাতন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ও দারুল উলুম ইসলামী মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর সৌদি আরবে গিয়ে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানকার শিক্ষা শেষ করে মক্কায় অবস্থিত বাদশাহ আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, ডিগ্রি এবং জামেয়া আযহার কায়রো থেকে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রি লাভ করেন।

ভারতের উচ্চ শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না রাজকুমারী জাবিদ এস, বানু পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে চারিদিকে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তাঁরই উদ্যোগে কলিকাতায় মুসলিম মহিলারা প্রথম জামাত করে ঈদের নামাজ আদায় করেন।

তিনি বলেন- "জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই আমি সত্য লাভ এবং বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন শুরু করি। আমি বৌদ্ধের বাণী এবং খৃষ্টধর্ম ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করি। যত যুক্তিই দেখান হোকনা কেন, নিঃসন্দেহে খৃস্টান চার্চের প্রতিটি ফেরকা বা উপদলই নিজস্ব মনগড়াভাবে বাইবেলের নীতি বা বিধানের ব্যাখ্যা দান করেছে। ফলে হতাশ হয়ে পুনরায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন শুরু করি। এখানে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা দেখে আমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। বেদ দর্শন অধ্যয়ন করে একটু আশ্বস্ত হলেও সেখানে দুনিয়াদারীর সম্পর্কবিহীন সন্ন্যাসী হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। তাছাড়া হিন্দু ধর্মে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই থাকবে তাহলে গান্ধীজি মিছেমিছি হরিজনদের জন্য নিজের পৈতৃক জানটা হারাতে যান? কেনই বা আইন করে বিধবা বিবাহ চালু করতে হয়? সতীদাহ প্রথাই বা কেন বৃটিশদের আইন করে বন্ধ করতে হয়? প্রতিটি সামাজিক কুসংস্কার উচ্ছেদের জন্য আইন পরিষদকে কেনই বা এগিয়ে আসতে হয়? এটা কেমন ধর্ম যে, ধর্মের বিধি-বিধানসমূহ মানুষের কল্যাণ বিরোধী?

আমার'তো মনে হয় অন্যান্য ধর্মের মতই হিন্দুধর্মও কেবল মানুষের জন্মের পরিচয়টুকু বহন করা ছাড়া বাস্তবে আর কোনো কাজেই আসে না। এরকমভাবে

www.pathagar.com

অন্যান্য সব ধর্মের চরম অসারতা অনুধাবনের পরও কি আপনারা আমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করবেন? ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের মানুষ এ ব্যাপারে অবিচল থাকতে পারে কি? ইসলামের মধ্যেই আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি এবং আমি সম্পূর্ণ সুখী। আধুনিক সভ্যতায় মুসলমানদের মধ্যে কেউ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার সাধনের দুঃসাহস করেন কি? এমন কোন কিছুর অভাব কি ইসলামে রয়েছে যার সন্ধান কুরআন শরিফে নেই? সমস্ত আধ্যাত্মিক নেতা, নবী-রসূলদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ সা.-ই কি সেই মহান ব্যক্তিত্ব নন যিনি সাম্য, স্বাধীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বিষয়কে ধর্মের নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছেন? ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম আছে কি যেখানে জীবনের প্রতিটি প্রাত্যহিক বিষয় এতটা জীবন্ত, যেখানে স্থানীয় ভাষায় আল্লাহর নামের রূপান্তর নেই, যেখানে সকল নবী-রসূলকে সমানভাবে জানতে শিক্ষা দেয়, যেখানে ভাষা ও জাতীয়তার ভৌগোলিক পার্থক্য অর্থহীন? এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ আছে কি যা মহত্ব, উদারতা, সঠিকতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে পবিত্র কুরআন অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের অধিকারী? ন্যায় বিচার বা ইনসাফ, মনুষ্যত্ব বা ইনসানিয়াত, স্বাধীনতা বা আজাদী ইসলাম ব্যতীত আর কোনো ধর্মেই পূর্ণতা পায়নি। ইসলামী আইনের উপযোগিতা সম্পর্কে কোনো আইন পরিষদ বা গণপরিষদের দুয়ারে ধর্ণা দিতে হয় না। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে যা কিছু প্রেরিত ও নির্দেশিত হয়েছে আজও সে সবকিছু হুবহু কার্যকর ও জীবন্ত।

জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যে ধর্মের নীতি-নিয়মের পার্থক্য আকাশ পাতাল, আমার পক্ষে সে ধর্মকে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আমি কি করে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃস্টান থাকতে পারি? এ সমস্ত ধর্ম যে বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ তাতে সন্দেহের আর অবকাশ কোথায়? আমি লক্ষ্য করেছি- মুসলমান ব্যতীত সকল মানুষই অতৃপ্ত। তারা যা-খুশী করতে পারেন। ইচ্ছামত যত খুশী অনুসন্ধান করুন, আমি সুনিশ্চিত যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় নীতি বা পদ্ধতি টেকসই হতে পারে না। ইসলাম তার একত্ববাদ ও ভ্রাতৃত্বের মহান অভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর চিরকালই সগৌরবে দণ্ডায়মান, অবিচল ও অক্ষয় থাকবেই।"

* মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন চিকিৎসক ডা. মীর্জা দেহলীন বলেন- "ইসলাম এটি বাস্তবমুখী ধর্ম, খৃস্টান ধর্মের মতো জটিলতাপূর্ণ নয়, যেখানে গডকে পেতে চার্চ, ধর্মযাজক ইত্যাদির মাধ্যমে যেতে হয়। ইসলাম আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তোলে। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কোনো মাধ্যম বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

বৃটেনের প্রফেসর জাকি, মুসলিম নাম প্রফেসর ইয়াকুব, ইসলাম সম্পর্কে বলেন–"আমি মনে করি ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে নিজের আদর্শে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের এ গুণটি নেই।

উদাহরণ স্বরূপ ইসলামী স্থাপত্য, ইসলামী শিল্পকলা, ইসলামী চারুকলা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সাথে আমাদের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু খৃস্টীয় স্থাপত্য, খৃস্টীয় শিল্পকলা, বা খৃস্টীয় চারুকলা জাতীয় কোনো কিছুর কথা কখনো শুনি না।

সম্ভবত ইসলামী সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইসলাম পৃথিবীর ইতিহাসে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে সুন্দর একটি শিক্ষাব্যবস্থা উপহার দিয়ে সারা মুসলিমবিশ্বেই 'মাদ্রাসা ফুল্লিয়া' অর্থাৎ বিশ্বজনীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা 'বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে। এ থেকেই বুঝা যায়, ইসলামই আমাদের বিশ্বজনীন জ্ঞানার্জনের পথকে সহজ-সুগম করে দিয়ে এই মহাবিশ্বে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে।

* দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন খৃস্টান ধর্মযাজক শায়খ আহম্মদ দীদাত, এক সময় যিনি খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসারই ছিল সার্বক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা, তিনি এখন জীবনের শেষভাগ বিলিয়ে দিচ্ছেন ইসলামের খেদমতে। তাঁর লেখা অনেকগুলো পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে 'আল কুরআন-দি আল্টিমেট মিরাকল' (Al-Quran the Ultemate Mirachels) (চরম অলৌকিক কর্ম আল-কুরআন) পুস্তিকায় আহম্মদ দীদাত আল কুরআনের চমকপ্রদ অলৌকিকতা আল-কুরআন থেকেই প্রমাণ করেছেন অংক শাস্ত্র ও কম্পিউটারের সাহায্যে। শায়খ আহমদ দীদাত খৃস্টান পাদ্রী ও ধর্ম যাজকদের প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে থাকেন। এ পর্যন্ত তাঁর সাথে তর্কযুদ্ধে যারা অবতীর্ণ হয়েছেন, তাদের সবাই শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় শুধু দক্ষিণ আফ্রিকাতেই দশ হাজারেরও বেশি বিধর্মী ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন।

* ভারতের 'হিন্দু সেনানী' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, সমাজকর্মী, শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক, শ্রী দূর্গাপ্রসাদ দেশমুখ- হিংস্র সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে নাম নিলেন 'দাউদ খান'। এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন–"বর্তমান ভারতীয় হিন্দু সমাজ সামাজিক শোষণ এবং নির্যাতনের একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকজনকে মানুষ বলেই মনে করে না। জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তর'তো বটেই দেবমন্দিরে পর্যন্ত একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর একচ্ছত্র

www.pathagar.com

অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। সে অধিকারের দেয়াল লংঘন করা নিম্নবর্ণের কোনো মর্যাদাবান জ্ঞানসাধকের পক্ষেও সম্ভব নয়। সুতরাং এ ধর্ম শোষণের হাতিয়ার, আর একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্যায়-অত্যাচারের বাহন হতে পারে কিন্তু কোনো ক্রমেই মানুষের ধর্ম হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।"

তিনি আরও বলেন–"বিশ্বাস করুন আমার ইসলাম গ্রহণ কোনো আকস্মিক হুজুগের ব্যাপার নয়, বরং আমি অনেক পড়াশুনা, দীর্ঘ চিন্তাভাবনা এবং সবকিছু দেখাশুনার পরই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি।"

* আমেরিকার বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ন 'মাইক টাইসন' (মুসলিম নাম–মালিক আব্দুল আজিজ)। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল, দুর্ধর্ষ, শক্তিশালী মুষ্টিযোদ্ধা এক খৃষ্টান যুবক। ধর্ষণের অভিযোগে কারাভোগের সময় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তিনি বলেছেন–"এতদিন আমি ছিলাম নিতান্ত অবুঝ, কাঁচা বয়সের। এখন আমার মাঝে পরিপক্বতা এসেছে, আমি আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করার চেষ্টা করবো। 'ইসলাম' মানবজাতির জন্য আল্লাহর দেয়া সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। ইসলামের সংস্পর্শে যারা এসেছে, ইসলাম তাদের খাঁটি সোনায় পরিণত করেছে।"

* আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয় খৃষ্টান মিশনারী সংস্থার প্রধান পাদ্রী 'ইসহাক' তাঁর নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট থাকেন, নানাজন নিজের পাপ মোচনের জন্য করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা চান, আর তিনি ক্রুশ বুলিয়ে ক্ষমা করেন মানুষকে। একজন মহিলা তিনবার খৃষ্টধর্মের অবাধ্যাচরণ করে পাদ্রীজীর কাছে ক্ষমা চাইতে এলে পাদ্রীজী নিজের কথায়-তার চেহারায় ক্রুশচিহ্ন ছোঁয়াতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমি তো সবাইকে ক্ষমা করি কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবে কে ? আমার এ মনের কথাগুলো পোপকে জানালে তিনি সহসা বললেন, 'তোমার পাপ ক্ষমা করবেন পোপ'। আমি বললাম– 'আর পোপকে কে ক্ষমা করবেন'? কিছুক্ষণ ভেবে তিনি বললেন, 'পোপের সত্তা'তো নিষ্পাপ, তাই এ প্রশ্নের ক্রমধারা আর ঊর্ধ্বে যাবে না'।

তিনি আরও বলেন– এর পর আমার উপর অমানসিক নির্যাতন চালানো হয়, যার দাগ আমার শরীরে আজও বিদ্যমান। পরে আমাকে শুকর চরাবার কাজে নিয়োগ করে। তিনমাস পর পুনরায় আমাকে নিয়ে যায় গীর্জার সবচেয়ে বড় পুরোহিতের কাছে ধর্ম শিক্ষার জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি কুরআনের কিছু আয়াত শুনায়ে আমাকে বললেন–'তোমাকে বলছি, তুমি গোপনীয়তা রক্ষা করো, কারো কাছেই তোমার এসব মনের কথা ব্যক্ত করো

www.pathagar.com

না যেন। আরও কিছু দিন যাক। তোমার কাছে সত্য যথারীতি সমুদ্ভাসিত হোক, তুমি বুঝ'।

সবার বড় পুরোহীতের এরূপ কথার রহস্য জানার জন্য তাঁর সাথে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ হলাম। একদিন রাত পোহাবার একটু আগে আমি তাঁর বাসায় গিয়ে কড়া নাড়ালাম। কেউ সাড়া দিল না। একটু পরে তিনি নিজেই এসে দরজা খুলে দিলেন। আমি ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করলাম তিনি নামাজ পড়ছিলেন। অশ্রুভরা নয়নে তিনি আমাকে বললেন 'এ কথা কাউকে বলো না ভাই' কুরআন আমার হৃদয়ের খোরাক, মহান আল্লাহর একত্ববাদই আমার জীবনের পাথেয়, উপায় ও আমার ধর্মবিশ্বাস। আমার যাবতীয় ইবাদত-উপাসনা পরাক্রমশালী সেই একক সত্তার জন্য।

এরপর আমি ইসলাম সম্পর্কে বহু অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তা-ভাবনা করে ইসলাম গ্রহণ করি। এ জন্য আমাকে বহু যাতনা সহ্য করতে হয়েছে, কারণ আমি ছিলাম গীর্জার তদারককারী ও পাদ্রী এবং আফ্রিকার খৃষ্টান সংস্থার চেয়ারম্যান।

তানজানিয়ার একজন শীর্ষস্থানীয় আর্চ-বিশপ হাজী আবুবকর ১৯৮৩ সালে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত চার্চসমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের তিনিই ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। এ সম্মেলনে আফ্রিকায় ইসলামের প্রসার রোধ করতে বিভিন্ন পন্থা-প্রণালি উদ্ভাবন করার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করা হয় তিনি তার অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এ সময় তিনি ইসলাম-বিদ্বেষের উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রেমিক হয়ে ওঠেন। পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন চার্চ-নেতাদের সঙ্গে ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে গভীর আলোচনার পর তিনি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

* দক্ষিণ আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় ক্যাথলিক পাদ্রী এবং বিশ্ব-চার্চ পরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মঁসিয়ে ফ্রেডারিক ডোনমার্ক ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনার এক পর্যায়ে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হযরত ঈসা আ.-এর বর্ণনা পাঠ করে অভিভূত হয়ে যান। তিনি বলেন-"কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আ.-এর পরিচিতিটা এতই হৃদয়গ্রাহী, সম্মানজনক এবং যুক্তিগ্রাহ্য যে পরিচ্ছন্ন বিবেক তা গ্রহণ না করে পারে না।"

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন-"আমি আফ্রিকায় গিয়েছিলাম ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এখন আমার অভিজ্ঞতা, কর্মশক্তি ও প্রচারকৌশল ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হবে এবং বাকি জীবন আমি ইসলামের একজন সৈনিকরূপে কাটাতে চাই।"

www.pathagar.com

* ফিলিপাইনের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ও সাবেক খৃস্টান পাদ্রী মি. মরটিনি, (মুসলিম নাম-আব্দুর রহিম)। তিনি একজন পাদ্রী হিসেবে দশ বছর এই ধর্মযাজকের কাজ করেছেন। খৃস্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে ধর্মযাজক হওয়ার পর। তাঁর প্রথম সন্দেহ- মানুষ কীভাবে ত্রিত্ববাদী হতে পারেন? একজন পাদ্রী অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষের পাপকে কীভাবে মোচন করতে পারেন? এটি কি সম্ভব যে, যিশু মানব জাতিকে পাপমুক্ত করবেন? সন্ন্যাস জীবন'তো মানব ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন, এটি কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? তিনি আরও বলেন, যিশু নাকি খোদার পুত্র, এটি কি যুক্তিযুক্ত? আমি এটা মেনে নিতে পারছিলাম না।

সৌদি আরবে যখন আমি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করি, তখন এসব প্রশ্ন আমাকে বিব্রত করতে থাকে। এ সময় একজন সৌদি যুবকের সাথে আমার আন্তরিকতা গড়ে উঠে এবং তার দেয়া দুটি পুস্তক থেকে সত্যকে সঠিকভাবে জানতে পেরে আমার মনের সন্দেহ দূর হয় এবং আমি ইসলাম গ্রহণ করি।

* শ্রীলঙ্কার প্রখ্যাত খৃস্টান ধর্মযাজক, দাব্বু দামারিস, নিজ উপলব্ধির আলোকে ইসলাম গ্রহণ করে নাম নিলেন, মোহাম্মদ শরীফ। 'দাব্বু' যখন চাকরি নিয়ে সৌদি আরবে যান, তখন তাঁর ধারণা ছিল-মুসলমানরা হয়তো মূর্তিপূজক, এরা হয়তো আকাশের চাঁদকে পূজা দেয়। নামাজের উঠাবসা দেখে তিনি মনে করতেন, এটা চন্দ্রপূজার ক্রিয়াকাণ্ডের মতই দেখা যায়। এসব বিভ্রান্তিকর জগাখিচুড়ি মার্কা বিষয় নাকি রাসূল সা. থেকে বর্ণিত বলে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই হয়তো তাকে কেউ বলেছিল।

সামান্য ক'দিন পরেই তিনি যখন দেখলেন আযানের সাথে সাথেই মুসলমানগণ দোকানপাট ও সকল কর্মব্যস্ততা বন্ধ করে দিয়ে মসজিদে এসে সমবেত হচ্ছে তখনই তাঁর চেতনা জেগে ওঠে। এরপর আস্তে আস্তে তাঁর ভুল ভাঙতে থাকে এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার ইচ্ছা বেড়ে যায়। একদিন তাঁর এক বন্ধুর কাছে পবিত্র কুরআনের অনুবাদকপি দেখতে পেয়ে কিছু সময়ের জন্য চেয়ে নেন। তারপর আনন্দিত মনে বাসায় ফিরে সারারাত জেগে তা মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকেন এবং দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা বইতে থাকে। এভাবে ফজরের আযানের ধ্বনি শোনামাত্রই তিনি আকুল হয়ে যেন নিজের অজান্তেই গোসল করে সে ওয়াক্তের নামাজ আদায় করেন। পরে তিনি শরয়ী আদালতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মান্তরের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। এর পর থেকে তিনি নিজেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করেন।

www.pathagar.com

* বুলগেরিয়ার উচ্চ শিক্ষিত ও শীর্ষস্থানীয় খৃস্টান ধর্মযাজক, ক্যাথলিক পাদ্রী ঈসাকে খৃস্টান ধর্মান্তরের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় সাজার ও বুমাক সম্প্রদায়গুলোতে, যারা সংখ্যায় ছিল প্রায় এক মিলিয়ন। একটি ক্যাথলিক গীর্জায় অধ্যয়নকালে যখন দেখলেন যে গীর্জার সমৃদ্ধ লাইব্রেরির বিপুল গ্রন্থসমাহারে ইসলাম সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কোনো গ্রন্থই রাখা হয়নি, তখনই তাঁর ইসলাম সম্পর্কে জানার ও গবেষণা করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তিনি প্রবৃত্ত হন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পর্যালোচনায় বিশেষত তিনটি ধর্ম নিয়ে। বাইবেল ও ইঞ্জিল তার পুরোই মুখস্ত ছিল, এমন কি এ দুটোতে যে সব মিথ্যা বানোয়াট বর্ণনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেগুলো সম্পর্কেও তিনি ছিলেন পূর্ণ অবহিত। তাই পবিত্র কুরআনের আলোচনা ও খৃস্টানদের কথিত ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি আর দেরি না করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে ধন্য করেন।

* ম্যানিলার উচ্চ শিক্ষিত ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারক সালেহ্ আল-সুলাইমান বলেন-"বিগত আটচল্লিশ বছর যাবত আমার মনে এ কথা বদ্ধমূল ছিল যে, খৃস্টবাদই হচ্ছে একমাত্র সত্য ধর্ম, আর এর মূল আকিদা (বিশ্বাস) সত্যের উপর ভিত্তিশীল। সৌদি আরবে অবস্থানকালে ড. জামাল বাদাভি কর্তৃক ইংরেজিতে প্রচারিত 'ইসলাম পরিচিতি' শিরোনামে সৌদি টেলিপ্রোগ্রামের মাধ্যমে খৃস্টবাদ ও মৌলিক আকিদা, ত্রিত্ববাদ এবং পাপমোচন সম্পর্কে যে সত্য তথ্য তুলে ধরা হয় তাতে আমি বিস্মিত হই এবং আমি সত্য ও ন্যায়ের নিক্তিতে যুক্তি-তর্ক ও বিবেক বুদ্ধি খাটাতে শুরু করি।

অত্যধিক শ্রমসাধ্য হলেও কুরআন (অনুবাদ) ও মানুষের হাতে রদবদল-কৃত ইঞ্জিলের অনুশাসনাদি তুলনা করতে গিয়ে দেখতে পেলাম, কুরআনের ইসলামী শিক্ষা বেশি যুক্তিযুক্ত ও সত্যের কাছাকাছি। আমার ইচ্ছা যে, খৃস্টান ভাইয়েরা এ সত্য উপলব্ধি করে সত্য-সনাতন ইসলামের দিকে ফিরে আসুক। 'হায় ! আমার জাতি যদি জানতে পারতো ------!

ইসলাম সম্পর্কে আমার অধ্যয়নের সারসংক্ষেপ হচ্ছে "সত্য সনাতন ইসলাম ধর্মের মূল উৎস কুরআন, যা রাসূল সা.-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোনো প্রকার রদবদল ও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়নি। রাসূল সা.-এর হাদীসের ক্ষেত্রেও একান্ত সুব্যবস্থার মাধ্যমে রদবদল ও দোষমুক্ত রাখা হয়েছে এবং হাদীস হচ্ছে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যাকারী।"

তিনি আরও বলেন-"খৃস্টবাদের প্রথম আকিদা ত্রিত্ববাদই আমাকে খৃস্টবাদ থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে ইসলামের একত্ববাদের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে

www.pathagar.com

বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয়ত খৃষ্ট ধর্মযাজকরা ঈশ্বর এবং মানুষের মাঝে মাধ্যম ও অংশীদার রূপে দাঁড়িয়েছে। তাদের খুশী ছাড়া ঈশ্বরও খুশী হন না। আর তারা অসন্তুষ্ট হলে ঈশ্বরও ক্ষেপে যান। সুতরাং মানুষকে আল্লাহর চাইতে তাদেরকে বেশি ভয় করতে হয়। এ ছাড়াও তারা পরকালের মুক্তি, পাপমোচন ও মার্জনার চাবিকাঠি নিজেদের হাতে রেখেছেন। কিন্তু ইসলামে অংশীদার ও মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি। এ কারণেই যে একবার ইসলামের আওতায় আসে সে কখনও আর এ ধর্ম ত্যাগ করে না।"

* ইথিওপিয়ার সাবেক খৃস্টান ধর্মযাজক মি. ফাকাদু ইসলাম সর্ম্পকে ব্যাপক পড়াশুনা করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর উপরে নেমে আসে চরম আঘাত, কিন্তু সকল অন্যায়-অত্যাচার, বাধা-বিপত্তি আর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ইসলাম গ্রহণ করে 'মোহাম্মদ সাইদ ফাকাদু' নামে আত্মপ্রকাশ করেন। মিথ্যা মামলা, হয়রানী, কারাবাস কোনো কিছুই সত্যের পথ থেকে তাঁকে দূরে সরাতে পারেনি।

* ওকিং স্পিরিচুয়ালিস্ট চার্চের প্রেসিডেন্ট, ইংল্যান্ডের জর্জ ফাউলার তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলেন-"আমি খৃস্টধর্মের সম্প্রদায়-বিশেষের এক গোঁড়া পরিবারে প্রতিপালিত হই। আমার পিতা ছিলেন স্থানীয় ধর্মপ্রচারক এবং মা ছিলেন চার্চের এক উৎসাহী সেবিকা। ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের জন্য আমি সব সময় তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছি এবং আমি যদিও যিশু খৃস্টের ধর্মোপদেশের সঙ্গে এক মত, তথাপি আল্লাহ সম্পর্কে খৃস্টধর্মের ত্রিত্ববাদকে গ্রহণ করতে পারিনি। এ ত্রিত্ববাদকে গ্রহণের অনিচ্ছা আমাকে খৃস্টধর্ম হতে সরে পড়তে বাধ্য করে এবং বিব্রত করে তোলে।

ওকিং-এ বসবাস করতে এসে আমি এক সময় এখানকার স্পিরিচুয়ালিস্ট চার্চের প্রেসিডেন্ট হই। আমি বিশেষভাবে জোর দিয়ে প্রচার করতাম যে, সমগ্র মনুষ্যজাতির একত্বের শিক্ষা চার্চ শিক্ষার একটি অখণ্ড অংশ এবং পয়গম্বরগণ যুগে যুগে এই কথাই বলে এসেছেন। এই সময়ে আমি এক মসজিদের ইমামকে গীর্জার এক অনুষ্ঠানে ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করায় তিনি বক্তৃতা দিতে এলে উপস্থিত সকলেই তাঁর বক্তৃতা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেন। তখন থেকে আমি মসজিদের বিভিন্ন সমাবেশে নিয়মিতভাবে অংশ গ্রহণ করতে থাকি এবং দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপারটি সম্পর্কে গুরুতর-ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ইসলাম গ্রহণ করি।"

* উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ জে, ডাব্লিউ, লাভগ্রোভ, (মুসলিম নাম হাবিব উল্লাহ) তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের উত্থাপিত প্রশ্নের

www.pathagar.com

উত্তর দিতে গিয়ে বলেন-"আমার (বর্তমান) বিশ্বাসের ধর্ম ঐতিহাসিক ধর্ম এবং তার রাসূল সা. বিশেষভবে ঐতিহাসিক চরিত্রের অধিকারী। অপরাপর ধর্মপ্রচারকদের জীবনী অলৌকিক গাল-গল্পে এমনভাবে ঢেকে গেছে যে, কাজ কর্মের বিবরণী থেকে তাঁদেরকে চিনে নেয়া সম্ভব নয় এবং সে ধর্মগুলোর সত্যতা আর যাই হোক প্রচারযোগ্য নয়"। এসব বড় বড় জ্ঞানী-গুণী চিন্তাশীল অমুসলিম মনীষীদের ইসলাম গ্রহণ এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যই নির্ধারণ করে ইসলামের সত্যতা, বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতার পরিমাপ।

ইসলামের প্রচারণা

ড. এলিসন ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর কুরআন ও মুসলমান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "মুসলমানদের মধ্যে এখন বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত লোকের অভাব নেই। কিন্তু বেদনার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তারা কুরআন পাঠ করে তা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানপ্রিয় জনগণের কাছে ব্যক্ত করতে মোটেও উৎসাহী নয়। অথচ তাদের অনুধাবন করা উচিত ছিল যে, পাশ্চাত্যজগত আজ আত্মিক দিক দিয়ে দেউলিয়া হয়ে রয়েছে। তাদের সামনে যদি কুরআনের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা তুলে ধরা হয়, তবে তারা আগ্রহভরে কুরআনকে বুকে তুলে নিবে। আর এর দ্বারা মুসলিম-জাহানই বিপুলভাবে উপকৃত হবে। কাজেই বিজ্ঞানপ্রিয় পাশ্চাত্যের কাছে কুরআন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়গুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত"।

বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত আলেমগণ আজ বলতে শুরু করেছেন-"এক শ্রেণীর আলেম ইসলামের শিক্ষা ও বিধি-ব্যবস্থা প্রচারের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা আধুনিক শিক্ষিতদেরকে ইসলামের সাথে পরিচয় ঘটানোর পরির্বতে উল্টো তাদের মনে ইসলামের প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করছে। এ সব আলেমদের লিখনী ও বক্তব্য অমুসলিমদের মনে ইসলামের প্রতি কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করে না বরং সন্দেহের ডালপালা বৃদ্ধি পায়। মরচে ধরা হাতিয়ার দিয়ে যেমন আধুনিক অস্ত্রের মোকাবিলা করা যায় না, তেমনি কল্প-কাহিনী সর্বস্ব সেকেলে ওয়াজ-নসিহত দিয়েও যুগের গতিকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, প্রাসাদের ভীত দূর্বল ও বাঁকা হলে কারুকার্য আর রং তুলির ব্যস্ততা কোনোই কাজে আসবে না। তাই ভীত মজবুত, সোজা ও সুন্দর করতে ইসলামের সর্বাধুনিক রূপ-সৌর্ন্দযের উপর কালের যে আস্তরণ পড়েছে,

www.pathagar.com

সে আস্তরণ পরিষ্কার করতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য, লিখনী ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত রূপ-সৌন্দর্য তুলে ধরতে হবে বিশ্ববাসীর সামনে। গ্রহণযোগ্য তথ্য ও যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে 'ইসলামই জীবনের জন্য একমাত্র পথ'। এ লক্ষ্যে যথাযথ জ্ঞান অর্জনপূর্বক আলেম সমাজকে নিয়োজিত হতে হবে চিন্তাভিত্তিক জ্ঞান-গবেষণায়। প্রয়োগ করতে হবে আধুনিক বিশেষ কলা-কৌশল।"

ইসলামী চিন্তাবিদগণ আক্ষেপের সাথে বলে থাকেন, বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে ইসলামের দিকে, তখন আমাদেরই ঘর থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষিত কিছু কিছু রত্ন ইসলামের বিরোধিতা করছে। কথা বলছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সালমান রুশদী, আহম্মদ শরিফ আর তসলিমা নাসরিনদের কাতারে। যারা হতো ইসলামের সহায়ক শক্তি, আজ তারা ইসলামের শত্রু। আমাদের সামনে অসংখ্য তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাদের উপযোগী ভাষায় ইসলামকে তাদের সামনে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। ফেরাতে পারছি না, ঠেলে দিচ্ছি তাদেরকে ধ্বংসের দিকে। নস্তকালের জন্য ঠেলে দিচ্ছি ভয়াবহ আযাবের দিকে। অথচ তিরস্কার না করে বুকে জড়িয়ে তাদেরকে পথে ফেরানোর দায়িত্ব ছিল আমাদেরই।

ইসলামী গবেষকগণ মনে করেন, বিশ্বায়নের যুগে যাবতীয় ধর্মের মানুষ আজ নীতির প্রশ্নে ধর্মীয় দেউলিয়াপনায় ভীষণভাবে আক্রান্ত। ঠিক এমনি এক কঠিন সময়ে সত্যতার সাথে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুরআন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়গুলোকে বিজ্ঞান-মনস্ক জ্ঞানী বিশ্ববাসীর সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে ইসলামের সত্যতাকে প্রমাণ করতে পারলে উন্নত জ্ঞানীবিশ্বের মানুষ তা গ্রহণ করবে। আর সেখান থেকেই নতুন করে ইসলামী বিপ্লব শুরু হবে বলে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিশ্বাস করেন।

আজকে মুসলমান জাতির জন্য দুর্ভাগ্য যারা কুরআন পড়েন তারা বিজ্ঞান পড়েন না। আবার যারা বিজ্ঞান পড়েন তারা কুরআন পড়েন না। তাই তাদের মাঝে সমন্বয় হচ্ছে না। ফলে মুসলিম সমাজের বিজ্ঞানমনস্ক অনেক মানুষ অজ্ঞতাহেতু ইসলাম ধর্ম সর্ম্পকে অনিহা-অবজ্ঞা এমন কি কটুক্তিও করে থাকেন। আর উচ্চ শিক্ষিত মানুষগুলোর এধরনের উক্তি অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও ওইরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এখান থেকে তাদের অন্তরে অবিশ্বাস দানাবাঁধতে শুরু করে। এভাবে অমুসলিমদের চেয়ে এ ধরনের উচ্চ ডিগ্রীধারী মুসলমানদের দ্বারাই ইসলামের বেশী ক্ষতি হয়। আলেম সমাজ যদি গবেষণা করতেন, গবেষণালব্ধ জ্ঞান যদি জাতির কল্যাণে উপহার দিতে পারতেন তবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণ

www.pathagar.com

কুরআন সম্পর্কে কটূক্তি করতে সাহস পেতেন না। স্তব্ধ হয়ে যেত সালমান রুশদী আর তসলিমা নাসরিনদের লিখনী শক্তি।

যে কুরআনের এক নাম 'হিকমা' অর্থাৎ বিজ্ঞানগ্রন্থ, যেখানে সাড়ে সাত'শ বিজ্ঞানভিত্তিক আয়াত রয়েছে। যার পাতায়-পাতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কথা আছে, সেই গ্রন্থের প্রায় সবগুলো তাফসিরেই বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এটা মুসলমানদের জন্য বড় দুঃখের ও বড় লজ্জার বিষয়।

কথিত আছে, 'গাছের একটা ছেঁড়া পাতা নিয়ে অথবা সৃষ্টিজগতের যে কোন সৃষ্টি সম্পর্কে কিছুক্ষণ গবেষণা করা ৭০ বছর সারাদিন নফল রোজা ও সারারাত নফল নামাজ পড়ার চেয়েও বেশি সাওয়াবের, বেশি কল্যাণের কাজ'। দুনিয়ার অন্যান্য জাতিরা যখন জ্ঞান-গবেষণায় আকাশ, সমুদ্র ও পৃথিবীর সবকিছু জয়-দখল করেছে, পোড়া কপালে মুসলিম জাতি তখন পথ ভুলে আত্ম-কলহে পরস্পর ধাক্কা-ধাক্কিতে মাতাল। কুরআন হাদীসের গবেষণা আর মসজিদ ভুলে হুজরাখানায় সেবকদাসী। অথচ জ্ঞান ও গবেষণায় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে মুসলমানরাই বিশ্বগুরু হওয়ার কথা। তাই কবি নজরুল ইসলাম ছন্দাকারে লিখেন—

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে,
বিবি তালাকের ফতুয়া খুঁজি ফেকা হাদিস চষে।

আল্লাহ যখন আল কুরআনের পাতায় পাতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে উৎসাহিত করেছেন তখন একদল মুসলিম আলেম বিজ্ঞান চর্চাকে হারামের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। অথচ তাদের জানার কথা 'ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্য যে কোনো বৈষয়িক শিক্ষা হারাম' একথা বলা আত্মহত্যারই সামিল। তাই মুসলিম মনীষীগণ খেদোক্তি করে বলেন–'আমাদের আলেম সমাজ শুধু ধর্মীয় জ্ঞানই রাখেন কিন্তু অন্য কোনো জ্ঞান তাদের নেই। 'ইস্তাম্বুল কোন গরুর নাম, কত দিনে এক আলোকবর্ষ? তারা এসব কিছুই বুঝতে চায় না। বুঝতে চায় শুধু কুরআনের কোন্ আয়াত দ্বারা কোন্ সমস্যার সমাধান হয় বা কোনো সমস্যার তাবিজ লিখা যায়'।

আল কুরআনের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার সস্তা সমালোচকগণ অল্প বুঝের কারণে সুন্নতী লেবাসের অন্তরালে থেকেও বলে থাকেন, আল্লাহর জিকির-আজকার, তসবিহ-তাহলীল বাদ দিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকৌশল জানার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? অথচ তাদের অজানা নয় যে, আল্লাহ কুরআনের পাতায় পাতায় তাঁর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জোর তাগিদ দিয়েছেন। যেমন-".... যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং (বিশ্রামগাহে) শুয়ে আল্লাহর

www.pathagar.com

জিকির করে এবং চিন্তা ও গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) হে পরোয়ারদিগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)।

রাসূল সা.ও হাদীসের মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার জন্য বহু তাগিদ দিয়েছেন। যেমন-"রাত্রির এক মুহূর্ত জ্ঞান চর্চা করা পূর্ণ রাত্রি জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম" (মেশকাত ৩৬)। আর আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যা করতে বলেছেন তা করাই ঈমানদারদের জন্য উত্তম ইবাদত। আল্লাহর সৃষ্টিকৌশল জানার মধ্যে মানুষের জন্য নিদর্শন ও কল্যাণ আছে বলে আল্লাহ জানিয়েছেন। "তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন" (সূরা লোকমান ঃ ২০)। এখানে আল্লাহ আসমান-জমিনের কোথায় কিভাবে মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত রেখেছেন তা গবেষণা করে দেখার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন এভাবে 'তোমরা কি দেখ না--?' বাস্তবে আমরাও দেখছি মানুষ প্রকৃতির গবেষণার মাধ্যমে শত শত কল্যাণমুখী আবিষ্কারের দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধন করে আল্লাহর বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে চলেছে। আল্লাহর বাণীর সত্যতা প্রমাণের দায়িত্ব অমুসলিমদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানরা আজ আল্লাহর ওলী বনার দাবিদার!

যারা বিজ্ঞানের শিক্ষাকে নাজায়েয মনে করে তারা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু নয়। অথচ তারা তাদের অজান্তেই ইসলামের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে যেন ইসলামকেই পর্যুদস্ত করছে বিজ্ঞানকে দূরে ঠেলে দিয়ে। 'খাঁটি ঈমানদার হয়েও যেন তারা ইসলামের শত্রু, ইসলাম ধ্বংসকারী'। এ উক্তির ব্যাপারে আলেমদের সুচিন্তিত সহনশীলতা কামনা করছি। "আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬)।

শুধু শুনে বিশ্বাস করার চেয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর কুদরতের গুরুরহস্য দেখে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় সেটাই অধিক শক্তিশালী। শুধু শুনা বিশ্বাস নাস্তিকদের কূট-যুক্তিতর্কের কাছে হার মানতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্টির গুরুরহস্য দেখে স্রষ্টা সম্পর্কে যে দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মায় তা কখনও নাস্তিকদের কূট-তর্কের কাছে হার মানতে পারে না। এখানে আবারও রাসূল সা.-এর হাদীসটির উল্লেখ করা যায়, "রাত্রির এক মুহূর্ত জ্ঞান চর্চা করা পূর্ণ রাত্রি জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম" (মেশকাত ৩৬)।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের ওই সব আবিষ্কার কোনো ঈমানদার বিজ্ঞানীর দ্বারা সম্পন্ন হলে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন দেখে কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়তো। কুরআনে সৃষ্টির রহস্য নিয়ে গবেষণা করার জন্য এত তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করে মুসলমানেরা আজ বিজ্ঞান চর্চায় গাফেল। মাদ্রাসায় বিজ্ঞান চর্চা নেই, মসজিদে কুরআনে বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা নেই, নাস্তিক আর ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের হাতে আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নিশ্চিন্তে বসে থেকে নাস্তিকদেরকে বিজ্ঞানের নামে জনমণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন, আর নিজেদেরকে আল্লাহর খলিফা বলে দাবি করছেন। খলিফার দায়িত্ব পালন না করার কারণে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের দ্বারা দুনিয়াতেই শাস্তি দিচ্ছেন। আবার আখেরাতে তারা আল্লাহর কাছে কী জবাব দিবেন?

তাই প্রখ্যাত দার্শনিক ও বিশ্ব কবি আল্লামা ইকবাল (র.) বলেন–

দ্বীনকা সুরুজ ডুবরাহী হ্যায় তোম লোগোকি ছামনে,
রোজ মাহ্শর কিয়া জবাব হ্যায় মোস্তফাকি ছামনে।

বিজ্ঞানের বিষয় হল বিশ্বপ্রকৃতি এবং তার বিভিন্ন উপাদান ও বস্তুনিচয়। দুনিয়াতে মানুষের অস্তিত্বের জন্যই এ বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টি, আর এ বিশ্বপ্রকৃতিই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের নিদর্শন। বিশ্বপ্রকৃতি এবং তার বিভিন্ন উপাদান ও বস্তুনিচয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের প্রায় সাড়ে সাতশো আয়াত যা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এ সমস্ত আয়াতে আল্লাহ বিশ্বপ্রকৃতি, বিশেষ করে মহাকাশ গবেষণা, দিন রাত্রির পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি পরিচালনার জন্য যে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটাকে বলা হয় প্রকৃতির নিয়ম। আর এ প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমেই আল্লাহ বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। বিশ্বপ্রকৃতি আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন হওয়ায় বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারও আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কুরআনের সাথে মিলে যাওয়ায় কুরআন যে ঐশীবাণী তা বিজ্ঞানীদের নিকট আজ পরিষ্কার হতে চলেছে।

বিজ্ঞানের প্রাথমিক যুগের অসত্য থিওরীসমূহের দ্বারা বিজ্ঞানের নামে একজাতীয় ধূম্রজালের সৃষ্টি করা হয়েছিল যা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে আধুনিক বিজ্ঞান যেসব 'প্রাকৃতিক আইন' বা 'প্রতিষ্ঠিত সত্য' আবিষ্কার করেছে সেগুলো আর তেমন প্রভাব ফেলতে পারছে না। ইহুদী-খৃস্টানদের মধ্যে যারা আধুনিক বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে এক স্রষ্টায় বিশ্বাসে ফিরেছেন, তারা বিজ্ঞানের সাথে বাইবেলের গরমিল দেখে কঠিন সমস্যায় পড়েছেন। স্রষ্টার বাণী অসত্য হতে পারে, এটা বিশ্বাস করা

www.pathagar.com

জ্ঞানী লোকের পক্ষে অসম্ভব। তাই বিজ্ঞানের মতে এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়েও তারা বাইবেলের মৌলবাদে বিশ্বাসী হতে পারছেন না।

ইসলাম মনে করে, পশ্চাত্যের মানুষ পুরুষাণুক্রমে ভ্রান্তিপূর্ণ প্রচারণার ফলে ইহুদীদের মতো খৃষ্টানরাও বিশ্বাস করে 'যিশুখৃষ্টের পর আর কোনো প্রত্যাদেশবাণী নাযিল হয়নি। বাইবেল দেখেই কুরআন রচনা করা হয়েছে'। বাইবেলের মৌলবাদেই তারা বিশ্বাস করে না, আবার কুরআনের মৌলবাদে কি বিশ্বাস করবে? না জেনে, বিচার না করেই রায় দিয়ে দেয়া যেমন অসমীচীন ও সত্যকে অস্বীকার বুঝায়, তেমনি কুরআন-হাদীস না জেনে যত পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবেই এর বিরোধিতা করা হোক না কেন তা হবে ভিত্তিহীন, অসার আত্মপ্রসাদ যা সত্য থেকে বহুদূরে অবস্থিত অজ্ঞতার আবেদন। ইসলাম সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞানও আছে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন ইসলাম মানবতার ধর্ম, বিজ্ঞানের ধর্ম এবং আল্লাহতে আত্মসমর্পণের ধর্ম।

বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠিত সত্যকে নাগালের মধ্যে পেয়েও সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকই লোকলজ্জায় ধর্মনিরপেক্ষ কায়দায় বা নাস্তিক্যবাদী ভাবধারায় তা অস্বীকার করতে চাচ্ছেন। লোকে যদি বলে তাদের আবিষ্কার আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে তবে যদি নাম কাটা যায় ধর্মনিরপেক্ষতার দফতর থেকে, বুদ্ধিজীবীদের সমাজে একঘরে হয়ে যায়, লোকেরা যদি তাদের ধর্মান্ধ বলে, তাদের গবেষণার ফল যদি জনপ্রিয়তা হারায়, সে জন্য তারা স্রষ্টা সর্ম্পকে কোনোরকম দায় সারা বিভিন্ন রকম কথা বলে থাকেন। যেমন-একজন মহাপরিচালক বা মহাক্ষমতাধর কোন কিছুর অস্তিত্ব সবকিছু সৃষ্টির মূলে থাকতে পারে বা অন্য কোনো গ্রহের বুদ্ধিমান জীব দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

নাস্তিক বিজ্ঞানীরা ইসলামকে তিরস্কার করলেও বিজ্ঞান কখনও ইসলামকে তিরস্কার করার কোনো কারণ উদ্ভাবন করতে পারেনি। বরং প্রতিটা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বার বার ইসলামের ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনের কাছে নতজানু ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে প্রকৃতিজগতে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শনগুলোর বাস্তবতা দেখে কোনো নাস্তিক বিজ্ঞানী যদি আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়, আর অদৃশ্যে অবিশ্বাসী থেকে যায় অর্থাৎ প্রকৃতির উর্ধ্বে পরকাল, পুনরুত্থান, বেহেস্ত, দোজখ, ফেরেস্তা, আসমানী কিতাব প্রভৃতিতে বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সে নিঃসন্দেহে নাস্তিক বলেই গণ্য হবে। দোদুল্য মনের লোকেরা মনে করেন আধুনিক বিজ্ঞান-সূত্রের বিষয় কুরআনে উল্লেখ থাকলে কুরআন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। ফলতঃ তারাও দোদুল্যমানতা কাটিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে পারেন।

www.pathagar.com

আল কুরআন প্রচলিত কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয় তবে তার অনেকগুলো নামের মধ্যে একটি হচ্ছে 'হিক্‌মা' অর্থাৎ বিজ্ঞান। কুরআনে বিজ্ঞানের কোন খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনা না থাকলেও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রায় সাড়ে সাত শত আয়াতের মধ্যে অধিকাংশ আয়াতে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব রয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান হচ্ছে কুরআনিক বিজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক আয়াতগুলোরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। সুতরাং বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের কোনো সংঘর্ষ নেই বরং কুরআন বিজ্ঞানচর্চাকে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। আপনিও কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন, আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান কোনো ক্ষেত্রে কুরআনিক বিজ্ঞানকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বারবার শুধু কুরআনের সত্যকেই আবিষ্কার করতে পেরেছে। ফলে ইসলাম আজ আর শুধুমাত্র মিছেমিছি ভীতি প্রদর্শনের বা আবেগ সৃষ্টিকারী অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম নয়। অর্থাৎ ইসলাম শুধু আবেগনির্ভর বিশ্বাসসর্বস্ব কোনো ধর্ম নয় বরং এতে রয়েছে বৈজ্ঞানিকতা, যুগোপযোগিতা, কার্যকারিতা, ঐতিহাসিকতা, সার্বজনীনতা, সার্থকতা, পূর্ণাঙ্গতা ও বাস্তবতা। আর কোনোভাবেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। কাজেই অন্ধ বিশ্বাসের ধারণা কাটিয়ে ইসলাম আজ যৌক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যে রূপ নিয়েছে। তাই আজ ইসলাম সত্যতার ভিত্তিতে সকল ধর্ম ও নাস্তিক্যবাদের উপর প্রকাশ্য কঠিন চ্যালেঞ্জ।

যদিও যৌক্তিকভাবেই প্রমাণ হয় 'ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম' তবুও অনেক মানুষই ইসলাম মানে না। আবার অনেক মুসলমান মতাদর্শ ও সার্থগত কারণে ইসলামের কিছু কিছু বিধান অস্বীকারও করে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সার্থের মুকাবিলায় দোদুল্যমান বা হালকা বিশ্বাসের মানুষগুলোর ক্ষেত্রেই এমনটি হয়ে থাকে। বিশ্বাসের গভীরতা বাড়ার পূর্বেই ইবাদতের বোঝা চাপিয়ে দিলে তা খুব ভারি মনে হয়। বিশ্বাসের গভীরতা যত বাড়তে থাকে ইবাদত তত সহজ হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই মানুষ বিশ্বাসের গভীরতা বাড়াতে পারে না। বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ দিয়েই কেবল তা বাড়ানো সম্ভব। বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বা স্রষ্টা সন্দেহাতীত হলে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, প্রাণ পায় ইবাদত। তবে হালকা বিশ্বাসের কিছু কিছু মানুষ বিজ্ঞানও ভালোভাবে বিশ্বাস করতে চায় না।

বিজ্ঞানীরা যদি সত্যসন্ধানী ও সত্যবাদী হয় তবে তাদের জন্য কুরআনকে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান যেমন এক মহাশক্তিধর সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিধাতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তেমনি বিজ্ঞান সেই আল্লাহরই নিদর্শনের সাক্ষাৎ লাভ করছে।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষিত জনগণ 'ঐশীবাণী' নয়, এ অজুহাতে বাইবেল প্রত্যাখান করে সত্যের খাতিরে বিজ্ঞানের প্রাথমিক যুগে বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান আবার প্রাথমিক যুগের বিজ্ঞানের থিওরীসমূহকে ভুল প্রমাণিত করে এ পর্যন্ত যে সব 'সত্য বা প্রাকৃতিক আইন' আবিষ্কার করেছে তার সবগুলো এক আল্লাহর নিদর্শন, এবং একটিও কুরআন বিরোধী নয়।

"লক্ষ্যণীয় বিস্ময়কর সত্য যে কুরআনবিদ্বেষী জ্ঞানসাধক বিজ্ঞানীদের দ্বারাই আল্লাহ কুরআনের সত্যতা তুলে ধরেছেন। অথচ "তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের বোধশক্তি নেই" (সূরা আল আনফাল ঃ ৬৫)।

বস্তুবাদ ও বিবর্তনবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করে আজ সেই বিজ্ঞান এক আল্লাহর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। এক আল্লাহর অস্তিত্ব আজ বিজ্ঞানীদের নিকট বাস্তব সত্য ও প্রকট। বিজ্ঞানই আজ বিজ্ঞানীদেরকে কুরআনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু "যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না" (সূরা আন নাহল ঃ ১০৪)। "বিশ্বাসীদের জন্য জমিনের সবকিছুই আল্লাহ নিদর্শন" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ২০)। "অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য" (সূরা আল হিজর ঃ ৭৫)।

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন' ধর্ম ও অধর্ম দুটি অবস্থান গ্রহণ করেছে। ধর্মীয় বক্তব্য বলতে তারা বাইবেলের বর্ণনা ও শিক্ষাকেই বুঝায়, আর কুরআন সম্পর্কে তাদের ধারণা 'বাইবেল নকল করে এটা রচনা করা হয়েছে।' সুতরাং বাইবেলই একমাত্র সত্য ঐশীগ্রন্থ, কিন্তু বাইবেলকে বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক দেখে বিজ্ঞানীরা সংশয়বাদী ও নাস্তিকে পরিণত হচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভিত্তিহীন ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা গড়ে উঠেছে। ইসলামের আসল সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। ইদানিং ইসলামী মৌলবাদ একটি সন্ত্রাসী ধর্ম-বিশ্বাস বলে তারা প্রচার চালাচ্ছে যা আদৌ সঠিক নয়।

ইতোমধ্যে আমরা বহু বিখ্যাত অমুসলিম মনিষীদের উক্তি থেকে জানতে পেরেছি যে, তরবারী বা বাহুবলে ইসলাম প্রসার লাভ করেনি। প্রফেসর রামদেব তাঁর বৈদিক ম্যাগাজিনে যথার্থই বলেছেন—"এটা বলা ভুল যে, 'ইসলাম তরবারীর দ্বারা প্রসার লাভ করেছে'। বরং এটাই প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলাম প্রচারে কখনো তরবারী ব্যবহৃত হয়নি।"

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড গীবন জোর দিয়ে বলেন–"মুসলমানদের প্রতি একটি মিথ্যা অপবাদ চাপানো হচ্ছে যে, 'প্রত্যেক ধর্মকে তলোয়ারের জোরে শেষ করে দেয়া হোক' এটি একটি ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদ। মুসলমানদের ইতিহাস ও আল-কুরআনের গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সকল ধর্মাবলম্বীর সাথে উদারতার শিক্ষা দেয়। মুহাম্মদ সা. শুধু চারিত্রিক শক্তিবলেই সকল জাতি ও গোত্রের উপর বিজয় লাভ করেছেন, তলোয়ারের জোরে নয়।"

প্রফেসর ভাইওয়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন–"উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে যে সমস্ত বইয়ে মুহাম্মদ সা. ও তাঁর ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে লেখা ছাপা হয়েছে, আজকের শিক্ষিত সমাজে সেগুলোর কোনো মূল্য নেই। যেমন, ইসলাম তলোয়ারের জোরে এসেছে। এ দাবিটি এখন ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।"

ড. মার্কোস উড মহানবী মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বলেন–"ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন নির্যাতন ভোগ করেছেন, নির্বাসিত হয়েছেন, সহায় সম্পদ হারা হয়েছেন, আত্মীয় স্বজনদের রোষানলে পড়েছেন, কিন্তু কোনো প্রাচুর্যের মোহ, কোনো হুমকি কিংবা কোনো প্রলোভনই তাঁর ন্যায়ের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।"

প্রফেসর স্নাউক হারগ্রোনজে ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন–"মানবীয় জাতি-সংঘের আদর্শ অন্য কোনো ধর্মের চাইতে ইসলামের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ মুহাম্মদ সা.-এর ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ এত গুরুত্ব সহকারে সকল মানবজাতির সাম্যের নীতিকে গ্রহণ করেছে যে, তাতে লজ্জায় পতিত হয়েছে অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহ।"

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ

ইতোপূর্বেই আমরা জেনেছি ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ। আর যেখানেই আত্মসমর্পণ সেখানেই শান্তি, সে কারণে ইসলামের আর এক অর্থ দাঁড়ায়- শান্তি বা নিরাপত্তা। মুসলিম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী, শান্তিবিধানকারী বা নিরাপত্তাদানকারী। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর সকল হুকুম বা নীতির কাছে আত্মসমর্পণকারীকে মুসলমান বলা হয়।

আরবী 'ঈমান' শব্দের অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের পরিভাষায় তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান বা বিশ্বাস।

www.pathagar.com

আরবী 'আব্দ' শব্দের অর্থ দাস, এবং ইবাদত শব্দের অর্থ দাসত্ব। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর হুকুম পালন বা দাসত্ব করার নাম ইবাদত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদত করে তাকে আবেদ বলা হয়।

আল্লাহর হুকুম পালন বা দাসত্ব না করার নাম ফাসেকী বা নাফরমানী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনার পর আল্লাহর নীতি অনুযায়ী চলে না বা দাসত্ব করে না তাকে ফাসেক বা নাফরমান বলে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না বা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে অথবা ঈমান আনার পর ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহর যে কোনো একটা বিধানকে অস্বীকার করে বা তার বিরোধিতা করে এবং মানুষের তৈরি বিধান সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় তাকে কাফির বলে। তবে আল্লাহ ও মানুষের বিধান কম-বেশি মানার কারণে কুফরীর পরিমাণও কম-বেশি হয়।

এখন উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো নিজেদের জ্ঞানসীমার কাছাকাছি করে নিলে দেখা যায়, কালিমা পড়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেই তাকে ঈমানদার বলা যায়, কিন্তু একজন মুসলমান হতে হলে আল্লাহর সকল নীতি বা বিধানের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর হুকুম পালন বা দাসত্ব করতে হবে। আল্লাহর দাসত্ব ব্যতীত মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। এখান থেকে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি, সব মুসলমানই ঈমানদার কিন্তু সব ঈমানদার মুসলমান নয়। কাজেই ঈমানদার হওয়া যতটা সহজ মুসলমান হওয়া ততটা সহজ নয় বরং তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

ঈমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে ইবাদতের পূর্বশর্ত। যদি কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর কোনো ইবাদতই না করে তবুও তার সামান্যতম হলেও একটু ঈমান থাকবে। যদিও এটা ঈমানের সর্বনিকৃষ্টতম স্তর, যাকে বলে ফাসেক ঈমানদার। কিন্তু যদি কোন ঈমানদার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আল্লাহর ইবাদত করে এবং আল্লাহর একটিমাত্র হুকুমকে অস্বীকার করে অথবা তার বিরোধিতা করে মানুষের তৈরি আল্লাহ-বিরোধী কোনো নীতি সুস্পষ্ট চিত্তে মেনে নেয় তবে দুনিয়ার কোন মানুষ বলুক আর না বলুক কোরআন তাকে কাফির সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত আদায়রত অবস্থায় যদি 'চুরির শাস্তি হাত কাটা বা জেনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা'কে অস্বীকার বা অমানবিক মনে করে প্রত্যাখ্যান করে তবে সে কুরআনের ভাষায় কাফির হয়ে যায়। এমনকি ব্যবসাভিত্তিক লাভ এবং সুদকে এক মনে করলেও তার ঈমান ইবাদত আর কিছুই থাকে না, যতক্ষণ না সে আন্তরিকভাবে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসে। অন্যভাবে বলা যায়,

www.pathagar.com

ককাফির হওয়ার জন্য আল্লাহর যেকোনো একটি বিধান অস্বীকার করাই যথেষ্ট। আর ঈমানদার হতে হলে সবগুলো বিধান মেনে চলতে হয়। কোন মুসলমান যদি কুরআনের কিছু কিছু আয়াত অস্বীকার করতে চায় তাহলে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত সবই তার জন্য অহেতুক। "যারা ঈমান আনার পর কুফরী করে এবং যাদের কুফরী বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তওবা কবুল হবে না, ওরাই মূলত পথভ্রষ্ট" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯০)।

ইসলামের ইবাদাত

বিভিন্ন উদাহরণে যুক্তি-প্রমাণের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে স্রষ্টা যখন বাস্তব। আর স্রষ্টার ইচ্ছায় যখন সৃষ্টি। তখন সৃষ্টিকে ভক্তিভরে স্রষ্টার ইবাদাত করতে হয়। জীবন আর মৃত্যু নিয়ে নিরুপায় মানুষগুলোকে যেহেতু মরতেই হয়, সেহেতু স্রষ্টার উপশনা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। মানুষ স্রষ্টার বাণী, ধর্মপ্রবর্তকের কথা ও কাজকে ইবাদাত হিসেবে মেনে নেয়। এখানে ইসলাম প্রাধান্য পাওয়ার বাস্তবতায় সঠিকভাবে স্রষ্টার ইবাদত করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে ইসলামের প্রকৃত আবেদন।

ইসলামে ইবাদাত সাধারণত দুই প্রকার– বিশেষ ইবাদাত ও বৈষয়িক ইবাদত।

বিশেষ ইবাদাত হচ্ছে-কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ যাকাত ইত্যাদি। আবেগ সৃষ্টিকারী এ ইবাদাতগুলো মানুষের ঈমান আনে, ঈমান রক্ষা ও সুদৃঢ় করে, বৈষয়িক ইবাদত করার মানসিকতা সৃষ্টি করে এবং মাগফিরাত কামনায় আবেদন সৃষ্টি করে বা ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ইবাদতগুলোকে বলা হয় হাক্কুল্লাহ্।

বৈষয়িক বা বিষয়ভিত্তিক ইবাদাত হচ্ছে–মিথ্যা বলো না, চুরি করো না, যেনা করো না, সুদ খাইও না, ওজনে কম দিও না, চুরি করলে হাত কেটে দাও ইত্যাদি। এই ইবাদাতগুলো মানব জীবনের বিভিন্ন কর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের মূল আবেদন বা লক্ষ্যই হচ্ছে 'মানব কল্যাণ'। অর্থাৎ 'মানব কল্যাণ'ই আল্লাহর সন্তুষ্টি, যা ইসলামী ইবাদাতের ফলশ্রুতি। গোটা মানব জাতির সামগ্রিক উন্নতি ও শান্তিই ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আর বিষয়ভিত্তিক সবগুলো ইবাদতই হচ্ছে 'মানব কল্যাণ' কেন্দ্রিক, যা মানবজাতির সার্বিক উন্নতি ও শান্তি নিশ্চিত করে। কাজেই এ ইবাদাতগুলোকে বলা হয় হাক্কুল ইবাদ।

www.pathagar.com

কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত এ পাঁচটি বিশেষ ইবাদতকে ইসলামের খুঁটি বা স্তম্ভ বলা হয়। তাহলে এ স্তম্ভগুলোর উপরে যেটা অবস্থান করে সেটা কি ? এ খুঁটিগুলো সযত্নে যাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে রেখেছে সেটা হচ্ছে–'বিষয়ভিত্তিক ইবাদত বা হাক্কুল ইবাদ' যা বিশ্ব মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে। এটাই হচ্ছে–ইসলাম বা আত্মসমর্পণ। এটাই হচ্ছে—বিশ্ব-মানবতা, কল্যাণ ও শান্তি যা মানবতাবাদীরা অবিরত খুঁজে ফিরছে।

অধিকাংশ মুসলমান শুধু কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতকে ইবাদত মনে করলেও বিষয়ভিত্তিক ইবাদত যেমন—'সুদ-ঘুষ লেনদেন না করা'কে ইবাদত মনে করেন না। এ বৈষয়িক ইবাদতগুলো যখন রাজনীতির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে আসতে চায় তখন তারা এগুলোকে চরম ঘৃণ্য গুনাহের কাজ মনে করেন। আবার কিছু মুসলমান আল্লাহর মতাদর্শের পাশাপাশি আপন পছন্দের দল, গোষ্ঠী বা সংস্থার মতাদর্শকে মিলিয়ে নিতে চায়। ফলে তাদের কাছে আল্লাহর মতবাদের বিশুদ্ধতা আর বজায় থাকছে না। প্রতি বছর হজ্ব করেও আবু জেহেল, আবু লাহাবরা যেমন কাফিরই রয়ে গেল। তেমনি নামাজ, রোজা করেও অনেক মানুষ অমুসলিমই রয়ে যায়। "তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২।

সাধারণভাবে ধর্মকে একটা বিশেষ কর্ম বা বিষয় মনে করা হয়, দুনিয়ার কোনো কর্মের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ দ্বীনদারী এবং দুনিয়াদারী আলাদা। যেমন-হাট-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, ক্ষেত-খামার, কোর্ট-কাচারি, অফিস-আদালত প্রভৃতি হচ্ছে দুনিয়াদারী। আর কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত, যিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলীল, মিলাদ-মাহফিল প্রভৃতি হচ্ছে দ্বীনদারী। কিন্তু ইসলাম বলে, নিছক কোনো আনুষ্ঠানিকতার নাম ইবাদত নয়, যেমন–চেহলাম, জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, মিলাদ-মাহফিল ইত্যাদি। এমন কি কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের নামও ইবাদাত নয় বরং এগুলো হচ্ছে আল্লাহর হুকুম এবং আল্লাহর প্রতিটা হুকুম বা বিধান 'পালন' করার নামই ইবাদাত। অর্থাৎ দুনিয়াদারী এবং দ্বীনদারী আলাদা কিছু নয়। যেমন, চাকরি না করলে ঘুষ বর্জনের ইবাদত করা যায় না এবং আর্থিক লেন-দেন ছাড়া সুদ বর্জনের ইবাদাত করার সুযোগই আসে না। এক কথায় মানব জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ আছে। আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা করার নাম ইবাদত এবং না করার নাম নাফরমানী। পক্ষান্তরে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা করার নাম নাফরমানী এবং না করার নাম ইবাদত। যেমন-চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন 'তোমরা ঘুষ খাইও না, তোমরা ওজনে কম

www.pathagar.com

দিও না'। এক্ষেত্রে ঘুষ না খাওয়া এবং ওজনে কম না দেয়া ইবাদত এবং ঘুষ খাওয়া ও ওজনে কম দেয়া নাফরমানী। কাজেই আমরা চাকরি বা ব্যবসাকে দুনিয়াদারী বলতে পারি না। বরং ঘুষ খাওয়া ও ওজনে কম দেয়াকে দুনিয়াদারী এবং ঘুষ না খাওয়া বা ওজনে কম না দেয়াকে আমরা দ্বীনদারী বলতে পারি। মোটকথা মানবজীবনের প্রতিটা কাজের মধ্যে ইবাদত এবং নাফরমানী দুটোই থাকে। তবে মানুষ এর মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে পারে। সুতরাং এখানে বুঝতে হবে, মুসলমানরা জীবনের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে হয় ইবাদত নয়তো নাফরমানী ভিন্ন অন্য কিছুই করতে পারে না। "আর আমি জ্বীন ও মানব সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬)।

যেহেতু রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে জড়িত। অর্থাৎ মানব জীবনের বিভিন্ন কর্ম রাষ্ট্রীয় বিধান বা রাজনীতির সাথে জড়িত, সে কারণে ইসলাম রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ব্যাপক সম্ভাবনা রাখে। ধর্ম এবং রাজনীতি দুটোই মানুষের জীবন চলার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নীতির সমষ্টি আর ধর্ম হচ্ছে ধর্মীয় নীতির সমষ্টি। আমরা জানি মানুষের তৈরি নীতি এবং স্রষ্টার নীতি একসাথে মানা যায় না। এখানে ধর্ম আর রাজনীতিকে পৃথক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান ও রাষ্ট্রীয় বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্র যেহেতু একটাই, সেহেতু ঐ দুটো বিধান আলাদা হলে তা একই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। যেমন 'চুরির শাস্তি' এই একটা বিষয়ে রাষ্ট্রের বিধান তিন মাস জেল, আর ধর্মীয় বিধান হাত কাটা। এ অবস্থায় জেল দিলে চুরির ধর্মীয় দায় মিটবে না, আবার হাত কাটলেও রাষ্ট্র ছাড়বে না। কাজেই রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় এই দুটো বিধানকে আলাদা করে কোনভাবেই এক সাথে মানা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে মানুষ এর যে কোনো একটি মানতে পারে।

ধার্মিকরা জানেন ধর্ম স্রষ্টার তৈরি নীতি আর রাজনীতি মানুষের তৈরি নীতি। স্রষ্টা যদি মানুষের স্রষ্টা হন তবে মানুষ স্রষ্টার নীতি মানতে বাধ্য। আর স্রষ্টা যদি মানুষের স্রষ্টা না হন সে ক্ষেত্রে অবশ্য মানুষ নিজেই তার চলার নীতি তৈরী করে নিতে পারেন। কিন্তু ধার্মিকরা ভালো করেই জানেন স্রষ্টাই মানুষের স্রষ্টা, আর বিজ্ঞানও সে রকম ইঙ্গিতই দেয়। কাজেই রাজ নৈতিক অঙ্গনকে বাদ রেখে শুধু মসজিদমুখী ইবাদতকে ইসলাম কোনভাবেই পূর্ণ অনুমোদন করে না এবং এটা কোনভাবেই পূর্ণ মুসলমান হওয়ার শর্তও পূরণ করে না। ইসলাম কিছুতেই শুধু একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, আবার রাজনৈতিক মতাদর্শকে বাদ রেখে ইসলাম মোটেও পরিপূর্ণ নয়। তাই

www.pathagar.com

বুঝি মাঝে মাঝে আলেমদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে 'যারা রাজনৈতিক অঙ্গনকে বাদ রেখে দ্বীন ইসলাম কায়েম করার কথা বলে তারা ধর্মের সাথে সাঙ্ঘাতিক উপহাস, জঘন্যতম মিথ্যাচারিতা এবং বিরাট প্রতারণা করছে'। মূলত বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যেমন বিধান আছে, ঠিক তেমনি ইসলাম ধর্মেরও বিধান আছে। শুধু অপরাধের শাস্তির মাত্রা কিছুটা কম-বেশি।

আবার রাজনীতিই যখন মানবকল্যাণ বা মানবসেবার মত মূল ইবাদতের প্রধান ক্ষেত্র, তখন রাজনীতি ছাড়া ইসলাম মোটেও পরিপূর্ণতা পায় না। এর কারণিক উদাহরণ হচ্ছে–আল্লাহ কুরআনে চুরি করতে নিষেধ করেছেন, আবার চুরি করলে হাত কাটার বিধানও দিয়েছেন। চুরি বিষয়ে আল্লাহর এই দুটি বিধানের মধ্যে প্রথম হুকুমটি মানা সম্ভব হলেও দ্বিতীয় হুকুমটি কোনো ঈমানদারের পক্ষেই মানা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় হুকুমটি মানার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা। কাজেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আল্লাহর বিধান না থাকলে কোনভাবেই ইসলাম পরিপূর্ণতা পায় না। আর সে কারণেই কোনো কোনো আলেম রাজনীতিকে ঈমানের অঙ্গ বা পবিত্র ইবাদত হিসেবে গণ্য করেন। তাঁরা রাজনীতিকে পরোক্ষভাবে ফরজ ইবাদত এবং প্রত্যক্ষভাবে সুন্নত ইবাদত মনে করেন। প্রকৃত বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহলে ধার্মিকদের জন্য রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর উপায় কোথায়?

অবশ্য কেউই পরিপূর্ণ ইবাদত করতে পারে না, বা সব ইবাদত সবার জন্য নয়। যেমন-গরীব মানুষ 'হজ্জ বা যাকাত' আদায় করতে পারে না, কৃষক 'ঘুষ বর্জন' করতে পারে না, জ্ঞানহীন মানুষ 'রাজনীতি' করতে পারে না। তাই বলে কেউ ওগুলোকে অস্বীকারও করতে পারে না। অর্থাৎ কেউ কোন ইবাদত করতে না পারলেও সেগুলোকে অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার করলে সে অস্বীকারকারী (কাফির) হয়ে যায়।

অধিকাংশ আলেম মনে করেন, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে 'তাবলীগ এবং ইসলামী আন্দোলন' কোনটাকেই অস্বীকার করা চলে না। তাবলীগ ছাড়া ইসলাম বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছাড়া তাবলীগ করার কোন যৌক্তিকতাও নেই। কারণ তাবলীগ দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠারই একটি অংশ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুরআনে সালাত প্রতিষ্ঠা বা কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। সালাত কায়িম করার জন্য নিজে সালাত আদায় করা, অন্যকে আদায় করতে বলা, শিক্ষা দেয়া, মসজিদ নির্মাণ, ইমাম-মুয়াজ্জিন, অযু-গোসল বা প্রসাব-পায়খানার ব্যবস্থাদিসহ আনুসঙ্গিক যাবতীয় ব্যায়-ব্যবস্থা করা হয়। আর সালাত আদায়সহ এ সবগুলো কাজই সালাত কায়েম বা প্রতিষ্ঠার এক একটি অংশ। এর কোনটিকেই অস্বীকার করা

www.pathagar.com

যায় না। অনুরূপ, ইসলাম কায়িম করতে হলে- নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, তাবলীগ, শিক্ষানীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, খাদ্যনীতি, যুদ্ধনীতি, চিকিৎসা, বিজ্ঞানসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে ইসলামী নীতি অনুস্মরণ করতে হয়। এর কোন একটিকে পালন করতে না পারলেও অস্বীকার করা যাবে না। কারণ এই সবগুলো নীতিই 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা'র এক একটি অংশ।

বেশির ভাগ মানুষই মনে করেন মুসলমানদের ইবাদতের জায়গা শুধু 'মসজিদ'। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অবশ্য তা নয়। সহজ উদাহরণে বলা যায়– "তোমরা ওজনে কম দিও না" আল্লাহর বিষয়ভিত্তিক এ বিধান পালনের জন্য মসজিদ নয় বরং হাট-বাজারই উত্তম স্থান। "তোমরা ঘুষ খাইও না" এ বিধান পালনের জন্যও মসজিদে নয়, অফিস-আদালতেই তা পালন করা যায়। "চুরি করলে হাত কেটে দাও, হত্যার বদলে হত্যা করো" এ ধরণের ইবাদতগুলোর জন্যও মসজিদ নয় বরং রাষ্ট্রীয় বিচার প্রতিষ্ঠান 'কোর্ট-কাচারীই' তার নির্ধারিত স্থান। আবার কর্মক্ষেত্রের এসমস্ত ইবাদতে ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা পেতে মানুষ সময়ে সময়ে মসজিদেও যায় প্রার্থনামূলক ইবাদত 'নামাজ' আদায় করতে। যেমন সেনা-বাহিনীতে লোক নিয়োগ দেয়া হয় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে। কিন্তু তাদেরকে পি,টি, প্যারেড করানো হয় দায়িত্ব পালনের মানষিকতা সৃষ্টির জন্য এবং এটাও এক প্রকার দায়িত্ব। এখন যদি কেউ বলে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমার দায়িত্ব, কাজেই আমি পি,টি, প্যারেড করতে যাব কেন? তা হলে তার চাকরি থাকবে না। আবার জীবনের ভয়ে কেউ যদি বলে আমি সারা জীবন শুধু পি,টি, প্যারেড করব কিন্তু সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করব না, তাহলেও তার চাকরি থাকবে না। কাজেই একজন মানুষকে বিশেষ এবং বিষয়ভিত্তিক উভয় প্রকার ইবাদতই করতে হবে, অন্যথায় তার দায়িত্ব বা ইবাদত পূর্ণ হবে না।

এবার যদি আমরা ফিরে তাকাই ইতিহাসের দিকে তাহলে দেখতে পাই, পূর্বে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজনীতি বলতে ধর্মীয় নীতিই চালু ছিল। মধ্যযুগে খ্রিস্ট ধর্মযাজকদের চরম নির্যাতন, দুর্নীতি আর প্রতারণায় যে দূর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে মুক্তি পেতেই গীর্জা থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করা হয়। এখান থেকেই রাজনীতি ধর্মের গর্ভে জন্ম নিয়ে পথ চলা শুরু করে, আর ধর্ম বরণ করে পঙ্গুত্ব। ফলে তখন জাতিকে দেবার মত ধর্মে আর তেমন কিছু থাকে না। এভাবে খ্রিস্টধর্মের হস্তক্ষেপ থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত রাখার জন্যই রাষ্ট্রীয় সংহতি ও জাতীয় ঐক্যের কথা বলে এবং গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা

www.pathagar.com

চালু করা হয়। অবশ্য মুসলিম বিশ্বে কোনো সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি। ইসলাম দাবী করে অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম সঙ্কীর্ণ অর্থে 'রিলিজিয়ন' (পবিত্র ধর্ম) নয় বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচলিত ধারণা অবশ্য ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

ইসলাম মূলত গণতান্ত্রিক ধর্ম। মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ ইসলামকে যথার্থই 'গণতান্ত্রিক ধর্ম' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইসলাম যে 'গণতান্ত্রিক ধর্ম' সে কথা বুঝতে অমুসলিম পণ্ডিতদেরও অসুবিধা হয়নি। তাই কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন প্রচলিত গণতন্ত্র ইসলামিক গণতন্ত্রেরই ধ্বংসাবশেষ। তাঁরা বলেন, একমাত্র ইসলামই গণতন্ত্রকে দিতে পারে সঠিক মর্যাদা, আর ইসলামই নিশ্চিত করে গণতন্ত্রের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা। কাজেই বিশ্বরাজনীতিতে একমাত্র ইসলামই উপযুক্ততার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম বলে তাঁরা মনে করেন। "অতঃপর যে তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন এক রজ্জু ধারণ করে যা কখনো ছিঁড়বার নয়" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)। এখানে 'তাগুতকে অস্বীকার' করার দ্বারা রাজনীতির সাথে ইসলামের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র প্রমান করে। এবং এটা এমনই এক মজবুত রজ্জু যা কখনো ছিঁড়বার নয়। এটাই মুক্তির একমাত্র পথ। এটা এমনই এক প্রকৃত সত্য পথ যা কখনো বক্র হবার নয়। "আর আমি জ্বীন এবং মানব সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য" (সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬)।

ইসলাম শুধু রাজনীতিতেই অংশগ্রহণ করে না, অর্থনীতি, সমাজনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, খাদ্যনীতি, যুদ্ধনীতি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করে। এ সকল প্রত্যেকটি বিষয়ে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও দেশপ্রেমকে করেছে ইবাদত, যা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানের দাবি। ইসলামী আইন মানবিক আচার আচরণ ও বিবেক বুদ্ধির সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, ইসলাম অন্যান্য যাবতীয় ধর্মের পূর্ণ অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। কাজেই ইসলামই একমাত্র বিশ্বমানবের পরিপূর্ণ জীবনবিধান হওয়ার সম্ভবনা রাখে এতে কোন সন্দেহ নেই। মূলত মদিনায় নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান, যা 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সকল রাষ্ট্রীয় সংবিধান ওই মদিনা সনদেরই বিকৃত রূপ। এই 'মদিনা সনদ'ই লিখিত রাষ্ট্রীয় সংবিধান তৈরি করতে মানুষকে পথ দেখিয়েছে। এখান থেকেই অনুমান করা যায়, ইসলাম রাজনীতিতে কতটা উপযোগী।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম দিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামের পদচারণা এতটাই ব্যাপক ছিল যে, প্রায় অর্ধেক পৃথিবী মুসলমানদের করায়ত্ত্ব ছিল। কুরআনে বলা হয়েছে "যারা আমার বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তারা কাফির, তারা জালিম, তারা ফাসিক" (সূরা আল মায়িদা ঃ ৪৪,৪৫,৪৭)। কুরআনে আর কাউকে আল্লাহ এক সাথে কাফির, জালিম, ফাসিক বলে গালি দেন নাই, যেমনটি এখানে দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রপ্রধানকে। কুরআনের এই উক্তি থেকেই বুঝা যায় ইসলাম স্বতঃস্ফূর্ত ও ওৎপ্রোতভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা রাখে। বিচার ব্যবস্থা যত কঠোর দুর্নীতি তত বিলোপ, আর ইসলাম সেই কাজটিই করতে চায়। "তামরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দিবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)। আল কুরআন থেকে ধর্মীয় এই সহজ বিষয়গুলো বুঝতে আপনাদের মত জ্ঞানী পাঠকদের ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ কিংবা পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এর জন্য সামান্য একটু আন্তরিক সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

শুধু ইসলামই নয়, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দুনিয়ায় আল্লাহ প্রবর্তিত যত ধর্ম এসেছিল সকল ধর্মই রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যে কারণে পূর্ববর্তী বহু নবী স্ব-স্ব যুগে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নিজে বাদশাহী করেছেন অথবা তাঁদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকেছেন। আর সে কারণেই কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন 'যারা বলে ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা, তারা এখনও ধর্ম বোঝে নাই এবং তারা এখনও পথহারা, ওরা সত্য থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়ে ধার্মিকের ভান করে মাত্র। এক শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ মানুষ নির্বাচন ও রাজনীতি বা শাসনব্যবস্থাপনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে ভাবতে থাকেন এসব দুনিয়াবী খারাপ ও বজ্জাতি কাজ। আখিরাত নিয়ে ব্যস্ত এসব লোকদের ধারণা খারাপ লোকেরা রাষ্ট্র চালাবে আর বুজুর্গরা মসজিদে বসে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করবেন।

'ইসলামে রাজনীতি আছে' একথা সত্য জেনেও কিছু কিছু মানুষ মনে করেন সব সময় সব সত্যকে স্বীকার করা চলে না। করলে ইসলামী রাজনীতি মেনে নিতে হয়, কিন্তু তা চিন্তারও অযোগ্য। ফলে 'রাজনীতি ছাড়া ইসলাম মোটেও পরিপূর্ণ নয়' এ মহাসত্যকে সহ্য করতে অনেক মুসলমানই রাজী হয় না। আবার কুফরীর দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতের মত বিশেষ ইবাদতগুলোতে তারা মোটেও পিছিয়ে থাকে না। এভাবে সত্যকে অস্বীকার করা বেশ খানিকটা সহজ হয়।

www.pathagar.com

রাসূল সা. তাঁর সাহাবী রা.-দের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন–"শোন! তোমরা এমন একটি যুগে রয়েছ যখন আমার দেয়া আদর্শের মাত্র এক দশমাংশ ছেড়ে দিলেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর অনাগত দিনগুলোতে তোমরা দেখবে যে, গোটা আদর্শের মাত্র এক দশমাংশের উপর যে ব্যক্তি চলবে তাকেই বাঁচিয়ে দেয়া হবে" (তিরমিযি)। এ হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী বর্তমান যুগের মানুষ কারণ বশত কিছু কিছু বিধান পালন না করলেও পরিত্রাণ পেয়ে যায়। তবে ওই ধর্মীয় বিধানগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি বিধানকে জেনে শুনে অস্বীকার করলে পরিত্রাণের আর কোনো সুযোগ থাকে না। আবার পরিপূর্ণ ইসলাম বা শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার দায়ও এড়াতে পারে না। "..... তোমরা দ্বীনকে কায়েম কর এবং এ বিষয়ে মতবিরোধ করো না"–সূরা আশ শূরা ঃ ১৩। "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর পরিপূর্ণভাবে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না ; সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু" (২ঃ২০৮)।

ডা. আরনল্ড টোয়াইন তাঁর 'প্রেসিং অব ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন- "আল কুরআন পূর্ণাঙ্গ বিধানের সমষ্টি। যে বিধানসমূহ কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো আপন জায়গায় সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ।"

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–"আল কুরআন মানবজগতের সংস্কারক। আধ্যাত্মিক নির্দেশনা এবং জ্ঞানগর্ভ তথ্যসমৃদ্ধ এই মহাগ্রন্থ মানব সভ্যতার এক বিস্ময়কর সংস্কার সাধন করেছে। যে সকল মনীষী এর মর্ম এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সন্ধান পেয়েছেন, তারাই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। মানব জীবনের যে কোনো সমস্যাই এর কাছে নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, কুরআন তার সমাধান বের করবেই"।

ডেভিন পোর্ট "মুহাম্মদ এন্ড কুরআন" গ্রন্থে লিখেছেন–"আল কুরআন মুসলিম জাতির সামগ্রিক জীবনবিধান। পরিবার-সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, বিচার ও প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে উপযোগী। উন্নত, সার্বজনীন ও কল্যাণকর বিধানাবলী এতে বিদ্যমান। পাশাপাশি এটি একটি ধর্মীয় গ্রন্থও বটে।"

ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক ও সমরকুশলী নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কুরআন অধ্যয়ন করে যে বিশ্বাস পোষণ করেন তা হলো—"আমার বিশ্বাস, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমি সকল দেশের জ্ঞানী-গুণী-বিদগ্ধ সমাজকে একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হবো, আর তখন কুরআনী নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে

www.pathagar.com

এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালন-নীতির ভিত্তি স্থাপন করতে পারবো। কেননা, কুরআনী নিয়ম-নীতিই সঠিক। আর একমাত্র এটিই কেবল মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তায় আপ্লুত করতে পারে।"

খ্যাতনামা ইংরেজ ঐতিহাসিক জিম (Geam) লিখেছেন–"কুরআনকে মুসলিম সমাজের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কীয়, জাতীয় আইন-কানুন সম্পর্কীয়, ফৌজদারী ইত্যাদি যাবতীয় দিকের সার্বিক জীবন-ব্যবস্থা বলা যায়। কুরআন জীবনের সর্বদিক ঘিরে রেখেছে, ধর্মীয় ইবাদত-উপাসনা থেকে আরম্ভ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরলৌকিক মুক্তি থেকে শুরু করে দৈহিক সুস্থতা, জাতি ও সমাজের সকল প্রকার অধিকার কর্তব্য থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ের যাবতীয় অধিকার, সচ্চরিত্রতা থেকে অন্যায়-অপরাধের সার্বিক আলোচনা, পার্থিব শাস্তি থেকে পরকালীন শাস্তি ইত্যাদি সকল ধরনের বিধান এই কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।"

দুনিয়ার কোনো মানবতা বা বিচার-ব্যবস্থা ঐশী বিচার-ব্যবস্থাকে অতিক্রম করতে পারে না। কারণ দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় মতবাদের বিচার ব্যবস্থায় অপরাধের শাস্তি যেটুকু থাকে তাও সাক্ষ্য প্রমাণের সীমা পেরিয়ে যেতে পারলেই প্রকৃত অপরাধীও নির্বিঘ্নে পার পেয়ে যায়। ফলে তার অপরাধের প্রবনতা উস্কে যায় এবং বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐশী বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে প্রকৃত অপরাধী দুনিয়াতে পার পেয়ে গেলেও পরকালে অনন্তকাল ধরে তার শাস্তির ভয় থেকেই যায়। এতে অপরাধীর অপরাধ প্রবনতা হ্রাস পাওয়ার কথা অমুসলিমরাও স্বীকার করেন। এখানে উল্লেখ্য অমুসলিম মনিষীরা ইসলামের আবেদন সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হলেও অনেক আলেমই ইসলামকে সেভাবে বুঝতে চান না। অথচ নাস্তিকরা ধর্মকে অস্বীকার করলেও ইসলামের নবী সা.-কে একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে মোটেও কৃপণতা করেন না।

পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই মনে করে, নীতির উৎস ধর্ম। ভালো-মন্দ নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই ধর্মকে অবলম্বন করতে হবে। ধর্মে ভালো-মন্দ নির্দেশিত আছে। স্বার্থগত বিরোধের সর্বোৎকৃষ্ট মীমাংসার জন্যও ধর্ম অপরিহার্য। ধর্মকে অবলম্বন করে ন্যায়স্বার্থ ও হীনস্বার্থের পার্থক্য বোঝা যায়। বেশির ভাগ লোকের মতে জীবন যাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় শুধু ধর্মেই নির্দেশিত আছে। ভালো-মন্দ ও ন্যায় নীতি সম্পর্কে মানুষ আজ পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তার সবটুকুই এসেছে ধর্ম থেকে। নীতি-নৈতিকতাই জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ। নেতার চরিত্রে নীতি-নৈতিকতা না থাকলে সেই জাতির চরিত্রে হারাবার মত আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না!

www.pathagar.com

ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারের প্রয়োজনে মানুষ ধর্মগ্রন্থ, ধর্ম প্রবর্তকের বাণী ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ইত্যাদিকে পথ-প্রদর্শক হিসেবে অবলম্বন করে। বাস্তবে দেখা যায়, যে ব্যক্তি যে ধর্মের অনুসারী-পরিবারে জন্ম নেয়, অর্থাৎ যার যেটি মা-বাবার ধর্ম, উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে সে ব্যক্তি সেই ধর্মের অনুসারী হয় এবং সেই ধর্মের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। এর ব্যতিক্রম একেবারেই কম। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র এবং ধর্মভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে অসংখ্য। একজন ধার্মিক মানুষ স্বার্থঘটিত সমস্যাবলীর বিচারে ধর্মীয় নীতির বাইরে সমাধান করার কথা ভাবতে পারে না। অবশ্য প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ ধর্মের নীতিকে লঙ্ঘনও করে। মানুষ সব সময় নিজের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে না। মানুষ নীতি ও আইন মেনে চলে আবার লংঘনও করে। সর্বোৎকৃষ্ট মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ নীতি দিয়েই ধর্ম সৃষ্টি। কাজেই ধর্ম থেকে নীতিকে আলাদা করে নিলে ধর্মে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করার মত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ইসলামে নারীদের পর্দাপ্রথা নিয়ে প্রগতিবাদী তথা নারীবাদীদের মধ্যে নারীর স্বাধীনতা হরণের কথা উঠে। অথচ বিভিন্ন ধর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একমাত্র ইসলামই স্বামী-স্ত্রীর সম-অধিকারের ভিত্তিতে নারীদেরকে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় আসীন করেছে। পক্ষান্তরে খ্রিষ্ট-জগতের বিশিষ্ট ধর্মযাজক টারটুলিয়ানের উক্তি হচ্ছে–নারী হলো শয়তানের দোসর, নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি আহবানকারী, খোদায়ী বিধানের প্রথম লংঘনকারী এবং পুরুষের সর্বনাশকারী"।

ইহুদী পাদ্রীদের মতে–'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ঠ পুরুষও শতগুণে ভালো'।

হিন্দু ধর্মের মনুসংহিতায় আছে–'কাম-ক্রোধ, কুৎসিত আচার-আচরণ, হিংসা ও কৌটিল্য, এ সবই নারী হতে উদ্ভব হয়ে থাকে'।

বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে–'নারীর সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীর নির্বানের কোনো আশা নেই'।

মুসলমানদের পক্ষ থেকে বলা হয়–"সারা বিশ্বে ইসলামবিরোধী বুদ্ধিজীবিরা নারীপ্রগতির নামে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় পুঁতি গন্ধযুক্ত রসাল মাংস ছিন্নভিন্ন করে খাওয়ার আশায় পতিতার দালালী করে। বিকৃত যৌনভোগী পতিতার দালালরা অবাধ উপভোগের আশায় দালালী করে ওদের নাম দিয়েছে যৌনকর্মী। ফলে নারীরা আজ সরাবিশ্বে অহরহ যৌন নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে প্রগতিবাদী তথা নারীবাদীদের দ্বারা। অথচ পর্দাহীন উচ্ছৃঙ্খল

www.pathagar.com

সমাজে চরম নির্যাতিত নারী জাতিকে ইসলামের পর্দাপ্রথার মাধ্যমে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা হেফাজত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল, যা পৃথিবী আর কোনো দিন দেখেনি।

ইসলাম শুধু নারী অধিকারের কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না। শিশু-সন্তানের অধিকার, পিতা-মাতার অধিকার, শ্রমিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। যা অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়।

জিহাদই সন্ত্রাস!!

মূলত তলোয়ারের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং উদারতার মাধ্যমেই তা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে"দ্বীনের পথে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, নিশ্চয় সত্য হতে মিথ্যা পৃথক হয়েছে" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)। সুতরাং ইসলামে সন্ত্রাসের কোনই সুযোগ নেই। তবে আল্লাহ বলেছেন, "জিহাদের বিধান প্রবর্তিত হল, যদিও তা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর---" (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬)।

কুরআনে জিহাদ সম্পর্কিত আরও বহু আয়াত রয়েছে সেখানে যুদ্ধের ব্যাপারে ইসলামের রিতিনীতির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যুদ্ধের প্রেক্ষিতে, বন্ধি বিনিময়, বন্দীদের সাথে ব্যবহার এবং সন্ধির কথা। অথচ কুরআনে জিহাদের কথা থাকায় সম্প্রতি সমালোচকদের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে ইসলাম একটি সন্ত্রাসী ধর্ম। কিন্তু সমালোচকদের একথা বোঝা উচিত, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করা হয় তাকে সন্ত্রাস বলা যায় না। সন্ত্রাস হচ্ছে ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে আকস্মিক হামলা চালিয়ে নারকীয় ঘটনা ঘটিয়ে ধ্বংস ও আতংক সৃষ্টি করা। সুতরাং সন্ত্রাস মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না বরং হরণ করে। সন্ত্রাস হচ্ছে অধিকার হরণ ও বিপর্যয়ের পথ। সন্ত্রাস হচ্ছে মানবতা ধ্বংসের এক ঘৃণ্য ও পৈশাচিক কর্মকাণ্ড।

পক্ষান্তরে জিহাদ শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা করা। ইসলামিক পরিভাষায় দুনিয়ায় আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি সৃষ্টিকারীদের হাত থেকে মানব জাতির মুক্তির জন্য নবী-রাসূলগণ (আ.) যেভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন সেইভাবে প্রচেষ্টা চালানোকেই জিহাদ বলে। জিহাদ হচ্ছে শান্তি বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। শান্তি প্রতিষ্ঠাই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সৎ কাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে খারাপ কাজ প্রতিরোধ করার চেষ্টাই মূলত

www.pathagar.com

জিহাদ। আর এ জিহাদ শুরু হয় মানুষের ব্যক্তি জীবনের আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে। জিহাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো–মানুষের নিকট ধর্মের দাওয়াত পৌছানো। জিহাদ হচ্ছে–অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের একটি অব্যাহত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন প্রক্রিয়া, কোনো হঠকারিতা নয়। সুতরাং জিহাদ কোনো সন্ত্রাস নয়, বরং সন্ত্রাস নির্মূল করার প্রক্রিয়া। জিহাদ কোনো জবরদস্তি নয়। কুরআনে বলা হয়েছে–"ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই" (২ ঃ ২৫৬)। আবার অন্যত্র রাসূল সা.-কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে–"তুমি উপদেশ দিতে থাক; তুমি কেবল উপদেষ্টাই। তুমি তাদের ওপর জবরদস্তির অধিকারী নও" (সূরা আল গাশিয়া ঃ ২১-২২)।

এখান থেকেই বোঝা যায় জিহাদের নামে সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষ খুন করে কোন জাতি-গোষ্ঠীর ওপর ধর্মীয় বিধান জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া যায় না এবং ইসলাম তা অনুমোদনও করে না। তবে এ ক্ষেত্রে আলেমদের মতে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় বিধান প্রয়োগের সুফল সম্পর্কে মানুষকে যুক্তি সহকারে বোঝানোর মাধ্যমে জিহাদ (প্রচেষ্টা) চালিয়ে যাওয়াই সঠিক পন্থা। কাজেই "যে প্রচেষ্টা (জিহাদ) করে, সে তার নিজ মঙ্গলের জন্যই প্রচেষ্টা করে; আল্লাহ বিশ্বজগতের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন" (সূরা আল আনকাবূত ঃ৬)।

আল কুরআনে সন্ত্রাস দমন তথা সন্ত্রাস নির্মূলের ব্যপারে যে সমস্ত বিধান দেওয়া হয়েছে সেগুলো বিবেচনা করলে ইসলামকে সন্ত্রাস নির্মূলের ধর্ম বলতেই হয়। যেমন–"তোমরা পরস্পরকে হত্যা কর না------ যে ব্যক্তি অন্যায় ও জুলুম সহকারে হত্যা করবে, আমি তাকে সত্বরই দোযখে পোড়াব, এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ" (সূরা আন নিসা ঃ ২৯-৩০)।

"হে ঈমানদারগণ! বিধান দেয়া হয়েছে তোমাদের হত্যার বিনিময়ে হত্যা (কিসাস), আযাদের বিনিময়ে আযাদ, গোলামের বিনিময়ে গোলাম-------" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮)।

"হে জ্ঞানবান! তোমাদের জন্য কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা) ব্যবস্থায় রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা সতর্ক হতে পার" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৯)।

"কোনো মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে, তবে তার শাস্তি দোযখ---" (সূরা আন নিসা ঃ ৯৩)।

www.pathagar.com

".....নরহত্যা বা ধ্বংসাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন হত্যা করল দুনিয়ার সকল মানুষকে, আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করল সে যেন সকলের জীবনই রক্ষা করল,....." (সূরা মায়িদা ঃ ৩২)।

ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নবুয়ত জীবনের ২৩ বৎসরে যুদ্ধ হয়েছিল ২৭টি। ছোট বড় এরকম আরও অভিযানসহ সশস্ত্র অভিযানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৮২টি। বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকগণের মতে এইসব যুদ্ধ আক্রমণাত্মক ছিল না, প্রায় সবগুলো যুদ্ধই ছিল প্রতিরোধমূলক। তিনি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলেই তখন তা প্রতিরোধ করেছেন মাত্র। ২৭টি যুদ্ধের মধ্যে রাসূল সা. নিজে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৯টিতে। উল্লিখিত ৮২টি সশস্ত্র অভিযানে মানুষ নিহত হয়েছে সর্বমোট ১০১৮জন। তার মধ্যে মুসলমান শহীদের সংখ্যা ছিল ২৫৯ জন। প্রতিপক্ষের ৭৫৯ জন নিহত হয়।

আবার ইতিহাসের অন্য দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই ফরাসী বিপ্লবে ৬৬ লক্ষ, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ১ কোটিরও অধিক, প্রথম মহাযুদ্ধে ৭৩ লক্ষ ৩৮ হাজার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এক কোটিরও অধিক মানুষ প্রাণ হারায়। সেখানে ইসলামী বিপ্লবে মাত্র ১০১৮ জন প্রাণ দেয়াই এই বিপ্লবকে রক্তপাতহীন বিপ্লব বললে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। সাথে সাথে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং শান্তিই তার মূল কথা।

ইসলামের দাবি অনুযায়ী উল্লিখিত সবগুলো যুদ্ধেই মুসলমানরা অলৌকিকভাবে বিজয় লাভ করে। এই যুদ্ধগুলোতে বিজয় ছিল মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের অলৌকিক বিজয়, যেখানে ছিল আল্লাহর সরাসরি সাহায্য। যেমন, বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, " হ্যাঁ, অবশ্যই তোমরা ধৈর্যধারণ ও সাবধান হলে ওরা দ্রুতগতিতে তোমাদের আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করবেন" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১২৬)। নিম্নে কতকগুলো বিজয়ের নমুনা দেয়া হলো, যেখানে উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও বিজয়ের দিকে লক্ষ্য করলে ওই যুদ্ধগুলোতে অলৌকিক বিজয়ের কথা স্বীকার করতেই হয়।

যুদ্ধ	মুসলমান সৈন্য	শত্রু সৈন্য	বিজয়
বদর	৩১৩	১,০০০	মুসলমানদের।
ওহুদ	৭০০	৩,০০০	মুসলমানদের।

www.pathagar.com

খন্দক	৩,০০০	২৪,০০০	মুসলমানদের।
মূতা	৩,০০০	১,০০,০০০	মুসলমানদের।
ইয়ারমুক	৪০,০০০	২,৪০,০০০	মুসলমানদের।
কাদেসিয়া	৮,০০০	৬০,০০০	মুসলমানদের।
স্পেন	৭,০০০	১,০০,০০০	মুসলমানদের।
সিন্ধু	৬,০০০	৫০,০০০	মুসলমানদের।

বর্তমানবিশ্বে বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে ইসলামকে জড়িয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। ফলে বিশ্ব হয়ে পড়েছে দ্বিধাবিভক্ত, এমন কি ঘটনা রূপ নিয়েছে ভয়াবহ যুদ্ধে। বিশ্বমানবতা আজ শান্তির পথ পরিহার করে সংঘাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ মনে করেন 'ক্রুসেডের নাম পাল্টিয়ে রাখা হয়েছে 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ'। আর মুসলমানদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনকে বৈধতা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে 'জঙ্গিবাদ'। এ ক্ষেত্রে তাঁরা বলেন, সারাবিশ্বে ইসলাম বিরোধীরা ব্যাপক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে তারা তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে যুগে যুগে কিছু ভণ্ড প্রতারক আলেম তৈরি করে থাকে। ওই সমস্ত তৈরি প্রতারক আলেম সুকৌশলে কুরআন-হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যা ও ভ্রান্তিপূর্ণ শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটায়ে মুসলিম সমাজে তাদের কিছু জানবাজ ভ্রান্তঈমানদার অনুচর তৈরি করে। ফলে তারা তাদের সেইসব অনুচরদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন কিছু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অথচ কুরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে ওইসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনো দূরতম মিলও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইসলামী কোনো ব্যক্তিত্বই কিছু সংখ্যক লোকের হটকারিতামূলক জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের দায় বহন করে না এবং তা স্বীকারও করেন না। তাঁরা মনে করেন, ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে কাবু করার কৌশল হিসেবেই জঙ্গিবাদকে ব্যবহার করা হয়। তবুও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে তাদের ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করতে আলেম সমাজকেই পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আর সেই সাথে কমিয়ে ফেলতে হবে বিভিন্ন ইসলামী মতাদর্শের দূরত্ব। যেহেতু ন্যায়ভিত্তিক কল্যাণকর বিশ্ব উপহার দিতে সকল মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য মুসলমানরাই দায়িত্বশীল।

ওইসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমগণ অবশ্য সরাসরি ইহুদীদেরকে দোষারোপ করে থাকেন। যেমন-শায়খুল হিন্দ

www.pathagar.com

আল্লামা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী র. বলতেন "সমুদ্রের অন্ধকার তলদেশে যদি দুটি মাছ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এর পিছনে সক্রিয় রয়েছে ইহুদীদের কালো হাত"। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের জাগরণ দেখে ইহুদীবাদী শক্তি গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা মূল ধারার ইসলামী সংগঠনগুলোর উপর আঘাত হানার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইসলামী নামধারী জঙ্গিবাদী সংগঠনের জন্ম দিচ্ছে। ফলে জঙ্গিবাদের নামে ইসলাম আজ ইহুদী গোয়েন্দা-চক্রের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত। এখানে কুটকৌশলের বেড়াজালে 'সত্র আক্রান্ত হয়েছে মিথ্যার দ্বারা।"

ষড়যন্ত্র এখানেই শেষ নয়। ওদের একদল অনুসারী প্রখ্যাত আলেমদের ভৌতিক সমালোচনা করে সমাজে পরিকল্পিত বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজটিও সুচারুরূপেই করে থাকে। আবার কেউ কেউ সমাজে ফেতনা-ফ্যাসাদ বাধাতে ইসলামী গবেষণাগরের নামে ফতুয়াবাজী করে বেশ দক্ষতার সাথে। এমনকি রাজনীতি-বিমুখ রাখতেও তারা কিছু ইসলামী সংগঠনের মধ্যে অপকৌশল চালিয়ে থাকে এবং তারা তা চিরদিন চালাতেই থাকবে ; যেহেতু আল কুরআনে বলা হয়েনে–"অবশ্যই আপনি সকলের মধ্য হতে মুসলমানদের তীব্র শত্রু হিসেবে দেখবেন 'ইহুদী ও মুশরিক' এবং নিকট-বন্ধু হিসেবে দেখবেন, যারা বলে 'আমরা নাছারা (খ্রিস্টান)' ....." (সূরা আল মায়েদা ঃ ৮২)। কাজেই মানুষের মাঝে স্বচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কৌশলে তা প্রতিহত করতে হবে আলেম সমাজকে।

৯০-এর দশকে যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত NATO-র এক সম্মেলনে বলেছিলেন "শত্রুহীন কোন আদর্শ টিকে থাকতে পারে না। আমাদেরও টিকে থাকার জন্য একটা শত্রুর প্রয়োজন। সোভিয়েট ইউনিয়ন খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে, এখন তারা আর আমাদের কোন শত্রু নয়। এর সাথে আমাদের আর একটা শত্রু থাকতে হবে। এই নতুন শত্রুটির নাম 'ইসলাম'।" তাদের এ ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার কোলে জন্ম নিয়েছিল ফিলিস্তিন যুদ্ধ, আফগানিস্তান যুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, বসনিয়া এবং চেচনিয়ার নির্বিচার গণহত্যা। বিভিন্ন আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রেও এই একই নীতি কাজ করছে এবং বর্তমানে ইহুদী গোয়েন্দা ও তাদের দোসরদের দ্বারা এই নীতি পরিচালিত হচ্ছে বলে ইসলামী চিন্তাবিদগণ মনে করেন। আবার অনেকেই মনে করেন 'ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাইল' এই তিন শক্তির দুষ্টবুদ্ধির লোকগুলো সন্ত্রাস বিরোধী

www.pathagar.com

যুদ্ধ যায়েজ করতে ইসলামকে টার্গেট করে ছড়িয়ে দিচ্ছে ইসলাম ফোবিয়া (ইসলামাতঙ্ক)।

আল কুরআন ইঙ্গিত দেয়-ইহুদীরা বুদ্ধিমান, প্রবঞ্চক, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও উগ্র এবং মুসলমানরা বিশ্বাসী ও অনুগত। বিশ্বাসী ও অনুগত জাতি বুদ্ধিমান, প্রবঞ্চক, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও উগ্র জাতির ষড়যন্ত্রের শিকার হতেই পারে এবং তা খুবই সহজ ও যুক্তিযুক্ত। এতে চরম বিশ্বাসী ও অনুগত মুসলিম জাতি টেরই পায় না যে, তারা এক চতুর জাতির ষড়যন্ত্রের শিকার। তারা টেরই পায় না, তাদের মিশন অতি চালাক শত্রুজাতির দ্বারা পরিচালিত। ফলে এক শ্রেণীর অতিবিশ্বাসী মুসলিম শত্রুর হুকুম তামিল করতে বুকে বোমা বেঁধে তৃপ্তির সাথে নিজের জীবন বিষর্জন দেয় জিহাদের নামে। এভাবে তারা জিহাদের আড়ালে সন্ত্রাস করে আপন জাতির চরিত্রে কালিমা লেপন করার সুযোগ পায়। সুযোগ পায় বিশ্বের দরবারে মুসলমাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে দিতে। সহজ হয় শত্রুজাতির ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভুলটি করা।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ জোর দিয়ে বলে থাকেন, ইসলাম জিহাদের কোনো গুপ্তহত্যা বা আত্মঘাতি হামলা অনুমোদন করে না। ইসলাম কারো শত্রু নয়, ইসলাম কোনো সন্ত্রাসী ধর্ম নয়, ইসলাম কোনো সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় না বরং সন্ত্রাস নির্মূল করতে ইসলামে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। কুরআনের বিধান সম্পর্কে পাদ্রী রেভারেন্ড জি, এম রেডয়েল তাঁর গ্রন্থে লিখেন-"কুরআন মানুষকে রেহায় দিয়েছে শিশু হত্যার মত নৃশংস ও অমানবিক প্রথার কালো অধ্যায় থেকে। মাদক দ্রব্যকে করেছে হারাম। চুরি-ডাকাতি, খুন-ব্যভিচার ইত্যাদি দমনে কুরআন এমন শাস্তির বিধান দিয়েছে যে, কোনো লোক এসব অপরাধ করার মত সাহসই খুঁজে পায় না"।

'বিচার ব্যবস্থা যত কঠোর দুর্নীতি তত বিলোপ' ইসলাম সেই নীতিতেই কাজ করে থাকে। সে কারণেই ইসলাম বলে থাকে, আল কুরআনেই রয়েছে সন্ত্রাস দমনের উপযুক্ত নীতি। একমাত্র কুরআনই দিতে পারে বিশ্বসন্ত্রাস দমনের একমাত্র উপযুক্ত সমাধান। বিশ্ববিবেক ও বিশ্বমানবতাকে চ্যালেঞ্জ করে কুরআনই ফিরিয়ে আনতে পারে বিশ্বশান্তি। চিন্তায়, কথায় ও কাজে সর্বত্রই রাসুল সা. ছিলেন মানবতাবাদী। এ মানবতাই তাঁর প্রেরণার উৎস এবং এটাই ছিল তাঁর চালিকা শক্তি। তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ উদাত্ত আহ্বানজানায় বিশ্ববিবেকের কাছে, নিরপেক্ষভাবে কুরআনের বিধানগুলো পর্যালোচনার জন্য। তাঁরা বলেন, দুনিয়ার কোনো মানবতা

www.pathagar.com

ইসলামের মানবতাকে অতিক্রম করতে পারে না। যেমন খুনের একটা আসামীকে খুন না করে লঘু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলে শত খুনের পথকে উন্মুক্ত করে দিয়ে মানবতাকে হত্যা করা হয়।

ইসলামের সঠিক শিক্ষা, জ্ঞান ও মূল্যবোধ যুক্তিসংগতভাবে সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে না ছড়িয়ে বিশ্বের বুকে যেমন বোমাবাজি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইসলামী শাসন ও আইন কিংবা সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তেমনি বিশ্বের উগ্রবাদী বা জঙ্গিবাদীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত কোনো দেশের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েও উন্নতবিশ্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না। লক্ষ্য করলে দেখা যায় আজ পৃথিবীর কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তা নেই। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে (ইসলামের আদর্শভিত্তিক) সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব।

সম্প্রতি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক সম্মেলনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। বস্তুজগতের পরিধি ছেড়ে বিজ্ঞান আজ আত্মিক জগতে প্রবেশ করতে চলেছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে 'থিওরী অফ ডায়া অনুযায়ী পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত' কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। পৃথিবীতে নানা ধর্মের আগমন ঘটেছে নানা সময়ে। তবে সব ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক, আর তা হলেন–'শান্তি ও নিরাপত্তা' বা 'মানব কল্যাণ'। সেই 'শান্তি ও নিরাপত্তা' বিধান করতেই ইসলামের আগমন। কারণ ইসলাম শব্দের অর্থই হচ্ছে 'শান্তি ও নিরাপত্তা'। ইসলাম দাবি করে যার দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান হয় না সে কখনোই মুসলমান হতে পারে না। যেহেতু মুসলমান অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনকারী। কাজেই কোনো মুসলমান সন্ত্রাস করতে পারে না। তবে ইসলাম কোনভাবেই কারো চক্রান্ত বা ভ্রষ্টতার দায় গ্রহণ করে না।

আজ সারাবিশ্ব অবাক-বিস্ময়ে দেখছে 'তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধেরই অংশ হিসেবে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজকে টার্গেট বানানো হচ্ছে'। অথচ দেশ, জাতি, গোত্রের ভিন্নতায় সংঘাতপূর্ণ অশান্ত এই পৃথিবীকে শান্তি ও সম্প্রীতির গ্লোবাল ভিলেজ ভাবতে হলে যে সত্যের প্রয়োজন তা হচ্ছে 'ঐশীসত্য' যা 'বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠিত সত্য' দ্বারা প্রমাণিত। এ ঐশীসত্য শুধু কুরআনেই পাওয়া যেতে পারে বলে ইসলাম দাবি করে। কুরআন ছাড়া দুনিয়ায় নির্ভুল গ্রন্থ আর একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই গুণীজন স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, একজন ভালো মুসলমানকে শুধু আল্লাহর দাস নয়, মানবতার দাস বা রক্ষাকারী বলে আখ্যায়িত করলেও অত্যুক্তি হয় না।

www.pathagar.com

প্রফেসর টমাস কারলাইল লিখেছেন–"আমার নিকট এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কুরআনের মধ্যে সততা ও বস্তুনিষ্ঠতার গুণাবলী সর্বযুগেই সমভাবে বিদ্যমান এবং এ কথাটি নিরালোকের মত সত্য যে, পৃথিবীতে যদি কোনো সুন্দর এবং কল্যাণকর কিছু সৃষ্টি হয়, তবে তা কুরআন থেকেই হতে পারে।" বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব জর্জ বার্নাড শ বলেছেন–"ভবিষ্যতে শিক্ষিত, মার্জিত এবং আলোকিত মানুষের ধর্ম হবে ইসলাম।" তাই বুঝি সুদূরপরাহত বিশ্বমানবতা আজ মুক্তি পেতে চায়! মুক্তির জন্য করুণ আবেদন জানায় কুরআনের কাছে! আবেদন জানায় ইসলামের আদর্শের কাছে !!!

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড) –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তাফহীমুল কুরআন বিষয় নির্দেশিকা –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তাফহীমুল কুরআন জেলদ (১-৬ খণ্ড) –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে) –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- আল কুরআনের সহজ অনুবাদ –অধ্যাপক গোলাম আযম
- তাফসীরে সাঈদী –মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
- তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড) –মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১০ খণ্ড) –মাওঃ হাবিবুর রহমান
- শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড) –মতিউর রহমান খান
- আল কুরআনের সারসংক্ষেপ –মাওঃ মোঃ তৈয়ব আলী
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)-আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)-আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- রাহে আমল (১-২ খণ্ড) –আল্লামা জলিল আহসান নদভী
- এন্তেখাবে হাদীস (১ -২) –আবদুল গাফফার নদভী
- মিশকাতুল মাসাবীহ (১-৫ খণ্ড) –আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
- ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলাম পরিচিতি –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

www.pathagar.com